চিশ্তিয়া তরীকার

মাশায়েখ

.... কে

উপহার দিলাম।

উপহারদাতা: ....

তারিখ: ....

স্বত্বাধিকারী

নাম: ....

গ্রাম/মহল্লা: ....

থানা: ....

জেলা: ....

www.maktabatulabrar.com

চিশ্তিয়া তরীকার

মাশায়েখ

গ্রন্থনায়

মাওলানা ইবরাহিম খলিল

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশনায়

ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আবরার

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

চিশ্তিয়া তরীকার

মাশায়েখ

গ্রন্থনায়

মাওলানা ইবরাহিম খলিল

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০২০ ইংরেজি

প্রকাশনায়

ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য: ৩০০ ৳ (তিন শত টাকা) মাত্র

সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد : فقد قال الله تعالى :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ.﴾ وقال تعالى : ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ﴾ وقال النبي صلي الله عليه وسلم : «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.»

নেককার-পরহেযগার হওয়ার জন্য নেককার-পরহেযগার লোক তথা বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নেককার-পরহেযগার লোক ও বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবত তথা সাহচর্য লাভের সুযোগ করে উঠতে পারি না। এরূপ অবস্থায় বিকল্প হল নেককার-পরহেযগার লোক ও বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী এবং তাদের মালফুজাত পাঠ করা। বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনেতিহাস ও তাদের মালফুজাত পাঠ তাদের সোহবত তথা সাহচর্য গ্রহণের অনেকটা বিকল্প। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান– 'ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন' থেকে পর্যায়ক্রমে তাসাওউফ-এর প্রসিদ্ধ চার তরীকার মাশায়েখে কেরামের জীবনী প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

'চিশ্‌তিয়া তরীকার মাশায়েখ' গ্রন্থটি তাসাওউফ-এর প্রসিদ্ধ ৪ সিলসিলার মধ্যে প্রসিদ্ধতম সিলসিলা চিশতিয়া সিলসিলা-র শায়খদের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ। সিলসিলা-র শায়খদের ইতিহাস সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হল মানুষকে তাঁদের সাহচর্যের বিকল্প ফায়দা প্রদান করা এবং তাদেরকে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা। আমি মাওলানা ইবরাহিম খলিলকে পর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনা দিয়ে তার দ্বারা গ্রন্থটি রচনা করিয়েছি। আল-হাম্‌দু লিল্লাহ সে বেশ মেহনত করেই গ্রন্থটি রচনা ও সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেছে। তরীকার অবশিষ্ট তিন সিলসিলার মাশায়েখে কেরামের জীবনী রচনার কাজও অগ্রসর হচ্ছে আল-হাম্‌দু লিল্লাহ।

পীর-মাশায়েখের কিছু নাদান ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে পীর-মাশায়েখ-এর জীবনেতিহাসে বহু অতিরঞ্জনও মিশ্রিত করে থাকে। এমনসব অতিরঞ্জনও থাকে যা স্পষ্টতই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক নয় বলে প্রতিভাত হয়। এভাবে পীর-মাশায়েখের জীবনেতিহাসে বহু অনির্ভরযোগ্য তথ্য ও কাহিনী এমনকি বহু বিভ্রান্তিকর বিষয় পরিবেশিত হয়ে আছে। এ গ্রন্থে তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে সেদিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে, যাতে স্পষ্টতই

www.maktabatulabrar.com

শরীয়তের নীতি-বিরুদ্ধ ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক গাজাখোরি ধরনের কোন তথ্য কিংবা বিভ্রান্তিকর কিছু এতে সন্নিবেশিত হতে না পারে।

আমি গ্রন্থটির কম্পোজকৃত সফ্‌ট-কপি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছি এবং সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সম্পাদনার কাজ করে দিয়েছি। কিছু বিষয় নিজের থেকেও সংযোজন করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের ব্যাখ্যা টীকায় পেশ করে দিয়েছি।

লেখক মাওলানা ইবরাহিম খলিল নবীন হলেও তার লেখা বেশ ঝরঝরে। ইতিমধ্যে তার রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। আমি আশা করছি তার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থটিও সমাদৃত হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি দ্বারা আমাদের সকলকে ফায়দা পৌঁছান। আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান– ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশনকে কবূল করুন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে সহীহ ও ব্যাপকতর খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১৮/১২/২০১৯

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
তাসাওউফ তথা তায্‌কিয়া ও সুহ্‌বাতুস্‌ সালিহীন-এর প্রয়োজন ২১
চিশতিয়া তরীকাসহ তাসাওউফ-এর চার তরীকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি........ ৩৬
চিশতিয়া কথাটির ব্যাখ্যা.. ৩৬
উপমহাদেশে চিশতিয়া সিলসিলার আগমন ও অবদান................. ৩৭
চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৩৮

(১) খলিফায়ে রাশেদ আবুল হাসান হযরত আলী রা. ৩৯
জন্ম ও বংশ-পরিচয়.. ৩৯
আখলাক ও হালাত ৪০
আমানত ও দিয়ানতদারী.. ৪০
যুহুদ ও নির্মোহতা ৪১
আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া.. ৪৩
ইবাদত-বন্দেগি ৪৩
আল্লাহর রাস্তায় খরচ.. ৪৪
বিনয় ও নম্রতা ৪৫
বীরত্ব ও বাহাদুরি ৪৫
শত্রুদের প্রতি সদাচার ৪৭
সঠিক সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা ৪৮
আরো কতিপয় গুণাবলী.. ৫০
হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সামনে যেরার আসাদীর সাক্ষ্যদান ৫১
সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতেন ৫২
দুঃখে-দারিদ্রে ধৈর্য ধারণ করতেন ৫২
পারিবারিক জীবন ৫৪
খাবার-দাবার ও পোশাক-আশাক ৫৫
দৈহিক গঠন ৫৫
ইন্তিকালের ঘটনা ৫৬
সন্তানাদি... ৫৭
কতিপয় ঘটনা ও বাণী ৫৮

www.maktabatulabrar.com

(২) সাইয়েদুল আউলিয়া খাজা আবু সাঈদ হাসান বসরী রহ.......... ৫৯
নাম ও বংশ-পরিচয় ৫৯
জন্ম ও প্রতিপালন.. ৫৯
হযরত উম্মে সালামার দুগ্ধপান ৬০
একটা মতানৈক্য: চিশতী সিলসিলা হযরত আলী রা. পর্যন্ত পৌছে কি?.......... ৬০
ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব ৬১
সমকালীন আলেমগণের দৃষ্টিতে ৬১
মুফাস্‌সির হিসাবে হাসান বসরী ৬৩
মুহাদ্দিস হিসাবে হাসান বসরী....................................... ৬৩
ফকিহ হিসাবে হাসান বসরী.. ৬৩
ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য-রুচি ৬৪
আলেমগণের সোহবতে.. ৬৪
হাদিস পড়ুয়াদের ভিড়.. ৬৫
রেওয়ায়েত বিল মা'না ৬৫
শাগরেদবৃন্দ ৬৫
হাকিকী আলেম.. ৬৬
ইলমে বাতেনে হাসান বসরীর সনদ.................................. ৬৬
ফাযায়েল ও আখলাক.. ৬৭
ওয়াজ-নসিহতে পারদর্শিতা ৬৮
অন্তরের দহন জ্বালা ৬৯
কবরের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন...................................... ৬৯
যুহুদ ও তাকওয়া ৭০
ইবাদতে বিশেষ হালত ৭০
আমল ও ইখলাস ৭১
তাতারী টুপি ৭১
আত্মপ্রতারণার ভয়... ৭২
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ৭২
জুলুমের তলোয়ারের মোকাবেলায় তওবার ঢাল........................ ৭৩
ফেতনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকা ৭৪
ইজহারে হক ৭৫
তাকদীরের মাসআলা ৭৬
তুমি হাসান বসরীর চেয়ে বুদ্ধিমান ৭৭
কথার আশ্চর্য প্রভাব.. ৭৮

ইন্তিকাল ৭৮
হুলিয়া তথা দৈহিক গঠন........ ৭৯
পোশাক-আশাক ৭৯
হযরত হাসান বসরীর কতিপয় বাণী ৮০
(৩) আবুল ফযল খাজা আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ. ৮২
একটি চমকপ্রদ ঘটনা ৮২
একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ৮৩
জানমাল কুরবানের বিনিময় ৮৪
গায়বী সতর্কবার্তা ৮৬
পাদ্রির নসিহত ৮৭
এক হাবশীর ঘটনা........ ৮৮
কয়েকটি কারামত........ ৮৮
এক নওমুসলিমের ঘটনা ৮৯
জান্নাতের সঙ্গিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ........ ৯০
ইন্তিকাল........ ৯১
(৪) খাজা আবু আলী ফুয়াইল ইবনে ইয়ায তামিমী রহ. ৯১
প্রাথমিক জীবন ৯২
তওবা ও বয়াত ৯২
তওবা কবুলের আলামত........ ৯৩
ইলমী মাকাম........ ৯৪
হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ৯৫
মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃতি ৯৫
যুহুদ ও তাকওয়া ৯৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা........ ৯৬
হালাল উপায়ে রিজিক অর্জন ১০০
জিকির ও তিলাওয়াতে মগ্নতা ১০০
বন্ধুত্বের ব্যাপারে নির্দেশনা ১০১
ইলম ও যুহুদের ব্যাপারে হেদায়েত ১০১
কতিপয় উপদেশ........ ১০২
ইন্তিকাল........ ১০৪
পরিবার পরিজন........ ১০৪
অমিয় বাণী ১০৫

www.maktabatulabrar.com

হালাল খাবার ১০৬
(৫) সুলতান ইবরাহিম ইবনে আদহাম ইবনে সুলাইমান রহ. ১০৬
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১০৬
বাদশাহী ছেড়ে ফকিরী ১০৬
জলেস্থলে বাদশাহী........ ১০৮
আল্লাহর ভয় ও তাওয়াক্কুল........ ১০৮
নয় বছর সাধনা........ ১০৯
কতিপয় কারামত........ ১০৯
এক যুবকের আক্ষেপ ১১০
দোয়া কেন কবুল হয় না? ১১১
বন্ধুত্বের দাবী ১১২
কতিপয় নসিহত........ ১১২
ইন্তিকাল........ ১১৪
(৬) কুতুবুল আলম সাদীদুদ্দীন খাজা হুজাইফা মারআশী রহ. ১১৪
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১১৪
শিক্ষা-দীক্ষা........ ১১৪
হালাত ও গুণাবলী........ ১১৫
কতিপয় বাণী ১১৫
ইন্তিকাল........ ১১৬
(৭) অলিকুল শিরোমণি খাজা আবু হুবায়রা বসরী রহ. ১১৬
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১১৬
খাজা হুজাইফার দরবারে........ ১১৬
দেরহাম দেখে বেহুঁশ হয়ে যান ১১৭
হালাত ও মুজাহাদা ১১৭
ইন্তিকাল........ ১১৭
(৮) কুতুবুয যমান খাজা উলু মামশাদ দীনাওয়ারী রহ. ১১৮
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১১৮
প্রাথমিক জীবন ১১৮
মুজাহাদা ও খেলাফত লাভ........ ১১৮
ওয়াজ-নসিহত........ ১১৯
বাতেনী কামালাত ১১৯
বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য হবে না ১২০

আশ্চর্য কারামত ১২০
অমিয় বাণী ১২১
ইন্তিকাল ১২২
তার দুনিয়া মিলে গেছে ১২২
(৯) শরীফুদ্দীন খাজা আবু ইসহাক চিশতী রহ. ১২৩
শায়েখ দীনাওয়ারী-র খেদমতে ১২৪
মারেফতের ঝর্ণাধারা ১২৫
হালাত ও কারামত ১২৫
বাদশার সঙ্গে সাক্ষাতে অনীহা ১২৬
ইন্তিকাল ১২৬
(১০) খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী আল হাসানী রহ. ১২৬
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১২৬
জন্মের সুসংবাদ ১২৬
শায়েখের খেদমতে ১২৭
তালীম ও তরবিয়ত ১২৭
শায়েখের মহব্বতে বাঁধা পড়েন ১২৮
কৈশোরে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ১২৮
দুটি অলৌকিক ঘটনা ১২৮
ইন্তিকাল ১২৯
(১১) খাজা নাসেহুদ্দীন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু আহমদ রহ. ১২৯
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১২৯
শিক্ষাদীক্ষা ১৩০
খেলাফত লাভ ১৩০
গায়েবী খাজানার মালিক ১৩০
আশ্চর্য স্বপ্ন ১৩১
ইন্তিকাল ১৩১
(১২) খাজা আবু ইউসুফ ইবনে সামআন হোসাইনী চিশতী রহ. ১৩১
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৩১
স্বপ্নের নির্দেশ ১৩২
তালীম-তরবিয়ত ১৩২
আশ্চর্য কারামত ১৩২

www.maktabatulabrar.com

দু'টি কারামত ১৩৩
দুনিয়া-বিরাগ ১৩৩
ইন্তিকাল ১৩৪
(১৩) কুতুবুল আকতাব, শামসে সূফিয়া, চেরাগে চিশতিয়া খাজা মওদুদ চিশতী ১৩৪
শিক্ষা-দীক্ষা ১৩৪
বয়াত ও খেলাফত লাভ ১৩৫
শায়খুল ইসলামের সঙ্গে বিরোধ ১৩৫
তাবাররুকের অবমূল্যায়ন ১৩৬
ইন্তিকাল ১৩৭
(১৪) খাজা নায়্যিরুদ্দীন শরিফ যিন্দানী রহ. ১৩৭
পরিচয় ও খেলাফত লাভ ১৩৭
কারামত ১৩৭
ইন্তিকাল ১৩৮
(১৫) ইমামে তরিকত হযরত খাজা উসমান হারুনী রহ. ১৩৮
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৩৮
বয়াত ও খেলাফতলাভ ১৩৯
দেশভ্রমণ ১৩৯
কতিপয় কারামত ১৪০
কতিপয় বাণী ১৪১
ইন্তিকাল ১৪২
(১৬) গরীব নেওয়ায খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী রহ. ১৪২
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৪২
খোরাসানে হিজরত ১৪২
তৎকালে খোরাসানের ধর্মীয় পরিবেশ ১৪৩
সুলুকের সূচনা ১৪৩
প্রথম সফর ১৪৪
খেলাফত প্রদানের বিস্ময়কর ঘটনা ১৪৪
খাজা উসমান হারুনীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ ১৪৬
খাজা আজমীরীর মজলিস ১৪৬
বড় পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৪৭

সোহবতের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ ১৪৭
আস্তারাবাদে খাজা আজমীরী ১৪৮
খাজা আজমীরীর নেক দৃষ্টির বরকত ১৪৯
বলখে খাজা আজমীরী ১৫০
হিন্দুস্তানে প্রথম চিশতী শায়েখ ১৫১
হিন্দুস্তানের বিজয় ১৫১
ভাগ্যনির্ধারণী ঘটনা ১৫২
তৎকালে হিন্দুস্তানের অবস্থা ১৫৩
রাজধানী আজমীর থেকে দিল্লিতে ১৫৩
ইত্তিবায়ে সুন্নতের প্রেরণা ১৫৪
কাশ্‌ফ ও কারামত ১৫৫
দানশীলতা ১৫৬
অমিয় বাণী ১৫৬
কতিপয় মালফুজ ১৫৬
ইন্তিকাল ১৫৯

(১৭) হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ. ১৫৯
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৫৯
তালীম-তরবিয়ত ১৬০
খেলাফত লাভ ও দিল্লি আগমন ১৬০
বয়াত ও ইরশাদ ১৬১
হালত ও গুণাবলী ১৬২
মামুলাত ছুটে গেছে বলে ১৬২
শায়েখ কাকীর জনপ্রিয়তা ১৬৩
কাকী নামকরণের কারণ ১৬৬
বখতিয়ার কাকী সম্পর্কে খাজা আজমীরী ১৬৭
ইন্তিকালের কারণ ১৬৮
জানাযার অসিয়্যত ১৬৯

(১৮) সুলতানুল আরেফীন শেখ ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার আজুধানী রহ. ১৬৯
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৭০
শিক্ষা-দীক্ষা ১৭০
শায়েখের সন্ধান লাভ ১৭১

www.maktabatulabrar.com

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭২
দেশ ভ্রমণ ১৭৩
বয়াত ও খেলাফত লাভ ১৭৪
শায়েখের জানেশীন ১৭৪
মানুষের ভিড় অপছন্দ করতেন ১৭৫
দুঃখ-দারিদ্র ১৭৫
জাহের ও বাতেনে কোনো পার্থক্য ছিল না ১৭৬
জায়গির গ্রহণ করেননি ১৭৭
অদ্ভুত সুপারিশনামা ১৭৭
সমকালীন আলেমগণের সঙ্গে সম্পর্ক ১৭৭
হালত ও গুণাবলী ১৭৮
শায়েখ সম্পর্কে খাজা নেজামুদ্দীনের অভিমত ১৭৯
ক্ষমতাশীনদের সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন ১৮০
মায়ের কারামত ১৮১
গাঞ্জেশাকার নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ ১৮২
শায়েখের দাড়ির বরকত ১৮৩
দাদাপীরের প্রশংসা ১৮৩
শায়খুল কাবিরের ইন্তিকাল ১৮৪
খলিফা ১৮৪
অমিয় বাণী ১৮৪
শায়খুল কাবিরের সন্তানাদি ১৮৫
শায়খুল কাবিরের খলিফাগণ ১৮৫
শায়েখ বদরুদ্দীন ইসহাক ১৮৫
শায়েখ আরেফ ও শায়েখ সাবের কিল্‌য়ারী ১৮৬

(১৯) খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কিল্‌য়ারী রহ. ১৮৬
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৮৬
বাল্যকাল ও শিক্ষা-দীক্ষা ১৮৭
সাবের উপাধী পাওয়ার কারণ ১৮৮
শায়েখের প্রশংসা ১৮৮
ইন্তেকাল ১৮৯

(২০) শায়েখ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী রহ. ১৮৯
জন্ম ও বংশ-ক্রম ১৮৯
শায়েখের সন্ধানে ১৮৯
বয়াত ও খেলাফত ১৯০
কারামত ১৯১
ইন্তিকাল ১৯১

(২১) শায়েখ জালালুদ্দীন কাবিরুল আউলিয়া রহ. ১৯১
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৯১
তরিকতের সন্ধানে ১৯২
যুহুদ ও নির্মোহতা ১৯৩
ইন্তিকাল ১৯৩

(২২) শায়েখ আহমদ আব্দুল হক রুদাউলবী রহ. ১৯৪
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৯৪
জাহেরী তালীম ১৯৪
শায়েখে সন্ধানে ১৯৫
বিভিন্ন ঘটনা ১৯৫
ইন্তিকাল ১৯৭

(২৩) হযরত খাজা আরেফ ইবনে আহমদ আব্দুল হক রহ. ১৯৭
ইন্তিকাল ১৯৭

(২৪) শায়েখ মুহাম্মাদ বিন শায়েখ আরেফ ১৯৮
ইন্তিকাল ১৯৯

(২৫) হযরত শায়খুল মাশায়েখ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. ১৯৯
শিক্ষাদীক্ষা ১৯৯
বয়াত ও ইরাদাত ২০০
সামার শর্তাবলি ২০০
কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা ২০৩
ঔরসজাত সন্তান ২০৬
ইন্তিকাল ২০৬
খলিফাবৃন্দ ২০৭

www.maktabatulabrar.com

(২৬) শায়েখ জালালুদ্দীন ইবনে মাহমুদ ওমরী থানেশ্বরী রহ. ২০৭
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২০৭
শিক্ষাদীক্ষা ২০৭
বয়াত ও ইবাদাত ২০৮
কারামাত ২০৯
ইন্তিকাল ২১০

(২৭) শায়েখ নেজামুদ্দীন ইবনে আব্দুশ শাকুর থানেশ্বরী রহ. ২১০
বয়াত ও খেলাফত লাভ ২১১
লিখিত কিতাবাদি ২১২
ইন্তিকাল ও মাজার ২১২

(২৮) শাহ আবু সাঈদ নোমানী নওশেরওয়ানী গাঙ্গুহী রহ. ২১২
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২১২
বলখে রওয়ানা ২১২
ইন্তিকাল ২১৫

(২৯) শায়েখ খাজা মুহিব্বুল্লাহ ওমরী ইলাহাবাদী রহ. ২১৫
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২১৫
শায়েখের সন্ধানে ২১৬
উদ্দেশ্য সাধনা ২১৬
খেলাফতের সাতটি পদ্ধতি ২১৭

(৩০) মাওলানা শায়েখ সাইয়েদ মুহাম্মাদী আকবরাবাদী রহ. ২১৭
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২১৭

(৩১) শাহ মুহাম্মাদ মক্কী জাফরী ইবনে শাহ মুহাম্মাদী রহ. ২১৮

(৩২) শাহ আদজুদ্দীন ইবনে শায়েখ হামেদ রহ. ২২০
গুণাবলী ২২০

(৩৩) শায়েখ আব্দুল হাদি ইবনে শায়েখ মুহাম্মাদ হাফেজ রহ. ২২১
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২২১
তালীম তরবিয়ত ২২১
বয়াত ও খেলাফত ২২২

(৩৪) শাহ আব্দুল বারি সিদ্দিকী ইবনে শায়েখ জহুরুল্লাহ রহ. ২২৩
ইন্তিকাল ২২৩

(৩৫) শায়েখ আলহাজ আব্দুর রহিম রহ. ২২৩
(৩৬) হযরত মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ ঝাঞ্ঝানবী রহ. ২২৪
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২২৪
শিক্ষাদীক্ষা ২২৪
বয়াত ও খেলাফত ২২৫
দীনী খেদমত ২২৬
দৈহিক গঠন ২২৬
একটি মোবারক স্বপ্ন ২২৭
জিহাদের আকর্ষণ ২২৭
শেষ দিনগুলো ২২৮
কাশ্‌ফ-কারামত ও বিভিন্ন ঘটনা ২২৯
খলিফাগণ ২৩২
(৩৭) হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ২৩৩
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২৩৩
শিক্ষাদীক্ষা ২৩৪
বয়াত ও খেলাফত ২৩৫
লোকালয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা ২৩৬
মদিনা মুনাওয়ারা অভিমুখে ২৩৬
তালীম-তালকীন ২৩৭
খলিফাগণ ২৩৮
হিজরতের তামান্না ২৩৮
শামেলী যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৩৯
হাজি সাহেবের কতিপয় কারামত ২৩৯
আল্লাহ পাকের অপার কারিশমা ২৪০
হেজাযের উদ্দেশ্যে ২৪১
রূহানী খাবার ২৪২
তিনি ছিলেন ইলমে ওয়াহাবীপ্রাপ্ত ২৪৩
রিয়াজত ও মুজাহাদা ২৪৩
ইন্তিকাল ২৪৪

www.maktabatulabrar.com

কিতাবাদি ২৪৪
কতিপয় ঘটনা ২৪৫
মালফুজাত ২৪৮
(৩৮) ইমামে রব্বানী মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. ২৫২
জন্ম ও শৈশব ২৫৩
সম্মানিত পিতামাতা ২৫৩
জাহেরী বাতেনী তরবিয়ত ২৫৪
শিক্ষাদীক্ষা ২৫৪
ইমামে রাব্বানীর জ্ঞানসাধনা ২৫৫
দরস-তাদরীস ২৫৬
সুলুকের পথে সূচনা ২৫৬
বয়াত ও খেলাফত ২৫৮
মুরশিদের পরীক্ষা ২৫৯
শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর খানকায় ২৬০
ইমামে রব্বানীর মামুলাত ২৬০
প্রখর স্মৃতিশক্তি ২৬২
এরই নাম তাকওয়া ২৬২
হযরত গাঙ্গুহীর চিঠি ২৬৩
হজের সফর ২৬৪
দীর্ঘ রোগভোগ ২৬৪
হজের দ্বিতীয় সফর ২৬৫
দু'টি কারামাত ২৬৫
হাজী সাহেবের সান্নিধ্যে ২৬৬
তৃতীয় হজ ২৬৭
ইন্তিকাল ২৬৮
দু'টি শুভ স্বপ্ন ২৬৯
ইমামে রব্বানীর কতিপয় ঘটনা ২৭০
হযরতের কতিপয় বাণী ২৭৫
হযরতের খলিফাগণ ২৭৮
(৩৯) শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. ২৭৮
জন্ম ও বংশ-পরিচয় ২৭৮
শিক্ষা-দীক্ষা ২৭৯

মদিনায় হিজরত.. ২৮০
হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন ২৮১
দরসের বৈশিষ্ট্য ২৮২
বয়াত ও খেলাফত ২৮৩
রুহানী তালীম-তরবিয়ত.. ২৮৪
পরিবার-পরিজন ২৮৫
তাওয়াক্কুলের জীবন ২৮৬
রাজনৈতিক খেদমত.. ২৮৭
ইন্তিকাল ২৮৮
সমকালীন আলেমদের দৃষ্টিতে.. ২৮৮
তাকওয়া ও তাহারাত ২৮৯
হযরত মাদানীর মামুলাত ২৯০
সুন্নাতে প্রতি আকর্ষণ.. ২৯০
কয়েকজন মনীষীর স্মৃতিচারণ.. ২৯১
উস্তাদের খেদমত ২৯৩
চল্লিশ হাজার রুপিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান.. ২৯৪
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের লেটারফর্ম ২৯৪
সব কাজে সুন্নাতের অনুসরণ.. ২৯৫
হযরত মাদানীর মহানুভবতা.. ২৯৬
হযরত মাদানীর বিনয় ২৯৭
হযরত মাদানীর উদারতা ২৯৮
একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ২৯৯
ফুলের ডালা.. ২৯৯
তাহাজ্জুদের পাবন্দি.. ৩০০
হযরত থানবীর প্রতি মহব্বত.. ৩০০

(৪০) হাকিমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী ..... থানবী রহ. ৩০১
জন্ম ও বংশ-পরিচয়.. ৩০১
পিতৃকুল ও মাতৃকুল ৩০২
এলহামী নাম.. ৩০৩
প্রতিপালন ৩০৪

শৈশবের প্রবণতা ৩০৫
পিতার দূরদর্শিতা.. ৩০৬
শিক্ষা-দীক্ষা ৩০৭
উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেওবন্দে ৩০৭
সর্ব বিষয়ে পারদর্শিতা ৩০৮
তাসাওউফের প্রতি আকর্ষণ ৩০৯
দরস-তাদরীস ৩১০
জামেউল উলুমে কয়েক বছর ৩১১
দরসদান পদ্ধতি ৩১২
বুযুর্গানে দীনের সোহবত ৩১৩
হাজী সাহেবের খেদমতে ৩১৫
দ্বিতীয় হজ ৩১৬
১৩১৫ পর্যন্ত কানপুরে ৩১৭
স্থায়ীভাবে থানাভবনে ৩১৮
শরীয়ত ও তরিকতের সুসমন্বয়.. ৩১৯
পারিবারিক জীবন ৩২১
এসলাহের প্রচলিত ধারণা খণ্ডন.. ৩২১
তরিকতের খোলাসা.. ৩২২
মারেফতের ঝরনাধারা.. ৩২৩
হযরত থানবীর খলিফাবৃন্দ ৩২৪
মারকায ও ইমামের জরুরত.. ৩২৪
কায়েদ আজমের দীনী তরবিয়ত.. ৩২৫
ইসলাম শিখায় প্রকৃত সভ্যতা.. ৩২৫
ঈমানদার বান্দা.. ৩২৬
হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারে সতর্কতা ৩২৬
গায়ের মুকাল্লিদের তওবা.. ৩২৭
যিগর মুরাদাবাদির তওবা.. ৩২৭
আখেরাতের প্রস্তুতি ৩২৮
অসুখ-বিসুখ.. ৩২৯
শেষ মুহূর্তে নামাজ ও হুকুকুল ইবাদের ফিকির ৩৩০
খাজা সাহেবের স্মৃতিচারণ.. ৩৩০
গ্রন্থপঞ্জী.. ৩৩২

www.maktabatulabrar.com

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

তাসাওউফ তথা তায্কিয়া ও সুহ্বাতুস্ সালিহীন-এর প্রয়োজন[১]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শরীয়তের বিধি-বিধান দুই ধরনের। যথা: ১. জাহিরী বিধি-বিধান তথা শরীরের সাথে বা অর্থ-সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান, যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সদকা, ফেতরা, কুরবানী ইত্যাদি। ২. বাতিনী বিধি-বিধান তথা মনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান, যেমন– ইখলাস, সবর, সহিষ্ণুতা, তাওয়াজু', তাওয়াক্কুল, তাকওয়া, শোকর ইত্যাদি অর্জনীয়, আর রিয়া, হুব্বে মাল, বখীলী, লোভ-লালসা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হাছাদ, বুগ্য ইত্যাদি বর্জনীয় বিষয়। এই দ্বিতীয় প্রকার বিধি-বিধানের উপর আমল করা তথা মনের সাথে সম্পর্কিত করণীয় বিষয়াদি করা ও বর্জনীয় বিষয়াদিকে বর্জন করার অপর নাম 'তায্কিয়া' তথা আত্মশুদ্ধি। একে তাসাওউফ সাধনা, আধ্যত্মিক সাধনা ইত্যাদি বলেও পরিচয় দেয়া হয়ে থাকে।

এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনের দিকে ইংগিত করে এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.» (رواه البخاري في باب فضل من استبرأ لدينه حديث رقم ٥٢)

অর্থাৎ, জেনে রাখ, শরীরে একটা মাংসখণ্ড রয়েছে সেটা যখন ঠিক থাকে গোটা শরীর ঠিক থাকে, আর সেটা যখন অকেজো হয়ে যায় গোটা শরীর অকেজো হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হচ্ছে কলব তথা হৃৎপিণ্ড। (বোখারী শরীফ: হাদীছ নং ৫২)

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, জাহিরী কলব তথা হৃৎপিণ্ড ঠিক না থাকলে যেমন গোটা শরীর অকেজো হয়ে যায়, শরীরের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকাণ্ড নষ্ট হয়ে যায়,

১. 'চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখ' গ্রন্থটি তাসাওউফ-এর প্রসিদ্ধ ৪ সিলসিলার মধ্যে প্রসিদ্ধতম সিলসিলা চিশতিয়া সিলসিলা-র শায়খদের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ। সিলসিলা-র শায়খদের ইতিহাস সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হল মানুষকে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা। এই আধ্যাত্মিক সাধনাকে তায্কিয়াও বলা হয়। সুহবাতুস 'সালিহীন-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করা সহজ হয়। এসব কারণে 'তাসাওউফ তথা তায্কিয়া ও সুহ্বাতুস্ সালিহীন-এর প্রয়োজন' সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতেই আমি গ্রন্থের শুরুতে আমার রচিত 'তাসাওউফ তথা তায্কিয়া ও সুহ্বাতুস্ সালিহীন-এর প্রয়োজন' শীর্ষক এ লেখাটি সংযোজন করে দিলাম। –সম্পাদক

www.maktabatulabrar.com

তেমনি একটা বাতিনী কলব তথা মন রয়েছে সেটা ঠিক না থাকলে তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আমলও অঠিক হয়ে যায়। অর্থাৎ মনের শুদ্ধি না ঘটালে মনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আমলও অশুদ্ধ হয়ে যায়। সারকথা এ হাদীছে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে।

এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন ও গুরুত্ব কেন তা আমি চার আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক.

শরীয়তে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ তাআলা এই আত্মশুদ্ধির কার্যক্রমকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.﴾ (الآية ١٦٤ من سورة آل عمران)

অর্থাৎ, আল্লাহ তো মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তাদের তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়। আর নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (সূরা আলে ইমরান: ১৬৪)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.﴾ (الآية ١٥١ من سورة البقرة)

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তোমাদের তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমরা যা জানতে না তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়। (সূরা বাকারা: ১৫১)

এই দুই আয়াতে উল্লেখিত 'তাযকিয়া' (পবিত্র করা) কথাটার ব্যাখ্যা মুফাসসিরীনে কেরাম এভাবে করেছেন– কুফর, শিরক, যাবতীয় পাপ ও মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র করা এবং উত্তম চরিত্র ও উত্তম কর্ম দ্বারা শুচিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তায্কিয়ার এ ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়

আত্মশুদ্ধির বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। যাহোক আয়াতদ্বয়ে তিলাওয়াত ও তালীমের পাশাপাশি তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কার্যক্রমকেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যা দায়িত্ব উলামা ও সুলাহায়ে কেরামেরও তাই দায়িত্ব। কেননা উলামা ও সুলাহা হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিছ, নায়েব বা প্রতিনিধি। আর বলা বাহুল্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উলামা ও সুলাহা কর্তৃক এ দায়িত্ব এ জন্যই পালন করা যে, উম্মত সেটাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী যা করার তা করবে এবং যা বর্জন করার তা বর্জন করবে।

দুই.

তায্‌কিয়া তথা আত্মার সাথে সম্পর্কিত করণীয় বিষয় করা ও বর্জনীয় বিষয় বর্জন করা–এক কথায় বাতিনী বিধি-বিধানের উপর আমল করা–ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিধি-বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিধি-বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি ইখলাস, সবর, সহিষ্ণুতা, তাওয়াজু', তাওয়াক্কুল, তাকওয়া, শোকর ইত্যাদি বাতিনী বিধি-বিধানেরও নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ কর্তৃক কোন বিষয়ের নির্দেশ দান সে বিষয় ওয়াজিব হওয়াকেই বোঝায়। নিম্নে বাতিনী বিধি-বিধান ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত লক্ষ করুন–

(১) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.﴾ (الآية ١١٩ من سورة التوبة)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা তাকওয়া অর্জন কর এবং (যারা কথায় ও কাজে) সত্যপন্থী তাদের সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা তাওবা: ১১৯)

(২) ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.﴾ (الآية ١٧٥ من سورة آل عمران)

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই হচ্ছে তোমাদের সেই শয়তান যে (তোমাদেরকে) তার অনুসারীদের ভয় দেখায়; কিন্তু যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

www.maktabatulabrar.com

(৩) ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.﴾ (الآية ١٥٠ من سورة البقرة) وقوله : ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ.﴾ (الآية ٤٠ من سورة البقرة)

অর্থাৎ, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারা: ১৫০) আর তোমরা আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারা: ৪০)

(৪) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.﴾ (الآية ٥ من سورة البينة)

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছে আল্লাহ আনুগত্যে ইখলাসের অধিকারী হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। (সূরা বাইয়্যেনাহ: ৫)

(৫) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.﴾ (الآية ٢٠٠ من آل عمران)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আলাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আলে ইমরান: ২০০)

(৬) ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ.﴾ (الآية ٨٤ من سورة يونس)

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো, তবে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হতে চাও। (সূরা ইউনুস: ৮৪)

(৭) ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.﴾ (الآية ١٥٢ من سورة البقرة)

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার শোকর আদায়কারী হও না-শোকরগোযার হয়ো না। (সূরা বাকারা: ১৫২)

এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যথাক্রমে তাকওয়া, খাওফ ও খাশিয়্যাত (আল্লাহ-ভীতি), ইখলাস, সবর, তাওয়াক্কুল ও শোকরের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর বিধিবদ্ধ মূলনীতি অনুসারে কোন বিষয়ে নির্দেশ সে বিষয় ওয়াজিব হওয়াকে বোঝায়। অতএব প্রমাণিত হল তায্‌কিয়া সংক্রান্ত এসব বিধান ওয়াজিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এসব আয়াতে তায্‌কিয়ার যেসব বিষয় করণীয় সে সম্পর্কিত কয়েকটি ভাষ্য (আয়াত) উল্লেখ করা হল। এবার তায্‌কিয়ার যেসব বিষয় বর্জনীয় সে সম্পর্কিত কয়েকটি ভাষ্য (হাদীছ) লক্ষ করুন।

(১) عن جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ.» (أخرجه البخاري في باب الرياء والسمعة حديث رقم ٦٤٩٩)

অর্থাৎ, হযরত জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছুম্‌আ তথা শোনানোর জন্য করে আল্লাহ তারটা শুনিয়ে দেন এবং যে রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য করে আল্লাহ তারটা দেখিয়ে দেন। (বোখারী, হাদীছ নং ৬৪৯৯)

(২) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ. »

(أخرجه البخاري في كتاب الرقاق حديث رقم ٦٤٢٠)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বৃদ্ধদের অন্তর দুই ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান থাকে: দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আশা। (বোখারী, হাদীছ নং ৬৪২০)

(৩) عن أنس بن مالك قال : قال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يهرم بن آدم ويبقى منه اثنتان – الحرص وطول الأمل.» (السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم ٦٢٩٨).

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদম বৃদ্ধ হয়ে যায় তবে তার দুটো জিনিস রয়ে যায় (যা বৃদ্ধ হয় না) তা হল লোভ-লালসা ও দীর্ঘ আশা। (বায়হাকী কৃত আস-সুনানুল কুবরা, হাদীছ নং ৬২৯৮)

(8) عن أبي بكر الصديق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ ولا مَنَّانٌ ولا بَخِيلٌ». (رواه الترمذي حديث رقم ١٩٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না ফেরেববাজ, আর না দান করে যে খোঁটা দেয়, আর না বখীল। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৬৩)

(৫) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

www.maktabatulabrar.com

وَسَلَّمَ– قَالَ : «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». (رواه مسلم برقم ١٤٧)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে যার্‌রা পরিমাণ (অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ) অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৭)

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي، قَالَ : «لَا تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ : «لَا تَغْضَبْ». (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦١١٦)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করল, আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি গোস্বা করো না। সে কয়েকবার তার ঐ একই আবেদন জানাল আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রত্যেকবারই) বললেন, তুমি গোস্বা করো না। (বোখারী, হাদীছ নং ৬১১৬)

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ».(رواه أبو داود حديث رقم ٤٨٩٥)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা হাছাদ (পরশ্রীকাতরতা) থেকে বেঁচে থাক। কেননা হাছাদ নেক আমলাদিকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যেমন আগুন জ্বালানী কাঠকে গ্রাস করে ফেলে। (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৯৫)

এসব হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাক্রমে ছুম্‌আ তথা মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে আমল করা, রিয়া তথা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা, হুবেব জাহ ও মাল তথা সম্মান ও সম্পদ প্রীতি, হির্‌স তথা লোভ-লালসা, অহংকার, গোস্বা ও হাছাদ (পরশ্রী-কাতরতা) ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এই সতর্কীকরণ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব হওয়াকে প্রতিপন্ন করে।

তিন

তায্‌কিয়া তথা বাতিনী বিধি-বিধান বর্জন করা দ্বারা জাহান্নাম অবধারিত হয়ে দাঁড়ায় যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী আহকাম বর্জন করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাআলা যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী আহকাম বর্জন করলে জাহান্নামের ধমক ও শাসানী প্রদান করেছেন তেমনি তায্‌কিয়া অর্জন না করলে তথা বাতিনী বিধি-বিধান বর্জন করলেও জাহান্নামের ধমক ও শাসানী প্রদান করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.﴾ (الآيات ٦٠-٦١ من سورة الزمر)

অর্থাৎ, তাকাব্বুরকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? আল্লাহ তাকওয়ার অধিকারীদেরকে সফলতা সহকারে উদ্ধার করবেন; না দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে আর না তারা চিন্তিত হবে। (সূরা যুমার: ৬০-৬১)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তায্‌কিয়া তথা বাতিনী বিধি-বিধান বর্জন করলে জাহান্নামের ধমক ও শাসানী প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীছ লক্ষ করুন।

(১) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». (رواه مسلم برقم ١٤٧)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে যাররা পরিমাণ (অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ) অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৭)

(২) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ». (رواه البزار في مسنده حديث رقم ٤٣ في مسند زيد بن أرقم)

অর্থাৎ, হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অধীনস্থ দাস-দাসীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসনাদে বাযযার, হাদীছ নং ৪৩)

www.maktabatulabrar.com

(৩) عن أبي بكر الصديق عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ ولا مَنَّانٌ ولا بَخِيلٌ». (رواه الترمذي حديث رقم ١٩٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না ফেরেববাজ, আর না দান করে যে খোঁটা দেয়, আর না বখীল। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৬৩)

(৪) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْكُمْ إِلاَّ رَحِيمٌ»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّنَا رَحِيمٌ، قَالَ : لَيْسَ رَحْمَةُ أَحَدِكُمْ نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْحَمَ النَّاسَ. (الآداب للبيهقي برقم ٣٣)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে যে দয়ালু নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকেই তো দয়ালু। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শুধু নিজের প্রতি এবং নিজের পরিবারবর্গের প্রতি দয়া করলেই চলবে না, যতক্ষণ না গোটা মানবজাতির প্রতি দয়া করবে। (বায়হাকী কৃত আল-আদাব, হাদীছ নং ৩৩)

চার.

মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী যেমন জাহিরী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল, তেমনি মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী বাতিনী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপরও নির্ভরশীল। প্রথম বিষয়ের দলীল আল্লাহর বাণী–

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (الآيات ١-٩ من سورة المؤمنون)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে, যারা যাকাত

দানে সক্রিয়, আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাভূক্ত দাসীদের থেকে ব্যতিক্রম। কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে এমন লোকেরা হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা তাদের (দায়িত্ব গৃহীত) আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, আর যারা নিজেদের নামাযসমূহের পাবন্দী করে। (সূরা মুমিনূন: ১-৯)

এসব আয়াতে মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী জাহিরী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল- এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়ের দলীল আল্লাহর বাণী-

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الآيات ٧-١٠ من سورة الشمس)

অর্থাৎ, শপথ নফ্সের এবং তাঁর যিনি তাকে সুসমঞ্জস করেছেন, অতঃপর তাতে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের চেতনা সঞ্চারিত করেছেন। যে তাকে (সেই নফসকে) পরিশুদ্ধ করবে সে অবশ্যই সফলকাম হবে। আর যে তাকে কলুষিত করবে সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। (সূরা শাম্স: ৭-১০)

এসব আয়াতে মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী বাতিনী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল- এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

এক স্থানে জাহিরী ও বাতিনী উভয় ধরনের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী নির্ভরশীল থাকার কথা একসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.﴾ (الآيات ١٤-١٧ من سورة الأعلى)

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে সফলকাম হবে যে পবিত্র হয় এবং তার প্রতিপালককে স্মরণ করে ও নামায পড়ে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো। অথচ আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। (সূরা আ'লা: ১৪-১৭)

যাহোক এতক্ষণের আলোচনায় প্রতীয়মান হল, তায্কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির বিষয়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টা আদৌ এমন নয় যেমনটা কিছু লোক মনে করে থাকে। তারা এটাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে, এর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। তারা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিধানাবলীর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তারা বিশ্বাস করে এগুলো

www.maktabatulabrar.com

জরুরি, এগুলো মান্য করা ব্যতীত নাজাত হবে না। কিন্তু বাতিনী বিধানাবলীকে তেমন গুরুত্বের মনে করে না, সেগুলোর প্রতি তেমন বিশ্বাস রাখে না। অথচ জাহিরী বাতিনী উভয় ধরনের বিধানেরই গুরুত্ব সমান, যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

তায্কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় এই তায্কিয়া তথা আত্মশুদ্ধি কীভাবে অর্জন করা যাবে। এ ব্যাপারে শুধু জ্ঞান অর্জন, আগ্রহ ও নিয়ত থাকলেই কি চলবে, না এর জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এর উত্তর হল- জ্ঞান অর্জন, আগ্রহ, নিয়ত অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ যথেষ্ট নয়। কেননা অনেক সময় কোন ব্যক্তির মধ্যে আত্মিক রোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা টের পায় না। আর টের না পেলে কীভাবে ইসলাহ বা সংশোধন করবে? কখনও এমন হয় যে, কিছু একটা রোগ আছে অনুভব করলেও সেটা যে কী রোগ তা যথাযথ নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। হয়তো রয়েছে অহংকার অথচ সেটাকেই সে মনে করছে তাওয়াজু। এটা হল তাওয়াজুর সুরতে অহংকার। কিংবা হয়তো রয়েছে বংশীয় বা গোত্রীয় গোঁড়ামী অথচ সেটাকেই সে ধর্মীয় আত্মমর্যাদা মনে করে বসে আছে। কিংবা ধর্মীয় কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রয়েছে অথচ সেটাকেই সে ধর্মের উপর মজবূতী বা দৃঢ়তা মনে করে বসে আছে। অথবা কোন বিষয়কে ধর্মীয় ছাড় মনে করে বসে আছে অথচ সেটা ধর্মের ছাড় নয় বরং সেটা হল ধর্মের ব্যাপারে তার শিথিলতা বা প্রান্তিকতা। এভাবে রোগ নির্ণয়ে প্রচুর বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তদুপরি সব আত্মিক রোগের চিকিৎসাও এক নয়, একজনের বেলায় যে চিকিৎসা পদ্ধতি যুৎসই অন্যের বেলায় সেটা তেমন যুৎসই নয়। এমনিভাবে একই চিকিৎসা ব্যবস্থা সর্বাবস্থায় কার্যকরী হয় না, এক অবস্থায় যে পদ্ধতি চলে অন্য অবস্থায় সে পদ্ধতি তেমন কার্যকর না। এভাবে রোগনির্ণয় ও চিকিৎস-াব্যবস্থা নির্ণয়ে অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এই শাস্ত্রের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক ব্যতীত অন্যরা যেসব সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় বিজ্ঞ মুসলিহ (ইসলাহকারী) তথা শাইখে তরীকতের সুহবত বা সাহচর্য গ্রহণের। শাইখে তরীকত তার এই শাস্ত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে রোগ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসা বলে দিতে সক্ষম হন। এ থেকেই সালিহ ও মুসলিহ ব্যক্তি তথা শাইখে তরীকতের সাহচর্য গ্রহণের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই মুসলিম সমাজে পীর-মুরীদির

পদ্ধতি চালু হয়েছে। এটাকেই আরবীতে বলে, 'সুহ্‌বাতুস্ সালিহীন' তথা নেককার পরহেযগার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ।

সালিহ ও মুসলিহ ব্যক্তি তথা শাইখে তরীকতের সাহচর্য গ্রহণের প্রয়োজনের দিকে ইশারা করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে–

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.﴾

অর্থাৎ, তুমি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। (সূরা ফাতিহা: ৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'সিরাতে মুস্তাকীম' (সঠিক পথ)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, সেটা হল আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ। আর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বলে বোঝানো হয়েছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনকে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ.﴾ (الآية ٦٩ من سورة النساء)

অর্থাৎ, তারা হল ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহপ্রাপ্ত করেছে। তারা হল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণ। (সূরা নিছা: ৬৯)

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা 'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সঠিক পথ–এর পরিচয় দিতে গিয়ে এভাবে বলেননি যে, 'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সঠিক পথ হল কুরআন সুন্নাহর পথ। অথচ এভাবে বললে কথাটি বোঝার জন্য সহজ ছিল। কিন্তু তিনি সেভাবে না বলে বলেছেন, 'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সঠিক পথ হল অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ। এভাবে বলে ইশারা করা হয়েছে যে, সিরাতে মুস্তাকীম চিনতে হলে রিজালুল্লাহ তথা অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সাহায্যে চিনতে হবে। সিরাতে মুস্তাকীম চেনার জন্য, বৃহত্তর অর্থে হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ তথা আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট নয় রিজালুল্লাহর (আল্লাহর পথের খাঁটি ব্যক্তিবর্গের)ও প্রয়োজন রয়েছে। কিতাবুল্লাহকে বুঝতে হবে রিজালুল্লাহর ব্যাখ্যার আলোকে। সিরাতে মুস্তাকীমের দুআর পর এই রিজালুল্লাহর উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, সিরাতে মুস্তাকীমে চলতে হলে রিজালুল্লাহ তথা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের, ভিন্ন ভাষায় আল্লাহর পথের খাঁটি ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের সুহবত তথা সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। এটাই হল সুহবাতুস সালিহীন-এর প্রয়োজন বর্ণনা।

www.maktabatulabrar.com

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী তাফসীরে কাবীরে বলেছেন–

وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول –إلى مقامات الهداية والمكاشفة– إلا إذا اقتدى بشيخ يَهْدِيْهِ إلى سواء السبيل ويُجَنِّبُه عن مواقع الأغاليط والأضاليل، وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق، وعقولُهُم غيرُ وافيةٍ بإدراك الحق وتمييزِ الصواب عن الغلَط، فلا بدّ من كامل يَقْتَدِي به الناقص حتى يتقوى عقلُ ذلك الناقصِ بنور عقل ذلك الكامل؛ فحينئذٍ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات.

অর্থাৎ, এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মুরীদের পক্ষে হেদায়েত ও দ্বীন বিকাশমানতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হলে শায়খের অনুসরণ বৈ গত্যন্তর নেই। শায়খ তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিবেন, তাকে ভুল-ভ্রান্তির স্থান থেকে দূরে রাখবেন। শায়খের অনুসরণ বৈ গত্যন্তর নেই এ কারণে যে, অনেক মানুষেরই প্রচুর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, এবং তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা সঠিক আর অঠিকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে পূর্ণ পারঙ্গম হয় না। তাই ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে ত্রুটিমুক্ত ব্যক্তি তথা কামেল ব্যক্তির অনুসরণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যাতে ওই কামেল ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের জ্যোতিতে ওই ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা জ্যোতির্মান ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে আর এভাবে সে পরিপূর্ণতা ও সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে উপনীত হতে পারে।

সুহবাতুস সালিহীন-এর প্রয়োজন জ্ঞাপক আরও স্পষ্ট দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ.﴾ (الآية ١١٩ من سورة التوبة)

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা তাকওয়া অর্জন কর এবং সত্যপন্থীদের সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা তাওবা: ১১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ প্রদানের পর সত্যপন্থীদের সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সত্যপন্থী বলতে বোঝায় যারা তাদের দ্বীন, নিয়ত, আমল ও মুআমালা মুআশারা সবকিছুতে সত্যের উপর থাকেন। সহজ কথায় আমরা যাদেরকে বুযুর্গ বলে থাকি। এভাবে আয়াতে ইশারা করা হয়েছে, তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে সুহবাতুস সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্যের বিশেষ কার্যকরী প্রভাব রয়েছে।

বস্তুত সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্য শুধু তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রেই কার্যকরী প্রভাব ফেলে না, বরং দ্বীনী সব ধরনের চেতনা উদ্রেক করে দেয়ার ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে থাকে। নিম্নের তিনটি হাদীছের বক্তব্য দেখুন–

(১) عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَىْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ». (رواه أبو داود في باب من يؤمر أن يجالس حديث رقم ٤٨٢١، وسكت عنه هو والمنذري بعده.)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন যে কুরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল গোড়া লেবুর মত, যার ঘ্রাণও সুন্দর স্বাদও সুন্দর। আর মুমিন যে কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হল খেজুরের মত, যার স্বাদ সুন্দর কিন্তু তার কোনো ঘ্রাণ নেই। আর যে পাপী ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল রায়হানা (ফুল বা লতা)-এর মত, যার ঘ্রাণ সুন্দর কিন্তু তার স্বাদ তিক্ত। আর যে পাপী কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হল মাকাল ফলের মত, যার স্বাদও তিক্ত আবার তার কোনো ঘ্রাণও নেই। যে নেককার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা হয় সেই নেককার লোকের উদাহরণ হল যেন এক মেশকওয়ালা, তার থেকে মেশক লাভ করতে না পারলেও তার ঘ্রাণ তুমি পাবে। আর যে বদকার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা হয় সেই বদকার লোকের উদাহরণ হল যেন এক হাপরওয়ালা, তার থেকে কয়লার কালি না লাগলেও ধোঁয়া তো লাগবেই। (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮২১)

(২) عن أَبِي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ

www.maktabatulabrar.com

بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.» (رواه البخاري في باب في العطار وبيع المسك حديث رقم ٢١٠١)

অর্থাৎ, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নেককার বা বদকার লোকের সাহচর্য গ্রহণ করা হয় সেই নেককার ও বদকারের উদাহরণ হল (যথাক্রমে) মেশকওয়ালা ও কর্মকারের হাপরের মত। মেশকওয়ালা থেকে তোমার কিছু না পাওয়া হবে না; হয় তার থেকে মেশক ক্রয় করবে নতুবা তার ঘ্রাণ তো পাবেই। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার শরীর বা কাপড় জ্বালাবে কিংবা অন্তত তার উৎকট গন্ধ তো পাবেই। (বোখারী, হাদীছ নং ২১০১)

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم : مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللَّهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ.» (المطالب العالية باب مثل الجليس الصالح برقم ٢٧٧٣، لعبد بن حميد وأبي يعلى (. وهذا الإسناد رواته ثقات كما في إتحاف الخيرة برقم ٦٠٥٩)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যাদের সাহচর্য গ্রহণ করি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, যার দর্শন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথা তোমাদের আমলের মধ্যে বর্দ্ধন ঘটায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (আল-মাতালিবুল আলিয়া, হাদীছ নং ২৭৭৩)

সারকথা– সুহবাতুস সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্য তাকওয়াসহ দ্বীনী সব ধরনের চেতনা উদ্রেক করে দেয়ার ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। অতএব তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য সুহবাতুস সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্য অবলম্বনের প্রয়োজন ও ফায়দা অনস্বীকার্য। এই বুযুর্গদের সাহচর্য গ্রহণকেই বলা হয় পীর-মুরীদী। আর যে শাস্ত্রে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ও পূর্বসূরী বুযুর্গদের অনুসৃত নীতিমালার আলোকে পীর-মুরীদির নিয়ম-নীতি ও আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় সে শাস্ত্রকে বলা হয় 'তাসাওউফ'। শায়খ মুহাম্মাদ আমীন কুরদী নকশবন্দী (রহ.) তাসাওউফ-এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–

"التصوفُ هو عِلْمٌ يُعْرَفُ به أحوالُ النفس محمودُها ومذمومُها وكيفيةُ تطهيرِها

من المذموم منها وتحليتها بالاتصاف بمحمودها."

অর্থাৎ, তাসাওউফ হচ্ছে এমন শাস্ত্র যার দ্বারা আত্মার ভাল-মন্দ চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায় এবং মন্দ চরিত্র থেকে আত্মাকে পবিত্র করার উপায় ও ভাল চরিত্রে আত্মাকে মণ্ডিত করার কৌশল বুঝা যায়।

যাহোক তাসাওউফ ও তাযকিয়ার উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে এ কথা আমাদের সামনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, তাসাওউফ ও তায্কিয়ার আমল-শোগলে লিপ্ত হওয়া শরীয়তে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দ্বারা দ্বীনের আমল ও শরীয়তের আদবসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা ব্যক্তিকে ইহ্ছানের মাকামে (স্তরে) পৌঁছে দেয়, যে ইহ্ছানের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে রসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.»

অর্থাৎ, 'ইহ্ছান' হল তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, বস্তুত তুমি আল্লাহকে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (বোখারী) এই ইহ্ছানের মাকামই হচ্ছে তাসাওউফের পথের সালেকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাসাওউফ ও তাযকিয়ার আমল-শোগলে লিপ্ত হয়ে আত্মাকে কলুষমুক্ত করার ও আত্মিক গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। হককে হক হিসেবে বুঝে তার অনুসরণ করার ও বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করে তা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

চিশতিয়া তরীকাসহ তাসাওউফ-এর চার তরীকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

www.maktabatulabrar.com

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তরীকার বহু সিলসিলা চালু রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে ১৮০টির মত সিলসিলার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের উপমহাদেশেও অনেক সিলসিলা চালু রয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি সিলসিলা (তরীকা) অধিকতর প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে সে ৪টির পরিচয় নিম্নরূপ:

১. কাদেরিয়া তরীকা। এ তরীকাটি শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত। শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ৪৭০ হিজরিতে পারস্যের জীলান/গীলান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

২. চিশতিয়া তরীকা। এ তরীকাটি সুলতানুল হিন্দ খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত। তিনি ৬৩৬ হিজরিতে ইরানের সীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৬১ হিজরিতে ভারতের আজমীরে ইন্তেকাল করেন।

৩. নক্শবন্দিয়া তরীকা। এ তরীকাটি হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী আল-বোখারী (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত। তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি ৭১৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। বোখারা থেকে ৩ মাইল দূরে কাছরাই আরকান নামক গ্রামে তার মাজার অবস্থিত।

৪. মুজাদ্দেদিয়া তরীকা। এ তরীকাটি ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে আল্ফে ছানী (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্ফে ছানী শায়খ আহমদ ফারূকী সেরহেন্দী (রহ.) ৯৭১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৪ হিজরিতে ভারতের সেরহিন্দে ইন্তেকাল করেন।

চিশতিয়া কথাটির ব্যাখ্যা

চিশত খোরাসানের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ শহর। সেখানে কতিপয় বুযুর্গানে দ্বীন রুহানী এসলাহ ও তরবিয়তের একটি বিরাট মারকায কায়েম করেছেন। সেটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেই নেজামকে স্থানের দিকে নিসবত করে চিশতী সিলসিলা বা চিশতিয়া তরীকা বলা হয়। শাজারাতুল আনওয়ার গ্রন্থে আছে, চিশত নামে দুটি জায়গা প্রসিদ্ধ। একটি খোরাসানের হেরাতে[১] অন্যটি হিন্দুস্তানের আউচ ও মুলতানের মাঝে।

১. বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি শহর।–সম্পাদক

চিশতী খাজাদের সম্পর্ক অবশ্য খোরাসানের হেরাতের সঙ্গে।[১]

উপমহাদেশে চিশতিয়া সিলসিলার আগমন ও অবদান

ইসলামী বিশ্বের কাছে হিন্দুস্তানের বিজয় একটি নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের চেয়ে কম বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী ঘটনা ছিল না। যদিও প্রথম হিজরী শতাব্দীতেই এখানে ইসলামের সাহসী যোদ্ধারা আসতে শুরু করে। এমনকি ৯৩ হিজরিতে মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ছাক্বাফী সিন্ধ থেকে মুলতান পর্যন্ত পুরো এলাকা তরবারী ও চারিত্রিক মাধুর্যে জয় করে নেন। আবার হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম দায়ীরা ছোট ছোট দ্বীপসদৃশ খানকা কায়েম করে নেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানের নিরঙ্কুশ বিজয়ের গৌরব-মুকুট শোভা পায় সুলতান মাহমুদ গজনবীর মাথায়। যিনি ৪২১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। আর সুসংহত ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভ করেন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী। যিনি ৬০২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। অবশেষে হিন্দুস্তানের রুহানী জয়, ঈমানী ও আখলাকী বিজয় অর্জিত হয় শাইখুল ইসলাম খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর হাতে, যিনি ৬২৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

হিন্দুস্তান বিজয়ের পূর্বেই ইসলামের প্রসিদ্ধ চারটি রুহানী সিলসিলা তথা কাদিরিয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়ার উদ্ভব হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে চার সিলসিলা ঈমান ও আমলের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। যথাসময়ে প্রতিটি সিলসিলা হিন্দুস্তানে পৌঁছেছে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবদান রেখেছে। কিন্তু হিন্দুস্তানের রুহানী বিজয় এবং তাতে ইসলামবৃক্ষ রোপনের জন্য আল্লাহ পাক চিশতীয়া সিলসিলাকে নির্বাচন করেছেন। যার সুশীতল ছায়া ও ফুল-ফলে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে।

মূলত চিশতী মাশায়েখদের ওপর হিন্দুস্তানের দাবী ছিল। কারণ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ইরানে এই সিলসিলা বিকশিত হচ্ছিল। তাছাড়া এই সিলসিলার দরদপূর্ণ মেজায ও মহব্বতপূর্ণ আচরণ হিন্দুস্তানীদের দিল জয় করা এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করা ছিল তুলনামূলক সহজ। দরদ-মহব্বত মূলত চিশতী সিলসিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর হিন্দুস্তান সুপ্রাচীন কাল থেকে দরদ-মহব্বত ও প্রেম-ভালোবাসার দেশ।[২]

১. খাজা আবু ইসহাক শামী ছিলেন প্রথম বুযুর্গ যার নামের সঙ্গে চিশতী শব্দ লেখা হয়। খাজা আবু ইসহাক শামীকে প্রথম চিশতী বলা হলেও উপমহাদেশে চিশতিয়া সিলসিলার প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটেছে হযরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশতীর মাধ্যমে। তিনিই ছিলেন হিন্দুস্থানের ইমামে তরিকত এবং চিশতিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা।–সম্পাদক

২. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ২১।

চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখের সংক্ষিপ্ত তালিকা

www.maktabatulabrar.com

হযরত আলী (রা.) থেকে (চিশতিয়া সিলসিলা তার মাধ্যমে রসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছে।) হযরত শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. পর্যন্ত চিশতিয়া তরীকার মোট শায়খ ৩৯ জন। আর হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এরই খলীফা। তার সিলসিলাও আমাদের দেশে ব্যাপক-বিস্তৃত। তাই তাকেসহ মোট ৪০ জন। নিম্নে এই ৪০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল–

১. খলিফায়ে রাশেদ আবুল হাসান হযরত আলী রা.
২. সাইয়েদুল আউলিয়া খাজা আবু সাঈদ হাসান বসরী রহ.
৩. আবুল ফযল খাজা আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ.
৪. খাজা আবু আলী ফুয়াইল ইবনে ইয়ায তামিমী রহ.
৫. সুলতান ইবরাহিম ইবনে আদহাম ইবনে সুলাইমান রহ.
৬. কুতুবুল আলম সাদিদুদ্দীন খাজা হুজাইফা মারআশী রহ.
৭. অলিকুল শিরোমণি খাজা আবু হুবায়রা বসরী রহ.
৮. কুতুবুয যমান খাজা উলু মামশাদ দিনুরী রহ.
৯. শরীফুদ্দীন খাজা আবু ইসহাক চিশতী রহ.
১০. খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী আল হাসানী রহ.
১১. খাজা নাসেহুদ্দীন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু আহমদ রহ.
১২. খাজা আবু ইউসুফ ইবনে সামআন হোসাইনী চিশতী রহ.
১৩. কুতুবুল আকতাব, শামসে সূফিয়া, চেরাগে চিশতিয়া খাজা মওদুদ চিশতী
১৪.খাজা নায়্যিরুদ্দীন শরিফ যিন্দানী রহ.
১৫. ইমামে তরিকত হযরত খাজা উসমান হারুনী রহ.
১৬. গরীবেনওয়ায খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী রহ.
১৭. হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.
১৮. সুলতানুল আরেফীন শেখ ফরিদুদ্দীন গাঞ্জশকর আজুধানী রহ.
১৯. খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবেরী কালিয়ারী রহ.
২০. শায়েখ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী রহ.
২১. শায়েখ জালালুদ্দীন কাবিরুল আউলিয়া রহ.
২২. শায়েখ আহমদ আব্দুল হক রুদাউলবী রহ.
২৩. হযরত খাজা আরেফ ইবনে আহমদ আব্দুল হক রহ.
২৪. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন শায়েখ আরেফ
২৫. হযরত শায়খুল মাশায়েখ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.

২৬. শায়েখ জালালুদ্দীন ইবনে মাহমুদ ওমরী থানেশ্বরী রহ.
২৭. শায়েখ নেজামুদ্দীন ইবনে আব্দুশ শাকুর থানেশ্বরী রহ.
২৮. শাহ আবু সাঈদ নোমানী নওশেরওয়ানী গাঙ্গুহী রহ.
২৯. শায়েখ খাজা মুহিবুল্লাহ ওমরী ইলাহাবাদী রহ.
৩০. মাওলানা শায়েখ সাইয়েদ মুহাম্মাদী আকবরাবাদী রহ.
৩১. শাহ মুহাম্মাদ মক্কী জাফরী ইবনে শাহ মুহাম্মাদী রহ.
৩২. শাহ আদজুদ্দীন ইবনে শায়েখ হামেদ রহ.
৩৩. শায়েখ আব্দুল হাদি ইবনে শায়েখ মুহাম্মাদ হাফেজ রহ.
৩৪. শাহ আব্দুল বারি সিদ্দিকী ইবনে শায়েখ জহুরুল্লাহ রহ.
৩৫. শায়েখ আলহাজ আব্দুর রহিম রহ.
৩৬. হযরত মিয়াজী নুর মুহাম্মদ ঝাঞ্ঝানভী রহ.
৩৭. হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ
৩৮. ইমামে রব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.
৩৯. শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.
৪০. হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.

নিম্নে উপরোক্ত ৪০ জন শায়খের জীবনী পেশ করা হল।

(১) খলিফায়ে রাশেদ আবুল হাসান হযরত আলী রা.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

হযরত আলী রা.-এর কুনিয়াত আবু তুরাব ও আবুল হাসান। উপাধী আসাদুল্লাহ। তার বংশক্রম হলো–হযরত আলী ইবনে আবু তালেব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ। তৃতীয় পুরুষে গিয়ে তথা জনাব আব্দুল মুত্তালিবে গিয়ে তার বংশক্রম রসূল সা.-এর সঙ্গে মিলে যায়। সেমতে হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই।

৩৫ হিজরিতে হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পরের দিন তিনি খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। চিশতী সিলসিলা তার মাধ্যমে রসূল সা. পর্যন্ত পৌছে। এমনকি রসূল সা.-এর ফুয়ুয ও বারাকাত তার মাধ্যমে হাসিল হয়। তাই চিশতী সিলসিলায় সাহাবীদের মধ্যে থেকে তাকে বিশেষত উল্লেখ করা হলো।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বংশীয় দিক থেকে যে রসূল সা. থেকে যত দূরে

www.maktabatulabrar.com

খেলাফতপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সে তত কাছে। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা, বংশীয় দিক থেকে রসূল সা. থেকে দূরে, অথচ তিনি প্রথমে খলিফা হয়েছেন। আর বংশীয় দিক থেকে হযরত আলী হলেন সবচে' কাছে, অথচ তিনি খলিফা হয়েছেন সবার পরে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আল ইসাবা গ্রন্থে লেখেন, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার জন্ম রসূল সা.-এর নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে। কৈশোর থেকে তিনি রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এ হিসাবে স্বভাব-চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগিতে তিনি রসূল সা.-এর যতটা সদৃশ ছিলেন অন্য কেউ তেমন ছিলো না। এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তিনি অল্প ক'জন সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত যারা শৈশবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স কত ছিল। ঐতিহাসিকগণ ৫, ৯ ও ১০ বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতেন, আমি সবার চেয়ে সাত বছর আগে নামাজ শুরু করি।[১]

আখলাক ও হালাত

শৈশব থেকে তিনি রসূল সা.-এর স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত হন। ফলে কুদরতিভাবে তিনি ছিলেন উত্তম গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাছাড়া তিনি ছিলেন রসূল সা.-এর উন্নত তরবিয়তের জীবন্ত নমুনা। তার জবান কখনো শিরকী কথাবার্তায় কলুষিত হয়নি। তার কপাল কখনো আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে ঝোঁকেনি। তিনি ছিলেন জাহেলিয়াতের সব গোনাহ থেকে পুতপবিত্র। আরবজাতি মদ্যপানে ছিল আকণ্ঠ নিমজ্জিত, অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের আগেও মদ পান করেননি, পরে তো কল্পনাও করা যায় না।[২]

আমানত ও দিয়ানতদারী

তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আমানতদারের তরবিয়তপ্রাপ্ত। ফলে শুরু থেকেই ছিলেন আমানতদার। রসূল সা.-এর কাছে কুরাইশের বহু আমানত রক্ষিত ছিল, হিজরতের সময় তিনি সেসব তার কাছে রেখে যান।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস রহ.।
২. উসদুল গাবাহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯।

খলিফা থাকাকালে তিনি ছিলেন মুসলমানদের বাইতুল মালের আমানতদার।

তখন কীভাবে তিনি আমানতের হেফাজত করেছেন হযরত উম্মে কুলসুমের কথায় তা বুঝে আসে। একবার কিছু নারঙ্গী (মালটা) এলো। হযরত হাসান ও হোসাইন একটা নারঙ্গী উঠিয়ে নিল। তিনি দেখে তাদের হাত থেকে নারঙ্গী ছিনিয়ে নেন এবং লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[১]

গনিমতের মাল প্রথমে সমান ভাগে বণ্টন করতেন। পরে সতর্কতার জন্য লটারি দিতেন, যেন কম বেশি হলেও দায়মুক্ত থাকতে পারেন।

একবার ইস্পাহান থেকে গনিমতের মাল এলো। তাতে একটি রুটি ছিল। তিনি সমস্ত মালের সঙ্গে রুটিটিও সাত টুকরো করেন। পরে লটারি দিয়ে বণ্টন করেন। একবার বাইতুল মালের সমস্ত সম্পদ বণ্টন করে সেখানে ঝাড়ু দিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়েন। যেন কেয়ামতের দিন তার আমানতের সাক্ষী হয়ে থাকে।[২]

যুহুদ ও নির্মোহতা

তার জীবন ছিল যুহুদ ও নির্মোহতার জীবন্ত নমুনা, বরং তার মাধ্যমে যুহুদের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তার পর্ণকুটিরে কোনো দুনিয়াবী শান-শওকত কিছুই ছিল না। তিনি কুফায় তাশরিফ এনে দারুল ইমারতের পরিবর্তে একটা ময়দানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরে বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব আলীশান মহলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। আমারও মহলের প্রয়োজন নেই, ময়দানই আমার জন্য যথেষ্ট।

পঁচিশ বছর পর্যন্ত রসূল সা.-এর সঙ্গে ছিলেন। আর রাসুলের ঘরে তো দুনিয়াবী আয়েশ-বিলাস কিছুই ছিল না। হযরত ফাতেমা রা.-এর সঙ্গে বিয়ে হলে পৃথক বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। বৈবাহিক জীবনেও আসবাব বলতে ছিল হযরত ফাতেমা বাপের বাড়ি থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা-ই। এর অতিরিক্ত কিছুই জোটাতে পারেননি। যাতা পিষতে পিষতে হযরত ফাতেমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। ঘরে পরার মত ছিল শুধু একটি চাদর। সেটাও এত ছোট যে, মাথা ঢাকলে পা ঢাকে না, পা ঢাকলে মাথা ঢাকে না।

১. ইযালাতুল খফা, ইবনে আবি শাইবার সূত্রে।
২. প্রাগুক্ত।

তার অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল বড় করুণ। সপ্তাহ চলে যেতো চুলায়

www.maktabatulabrar.com

আগুন জ্বলত না। অনেক সময় ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধতেন। একবার ক্ষুধার তাড়নায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান এবং মজুরি করে কিছু আনেন। মদিনার বাইরে গিয়ে দেখেন, এক দুর্বল মহিলা ইটপাথর জমা করছে। ভাবলেন, হয়ত বাগানে পানি দেবে। তাই তার কাছে গিয়ে চুক্তি করে কাজে লেগে যান। এমনকি কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করে এক মুঠ খেজুর নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু একা খাওয়ার অভ্যাস তো ছিল না, তাই খেজুরগুলো নিয়ে রসূল সা.-এর কাছে চলে আসেন। সব শুনে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে খাবারে শরিক হন।[১]

খলিফা থাকাকালেও তিনি যুহুদ অবলম্বন করতেন। তখনো তার জীবন যাপনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। মোটা কাপড় ও শুকনো খাবারই ছিল তার সবচে' প্রিয়। একবার আব্দুল্লাহ ইবনে যারীর তার সঙ্গে খাবারে শরিক হন। দস্তরখানে ছিল অতি সাধারণ খাবার। সে জিজ্ঞাসা করল, আমিরুল মুমিনীন! পাখির গোশত আপনার কেমন লাগে? জবাবে তিনি বলেন, যারীর! খলিফার জন্য মুসলমানদের মাল থেকে শুধু দুই পেয়ালা জায়েজ–এক পেয়ালা নিজের ও পরিবারের জন্য, অন্য পেয়ালা আল্লাহর সৃষ্টির সামনে পেশ করার জন্য।[২]

বাড়িতে কোনো পাহারাদার বা দারোয়ান ছিল না। শান-শওকত ও বিলাস-ব্যসন কিছুই ছিল না। অথচ তখন কেসরা ও কায়সারের রাজত্ব মুসলমানদের জন্য সোনারূপা উগরে দিচ্ছিল। তখনো তিনি একজন সাধারণ গরীব মুসলমানের মত জীবন যাপন করতেন। আবার দান-খয়রাত এত বেশি করতেন যে, কখনো অভাব অনটনে পড়ে যেতেন। একবার মিম্বরে বসে খুতবা দেয়ার সময় বলেন, আমার তলোয়ার কে কিনবে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে যদি একটি লুঙ্গি কেনার মত পয়সা থাকত তলোয়ারটি বিক্রি করতাম না। এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমিরুল মুমিনীন! লুঙ্গি কেনার জন্য আমি আপনাকে ঋণ দিতে রাজি আছি।

ঘরে কোনো খাদেমা ছিল না। দু'জাহানের সরদারের মেয়ে ফাতেমা নিজ হাতে সব কাজ করতেন। একবার স্নেহময় পিতার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলার জন্য যান, কিন্তু তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না।

১. মুসনাদে আহমদ ১৩০।
২. মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮।

তাই ফিরে আসেন তার কাছে। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর

কাছে জানতে পেরে রসূল সা. নিজে আসেন। এসে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিব যা খাদেমা আপেক্ষা উত্তম? পরে তিনি তাকে তাসবীহের আমল শিক্ষা দেন।[১]

আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া

আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও খওফ-খাশিয়তে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। এ বিষয়ে বহু ঘটনা পাওয়া যায়। তার অভ্যাস ছিল নামাজের সময় দেহে কাঁপুনি শুরু হয়ে যেতো, চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেতো। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, এটা সেই আমানত আদায়ের সময় যা আল্লাহ পাক আসমান জমিন, পাহাড়-পর্বতকে অর্পণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তারা সেই আমানত বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে, আর আমরা সেই আমানতের দায়িত্ব নিয়েছি।[২]

হযরত কুমাইল বলেন, আমি একবার হযরত আলীর সঙ্গে কবরস্তানে গেলাম। একটি কবরের দিকে ফিরে তিনি বলতে লাগলেন, হে কবরওয়ালা! হে জীর্ণ একাকী বসবাসকারী! তোমার কী অবস্থা? আমাদের অবস্থা হলো, তোমার ইন্তিকালের পর তোমার সম্পত্তি পরস্পর বণ্টন করে নিয়েছি, তোমার সন্তানরা এতিম হয়ে গেছে, তোমার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসেছে। এতো গেলো আমাদের খবর, তোমার খবরও কিছু বলো? পরে তিনি কুমাইলকে লক্ষ করে বলেন, যদি তাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হতো তাহলে বলত, সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া তথা আল্লাহ পাকের ভয়। এ কথা বলে তিনি দীর্ঘক্ষণ কাঁদেন। পরে বলেন, হে কুমাইল! কবর হলো আমলের বাক্স। মৃত্যুর সময়ই জীবনের ভালোমন্দ আমল নিরূপণ হয়ে যায়।[৩]

ইবাদত-বন্দেগি

হযরত আলী রা. ছিলেন খুবই ইবাদতগুজার। ইবাদতই ছিল তার জীবনের প্রধান কাজ। পবিত্র কুরআন এর উজ্জ্বল প্রমাণ। কুরআনে আছে,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَه اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا۔ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

১. বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১১৭।
৩. প্রাগুক্ত।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন– وَ الَّذِيْنَ مَعَه

www.maktabatulabrar.com

দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। আর اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো হযরত ওমর রা.। আর رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ দ্বারা হযরত উসমান রা. উদ্দেশ্য। تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا দ্বারা হযরত আলী রা. আর يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا দ্বারা সমস্ত সাহবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য।[১]

এতে ইবাদত-বন্দেগিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিয়মান হয়। কুরআনের ইশারা ছাড়াও স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম তার এই বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন–

كان ما علمت صواما قواما .

'আমি যতদূর জানি, তিনি একজন রোজাদার ও ইবাদতগুজার ছিলেন।'

হযরত যুবাইর ইবনে সাঈদ কুরাইশী বলেন–

لم ار ها شميا قط كان اعبد الله منه .

'আমি কোনো হাশেমীকে দেখিনি তার চেয়ে বেশি ইবাদত করতে।'

এতে বুঝা যায়, তিনি যে ইবাদত শুরু করতেন তাতে অবিচল থাকতেন। একবার রসূল সা. তাকে ও হযরত ফাতেমাকে বলেন, তোমরা উভয়ে প্রত্যেক নামাজের পর দশবার তাসবীহ, দশবার তাহমীদ ও দশবার তাকবীর পড়বে। আর শোয়ার সময় ৩৩ বার তাসবীহ, ৩৩ বার তাহমীদ ও ৩৪ বার তাকবীর পড়বে। হযরত আলী রা. বলেন, রসূল সা.-এর বলার পর থেকে আমলটা আমার কখনো ছুটেনি। ইবনে কাওয়া জিজ্ঞাসা করেন, সিফফিন যুদ্ধের রাতেও ছুটেনি? তিনি বলেন, না, সে রাতেও ছুটে নি।[২]

আল্লাহর রাস্তায় খরচ

যদিও দুনিয়াবী অর্থবিত্তে ছিলেন রিক্তহস্ত, কিন্তু অন্তর ছিল ধনী। তাই কখনো কোনো ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিতেন না। এমনকি অল্প খাবার থেকেও দিতেন। একবার রাতভর পানি সিঞ্চন করে মজুরি হিসাবে অল্প যব পান। সকালে বাড়িতে এসে একতৃতীয়াংশ দিয়ে হারিরা পাকান। রান্না হতেই ফকির এসে হাঁক দেয়। তিনি সবটুকু উঠিয়ে দিয়ে দেন। পরে অবশিষ্ট একতৃতীয়াংশ পাকান। রান্না হতেই এক এতিম এসে হাত বাড়ায়। তাকেও সবটুকু উঠিয়ে দিয়ে দেন। অবশেষে বাকিটুকুও পাকিয়ে এক মুশরিক বন্দিকে দিয়ে দেন। আল্লাহর বান্দা রাতভর পরিশ্রম করে দিনভর ক্ষুধার্ত থাকেন।

১. তাফসীরে ফতহুল বয়ান, খণ্ড ৯, সিয়ারুস সাহাবার সূত্রে।
২. মুসনাদে আহমদ খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১০৭।

কাজটা আল্লাহর কাছে এতই পছন্দ হয়েছে যে, তার প্রশংসাস্বরূপ নাযিল

হয়েছে–

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّه مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا

'আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা মিসকীন, এতিম ও বন্দিকে খাবার খাওয়ায়।'[১]

বিনয় ও নম্রতা

বিনয়-নম্রতা ও স্বভাবের অকৃত্রিমতা ছিল তার শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। পরিশ্রম করতে সামান্য কুণ্ঠিত হতেন না। লোকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসে দেখত, তিনি জুতো সেলাই করছেন, কখনো উট চরাচ্ছেন, কখনো বা জমি চাষ করছেন। স্বভাবের অকৃত্রিমতা এমন ছিল যে, কখনো খালি গায়ে মাটিতে শুয়ে থাকতেন। একবার রসূল সা. তাকে খুঁজে খুঁজে মসজিদে আসেন। এসে দেখেন তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। চাদর পিঠের নিচ থেকে সরে গেছে। আর সমস্ত দেহে ধূলোবালি লেগে আছে। দৃশ্যটা দেখে তার খুবই ভালো লাগে। তিনি নিজ হাতে তার শরীর থেকে ধূলোবালি পরিষ্কার করতে করতে বলেন, اجلس يا ابا تراب 'হে আবু তুরাব! ওঠো।' রাসুলের দেয়া এই কুনিয়াত (উপনাম/উপাধী) তার খুবই পছন্দ ছিল। এমন কি কেউ তাকে এই নামে (আবু তুরাব) ডাকলে তিনি খুশি হতেন।[২]

বীরত্ব ও বাহাদুরি

বীরত্ব ও বাহাদুরি ছিল হযরত আলী রা.-এর আসল বৈশিষ্ট্য। এতে কেউ তার সমতুল্য ছিল না। সব জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর। তখন তিনি ছিলেন যৌবনের প্রথম দিকে। অথচ তখনি বহু অভিজ্ঞ যোদ্ধার সঙ্গে জোরালো লড়াই করেছেন এবং নিজের অমিত বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

যুদ্ধের শুরুতে তিনি ওলীদের সঙ্গে লড়েন এবং একই আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। ওদিকে শাইবা লড়াই করে হযরত উবাইদা ইবনে হারেসের সঙ্গে। শাইবা তাকে আঘাত করে আর তিনিও শাইবাকে আঘাত করেন। পরে হযরত হামযা ও তিনি মিলে একযোগে হামলা করে শাইবাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন।

১. বুখারী, কিতাবুল মানাকেব।
২. প্রাগুক্ত।

অহুদ যুদ্ধে কাফেরদের ঝান্ডা ছিল তালহা ইবনে আবি তালহার

www.maktabatulabrar.com

হাতে। সে মল্লযুদ্ধের আহবান করলে তার বিরুদ্ধে তিনি অগ্রসর হন। তলোয়ার দিয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করেন যে, মাথা দু'ভাগ হয়ে যায়। জানতে পেরে রসূল সা. খুশিতে তাকবীর দিয়ে ওঠেন। মুসলমানগণও আকাশ ফাটিয়ে তাকবীর দেন।

খন্দক যুদ্ধেও তিনি সম্মুখে ছিলেন। আরবের প্রসিদ্ধ বীর আমর ইবনে আবদে বুদ্দ মল্লযুদ্ধের আহবান করলে তিনি লড়ার অনুমতি চান। রসূল সা. তাকে নিজের তলোয়ার দিয়ে পাঠান। নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন। পরে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে সাহায্য কর। অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তিনি ইবনে আবদে বুদ্দের সঙ্গে লড়াই করেন। তাকে পরাভূত করে আকাশ ফাটিয়ে তাকবীর দেন। তার তাকবীর শুনে মুসলমানগণ বুঝতে পারেন, তিনি জয়ী হয়েছেন।

খয়বার যুদ্ধ বিজয় তো তার বীরত্বের ফলশ্রুতি। কয়েক দিন হয়ে গেল তবুও খয়বার দুর্গ-এর পতন হচ্ছে না। রসূল সা. বলেন, আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে পতাকা দেব যে আল্লাহ ও তার রসূলকে মহব্বত করে। আবার আল্লাহ ও তার রসূলও তাকে মহব্বত করেন। দ্বিতীয় দিন দেখা গেল, তিনি হযরত আলীর হাতে পতাকা তুলে দিলেন। খয়বারের বীর মারহাব তলোয়ার উঁচিয়ে রণসঙ্গীত গাইতে গাইতে আসে। এসে মল্লযুদ্ধের আহবান জানায়। তার বিরুদ্ধেও তিনি রণসঙ্গীত গেয়ে অগ্রসর হন। মারহাবের মাথায় তলোয়ার দিয়ে এমন আঘাত করেন যে, তার মাথা ফেটে যায়। পরিণামে খয়বার বিজয় হয়। খয়বার বিজয়ে তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।[১]

তাছাড়া তিনি কারো পরোয়া করেন না, কারো খাতিরে নিজ সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হন না। এই গুণের কারণে আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে অসৎ কাজে নিষেধ ও বাইতুল মাল হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। ইমাম হাকিম হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেন, একবার লোকেরা হযরত আলীর ব্যাপারে রসূল সা.-এর কাছে অভিযোগ করে। অভিযোগ শুনে তিনি সকলের সামনে একটা খুতবা দেন। তাতে বলেন, তোমরা আলীর ব্যাপারে শেকায়েত করো না। কারণ আল্লাহর যাতের বিষয়ে এবং তার পথে সে অতি কঠোর। হযরত ওমর থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ পাকের বিষয়ে হযরত আলী অতি কঠোর।

১. সিয়ারুস সাহাবা ২৮৫।

শত্রুদের প্রতি সদাচার

হাদিসে আছে, বাহাদুর তাকে বলে না যে শত্রুকে পরাভূত করতে পারে। বাহাদুর হলো সে, যে (ক্রোধের সময়ও) নিজেকে সংযত রাখতে পারে। হযরত আলী ছিলেন এক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে যুদ্ধ-জিহাদে। এসত্ত্বেও তিনি সর্বদা শত্রুর সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন। একবার যুদ্ধে প্রতিপক্ষ পড়ে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে যায়। তিনি তাকে ছেড়ে সরে দাঁড়ান। ফলে প্রতিপক্ষকে লজ্জায় পড়তে হয়নি।

জঙ্গে জামালে হযরত আয়েশা রা. ছিলেন তার প্রতিপক্ষ। তার এক অনুসারী হযরত আয়েশার উটকে আঘাত করে ফেলে দেয়। তিনি তখন অগ্রসর হয়ে তার কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং নিজের পক্ষের লোক বসরার রঈসের ঘরে তাকে আশ্রয় দেন। হযরত আয়েশার দলের আহত লোকের সেই ঘরে আশ্রয় নেয়। তিনি হযরত আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, কিন্তু নিজের সঙ্গীর ঘরে আশ্রিত শত্রুদের কিছুই বলেননি।

জঙ্গে জামালে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের ব্যাপারে তার সাধারণ ঘোষণা ছিলড়্যারা ভেগে যাবে তাদেরকে ধাওয়া করা হবে না, আহতদের ওপর ঘোড়া দৌড়ানো হবে না, মালে গনিমত লুণ্ঠন করা হবে না, এমনিভাবে যারা অস্ত্র ফেলে দেবে তাদের দেয়া হবে বিশেষ নিরাপত্তা।

হযরত যুবাইর রা. প্রতিপক্ষ হিসাবে তার সঙ্গে লড়াই করেছেন। জঙ্গে জামালের সিপাহসালার ছিলেন। কিন্তু তার হত্যাকারী ইবনে জারমুয যখন তার কর্তিত মাথা নিয়ে এলো তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ছফিয়ার সন্তানের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও! পরে হযরত যুবাইয়ের তলোয়ার হাতে নিয়ে বলেন, এটা সেই তলোয়ার যেটা কয়েকবার রসূল সা.-এর চেহারা থেকে বিপদের মেঘ সরিয়ে দিয়েছে।

মুস্তাদরকে আছে, হযরত আলীর কাছে যখন তার মাথা আনা হলো তিনি বলেন, ছফিয়ার সন্তানের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও! আমি রসূল সা.কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীর একজন খাস সাহায্যকারী থাকে, আর আমার খাস সাহায্যকারী হলো যুবাইর।

জঙ্গে জামালে একবার তিনি প্রতিপক্ষের লাশ পরিদর্শনে বের হন। একেকটা লাশ দেখতেন আর আফসোস করতেন। যখন হযরত তালহার ছেলে মুহাম্মাদের লাশ দেখলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায়, কুরাইশের বাজপাখি!

তার সবচে' বড় শত্রু বলা যায় তার হত্যাকারী ইবনে মুলজিমকে।

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু তার ব্যাপারে তিনি যে অসিয়্যত করেছেন সেটা হলো, তার থেকে সাধারণ কেসাস নেবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে হত্যা করবে না। তাবাকাতে ইবনে সাদে আছে, তাকে যখন হযরত আলীর সামনে আনা হলো, তিনি বলেন, তাকে ভালো খাবার খাওয়াও, নরম বিছানায় শোওয়াও। আমি বেঁচে থাকলে তাকে ক্ষমা করা বা কেসাস নেয়ার বিষয়ে আমার এখতিয়ার থাকবে। আমি যদি মরে যাই তাকেও মেরে ফেলবে। আমি আল্লাহর সামনে তার সঙ্গে ঝগড়া করব। শত্রুর সঙ্গে সদাচারের এরচে' উত্তম দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে![১]

সঠিক সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা

তিনি ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্তদানে পারদর্শী। তার সিদ্ধান্তের ওপর নবীযুগেও নির্ভর করা হতো। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের সময় তিনি রাসুলের সঙ্গে থাকতেন। হযরত আয়েশার ওপর অপবাদের ঘটনায় রসূল সা. পরিবারের যাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন তাদের মাঝে তিনিও ছিলেন। তায়েফের যুদ্ধে রসূল সা. তার সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন যে, লোকেরা সন্দেহ শুরু করে।

খেলাফতে রাশেদার যুগে তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও হযরত ওমর রা.-এর পরামর্শক ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মুহাজির ও আনসারদের যে পরামর্শ পরিষদ গঠন করেছেন তাদের মাঝে অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। হযরত ওমর রা. সেই পরিষদের সঙ্গে মুহাজিরদের যে বিশেষ পরিষদ গঠন করেছেন তার সদস্যদের নাম যদিও জানা যায় না, তবে হযরত আলী অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কারণ হযরত ওমর রা. তার সিদ্ধান্তের ওপর খুবই আস্থাশীল ছিলেন। এমনকি প্রতিটা জটিল বিষয়ে তার পরামর্শ নিতেন। একবার তো বলেই ফেলেছেন, لولا علي لهلك عمر 'যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর হালাক হয়ে যেতো।'

এই নির্ভরতার কারণে হযরত ওমর রা. অনেক সময় নিজের মতের ওপর তার মতকে প্রাধান্য দিতেন। নেহাওন্দের যুদ্ধে ইরানীদের সংখ্যাধিক্য হযরত ওমর রা.-কে বিচলিত করে তোলে। তিনি তখন মসজিদে নববীতে সকল সাহাবীকে একত্র করেন পরামর্শের জন্য। হযরত তালহা রা. বলেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনি নিজে আমাদের চেয়ে ভালো বোঝেন।

১. ইবনে সাদ।

আমরা আপনার যে কোনো নির্দেশ মানতে প্রস্তুত। হযরত উসমান রা.

বলেন, শাম ও ইয়ামান থেকে সৈন্য জমা করে আপনার নেতৃত্বে যুদ্ধের ময়দানে চলুন। হযরত আলী রা. ছিলেন নিশ্চুপ। হযরত ওমর রা. তার দিকে তাকালে তিনি বলেন, শাম থেকে সৈন্য সরালে বিজিত অঞ্চলগুলো শত্রুরা পুনরায় দখল করে নেবে। আর আপনি মদিনা ছেড়ে চলে গেলে আরবের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, হয়ত কেয়ামতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সুতরাং আমার পরামর্শ হলো, আপনি এখানেই থাকুন। আর শাম ও ইয়ামানে নির্দেশ পাঠিয়ে দিন, যেখানে যত সৈন্য আছে সবাই যেন একতৃতীয়াংশ সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। পরামর্শটা হযরত ওমর রা. খুবই পছন্দ করেন এবং বলেন, আমার অভিমতও এটা।

হযরত উসমান রা. ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যদি তিনি তার পরামর্শ অনুযায়ী আমল করতেন তাহলে তার শাসনামলে এত ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিত না। আরব গোত্রগুলোর মাঝে ভারসাম্য বজায় থাকত। ফলে ভবিষ্যতে কখনো ঝগড়াঝাঁটি হতো না।

তার ফয়সালাগুলোই তার সঠিক সিদ্ধান্তদানের সবচে' বড় প্রমাণ। হাদিসের কিতাবে এমন অনেক জটিল সমস্যা পাওয়া যায়, যেখানে তিনি ফয়সালা দিয়েছেন। সেই ফয়সালা যখন রসূল সা.-এর সামনে পেশ করা হতো তিনি বলতেন, ما اجد فيها الا ما قال علي 'আমার ফয়সালা সেটাই যা আলী দিয়েছে।' তার আরেকটি ফয়সালা রাসুলের সামনে পেশ করা হলে তিনি খুশিতে বলেন, الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة اهل البيت 'আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি আমার আহলে বাইতকে হেকমত শিখিয়েছেন।'[১]

হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ইযালাতুল খফা গ্রন্থে হযরত আলী রা.-এর গুণাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, বড় বড় মনীষীদের স্বভাবে যেসব মহৎ গুণাবলী থাকে যেমন বীরত্ব-বাহাদুরি, শক্তি-সামর্থ, আত্মমর্যাদাবোধ ও অফাদারী এসব তার মাঝে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে তিনি সেসব গুণাবলী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছেন।

রিয়াযুন নাযিরা গ্রন্থে আছে, তিনি যখন চলতেন কিছুটা ঝুঁকে চলতেন। শক্ত মুঠিতে কারো হাত ধরলে সে শ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারত না।

১. ইযালাতুল খফা, পৃষ্ঠা ২৬৯।

তিনি ছিলেন কিছুটা মোটা গড়নের। হাতের কব্জি ছিল মজবুত। প্রচণ্ড

www.maktabatulabrar.com

সাহসী ও শক্তিমান ছিলেন, যার সঙ্গে কুস্তি লড়তেন ধরাশায়ী করে দিতেন। ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর, যার সঙ্গে লড়তেন পরাভূত করে দিতেন।

আরো কতিপয় গুণাবলী

হাদিসের কিতাবে তার গুণাবলী প্রচুর পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, হযরত আলী রা.-এর গুণাবলী যত পাওয়া যায় অন্য কোনো সাহাবীর গুণাবলী তেমন পাওয়া যায় না। কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেন, বনি উমাইয়ার শাসনামলে হযরত আলীর প্রতি মানুষের আক্রোশ ছিল। এর প্রতিবাদে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তার গুণাবলী বেশি বেশি বর্ণনা করতেন। এমন কি ইমাম নাসায়ীসহ অনেকে তার ফাযায়েল নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। বীরত্ব-বাহাদুরি ও মরণপণ জিহাদ ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া জাহেরী ও বাতেনী ইলমের প্রচার-প্রসারে তার বিশেষ ঝোঁক ছিল।[১]

তার আরেকটি গুণ ছিল– নিজ গোত্র ও রসূল সা.-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। রাসুলের নির্দেশ তিনি অতি যত্নের সঙ্গে পালন করতেন। তার সাহায্যার্থে বীরত্বের সঙ্গে লড়তেন। এটা এমন গুণ যা প্রতিটি অভিজাত লোকের মাঝে পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক যখন তার মাঝে এলায়ে কালিমার জযবা পয়দা করে দিলেন, তখন তিনি এই গুণকে দ্বীনের কাজে লাগান। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. নিজের সব চাচাতো ভাইকে বলেছেন, তোমাদের কে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অলী হবে? তাদের কেউ এই দায়িত্ব পালনে রাজি হলো না, বরং সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল। তখন তিনি হযরত আলীকে বলেন, তুমি হবে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অলি। ইমাম হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলের জীবদ্দশায় হযরত আলী রা. বলতেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

'তিনি যদি মারা যান বা শহীদ হন তোমরা কি পিছনে ফিরে যাবে?'[২]

'আল্লাহর কসম! আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন আমরা পিছনে ফিরে যাইনি। আল্লাহর কসম! যদি রসূল সা. ইন্তিকাল করেন বা শহিদ হন, তবুও আমরা যুদ্ধ করব তিনি যে কারণে যুদ্ধ করেছেন।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস রহ.।
২. সূরা আলে ইমরান : ১৪৪।

এমন কি যুদ্ধ করতে করতে মরে যাবো। আল্লাহর কসম! আমি তার চাচাত

ভাই, তার অলী এবং তার ইলমের ওয়ারিস। সুতরাং আমার চেয়ে বেশি হকদার কে?

হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সামনে যেরার আসাদীর সাক্ষ্যদান

একবার হযরত মুয়াবিয়া রা. যেরারে আসাদীকে বলেন, আমাকে হযরত আলীর গুণাবলী শোনাও। যেরার আসাদী বলেন, আমীরুল মুমিনীন! আমাকে মাফ করবেন! হযরত মুয়াবিয়া রা. পীড়াপীড়ি করলে বলেন, তাহলে শুনুন! তিনি ছিলেন অতি সাহসী ও উঁচু হিম্মতওয়ালা। যা বলতেন চূড়ান্তভাবে বলতেন। ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা করতেন। তার প্রতি কথায় ইলমের ঝর্ণা প্রবাহিত হতো। প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনে ঝরে পড়ত হেকমত। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্য অপছন্দ করতেন। রাতের নির্জনতা পছন্দ করতেন। অধিক কাঁদতেন। অনেক চিন্তাভাবনা করতেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং সাধারণ খাবার খেতেন। আমাদের সঙ্গে আমাদের মত মিশতেন। কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিতেন। আমরা অপেক্ষা করতে বললে অপেক্ষা করতেন। অত্যন্ত উদারভাবে সবাইকে আপন করে নিতেন। নিজেও আপন হয়ে যেতেন। এসত্ত্বেও আল্লাহর কসম! আমরা অনেক সময় ভয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না।

তিনি আহলে দ্বীনের সম্মান করতেন। গরীবদের আপন মনে করতেন। কোনো শক্তিশালীকে অন্যায় করার সুযোগ দিতেন না। আবার দুর্বলও তার ইনসাফের ব্যাপারে নিরাশ হতো না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোনো কোনো যুদ্ধে তাকে দেখেছি, রাত্র চলে গেছে, নক্ষত্র ডুবে গেছে, অথচ তিনি নিজের দাড়ি ধরে দংশিত ব্যক্তির মত ছটফট করছেন, চিন্তিত ব্যক্তির মত কাঁদছেন। আর বলছেন, হে দুনিয়া! আমাকে ধোঁকা দিও না। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না। আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। হায়, আমি তো তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি! তোমাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই। তোমার বয়স কম, তোমার উদ্দেশ্যও নগণ্য। হায়, আমার পাথেয় কম, পথের দূরত্ব বেশি, রাস্তাও নির্জন! একথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া রা. কেঁদে পড়েন আর বলেন, আল্লাহর কসম! আবুল হাসানের ওপর আল্লাহ রহম করুন, তিনি এমনি ছিলেন।[১]

১. সিয়ারুস সাহাবা ২৯০।

সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতেন

www.maktabatulabrar.com

তার আরেকটি গুণ হলো, সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতেন। তার মেয়ে উম্মে কুলসুম বলেন, একবার তার কাছে কমলালেবু এলো। হাসান হোসাইন একটি করে নিয়ে খেতে শুরু করল। তিনি সেটা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন এবং বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

হযরত আবু আমর থেকে বর্ণিত, হযরত আলী মালে ফাই বণ্টনে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের পন্থা অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মাল সবই বণ্টন করে দিতেন। বাইতুল মালে শুধু এতটুকু থাকত যেটার বণ্টন সেদিন করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, হে দুনিয়া! আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না, অন্যকে চেষ্টা করো। নিজের জন্য তিনি কিছুই রাখতেন না, এমনকি নিজের আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয়জনকেও দিতেন না। শাসনকার্য ও আমানত কেবল দ্বীনদার লোকদের হাতে অর্পণ করতেন। কারো খেয়ানতের ব্যাপারে জানতে পারলে তাকে লক্ষ্য করে লিখতেন, 'তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নসিহত এসেছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিমাপ করো, মানুষকে তাদের মাল কম দিও না। জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না। যদি মুমিন হয়ে থাকো তাহলে অবশিষ্ট অংশ তোমার জন্য ভালো। আমি তো তোমাদের রক্ষক নই।'

তোমাদের কাছে যখন আমার চিঠি পৌঁছে, তখন তোমাদের হাতে যে কাজ থাকে সেটা বাস্তবায়ন করো, যতক্ষণ না তোমাদের কাছে অন্য কাউকে পাঠাই। পরে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি জান, আমি তাকে তোমার সৃষ্টিজীবের ওপর জুলুম করতে বা তোমার হক নষ্ট করতে বলিনি। মাজমাউত তামিমী থেকে বর্ণিত, বাইতুল মালে যা কিছু ছিল তিনি তা মুসলমানের মাঝে বণ্টন করে দেন। পরে নির্দেশ দেন, তাতে ঝাড়ু দিয়ে দাও। এরপর তাতে তিনি নামাজ পড়তেন যেন কেয়ামতের দিন সাক্ষী হয়ে থাকে।

দুঃখে-দারিদ্রে ধৈর্য ধারণ করতেন

তার আরেকটি উত্তম গুণ হলো–অর্থনৈতিক সংকটে ধৈর্য ধারণ করতেন, দুঃখ-দারিদ্র সহজে মেনে নিতেন। তিনি নিজেই বলেন, রসূল সা.-এর মেয়ে ফাতেমা আমার ঘরে এসে দেখল, বিছানোর মত শুধু একটি দুম্বার চামড়া।

হযরত জমরা থেকে বর্ণিত, রসূল সা. ঘরের সকল দায়িত্ব নিজের

মেয়ে ফাতেমার ওপর অর্পণ করেন আর বাইরের কাজকর্ম অর্পণ করেন হযরত আলীর ওপর। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. যখন তার সঙ্গে হযরত ফাতেমার বিয়ে দেন তখন জাহিয[1] হিসাবে দেন একটি চাদর, চামড়ার একটি গদি–যাতে খেজুর গাছের ছালবাকল ছিল, একটি চাক্কি, একটি মশক ও দুটি কলস। একদিন হযরত আলী রা. হযরত ফাতেমাকে বলেন, পানি ভরতে ভরতে আমার বুক ব্যথা করছে, রসূল সা.-এর কাছে অনেক গোলাম বাঁদি এসেছে, তুমি গিয়ে একটা খাদেম দিতে বলো। হযরত ফাতেমা বলেন, আটা পিষতে পিষতে আমার হাতেও কড়া পড়ে গেছে। তাই তিনি গেলেন। রসূল জিজ্ঞাসা করলেন, বেটি, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি জবাব দিলেন, সালাম করতে এসেছি। কিছু চাইতে লজ্জা লাগল তাই ফিরে এলেন। হযরত আলী জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার, কিছু বলেছ? বললেন, লজ্জায় চাইতে পারিনি। পরে উভয়ে রসূল সা.-এর কাছে গেলেন। হযরত আলী রা. আরজ করেন, পানি ভরতে ভরতে আমার বুক ব্যথা করছে। হযরত ফাতেমা বলেন, আটা পিষতে পিষতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেছে। আল্লাহ পাক আপনাকে অনেক গোলাম বাঁদি দিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে একটা খাদেম দিন। জবাবে রসূল সা. বলেন, না, এটা হতে পারে না, আমি তোমাদেরকে দেব আর আহলে সুফফাকে অনাহারে রাখব। আমি গোলাম বাঁদিগুলো বিক্রি করে সেই মূল্য ওদের পিছনে খরচ করব। এ কথা শুনে তারা ফিরে গেলেন। তারা চলে গেলে স্বয়ং রসূল সা. তাদের কাছে যান। হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা চাদর মুড়ে শুয়ে ছিলেন। চাদরখানি এত ছোট ছিল যে মাথা ঢাকলে পা ঢাকে না, পা ঢাকলে মাথা ঢাকে না। তিনি এলে তারা উঠে বসেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এরচে' উত্তম জিনিস দেব না? তারা বলেন, অবশ্যই দিন। তিনি বলেন, আমাকে হযরত জিব্রাইল আ. কয়েকটি কালিমা শিখিয়েছেন আর বলেছেন, তারা উভয়ে যেন প্রত্যেক নামাজের পরে দশবার তাসবীহ, দশবার তাহমীদ, আর দশবার তাকবীর পড়ে। এমনিভাবে শোয়ার সময় ৩৩ বার তাসবীহ, ৩৩ বার তাহমীদ আর ৩৩ বার তাকবীর পড়ে। হযরত আলী রা. বলেন, রসূল সা. যখন থেকে আমাকে এ কালিমা শিখিয়েছেন আমি একবারও ছাড়িনি। ইবনে কাওয়া বলেন, সিফফিনের রাতেও নয়। জবাবে হযরত আলী বলেন, না, সে রাতেও নয়।

১. বিয়ের সময় পিতা কর্তৃক কন্যাকে প্রদত্ত মালজিনিস।

পারিবারিক জীবন

তিনি পৃথক বসবাস করতে শুরু করেন হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করার পর। ইতিপূর্বে তিনি রসূল সা.-এর সঙ্গে ছিলেন। তাই তাকে উপার্জনের ফিকির করতে হয়নি, কোনো প্রকার পরিশ্রমও করতে হয়নি। হিজরতের পর যখন হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করেন তখন অলিমার চিন্তা মাথায় আসে। ফলে তিনি জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে উটে করে নিয়ে বিক্রির ইচ্ছা করেন। একদিন হযরত হামযা সেই উট জবাই করে দেন। ফলে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। কেননা তার কাছে ছিল মাত্র দুটি উট।[1] পরে বর্ম বিক্রি করে বিয়ের সামান ক্রয় করেন।

বিয়ের পর উপার্জনের চিন্তা মাথায় আসে। শুরু থেকেই সৈনিকসুলভ জীবন যাপন করতেন। তাই কোনো পুঁজি করতে পারেননি। মেহনত-মজুরি ও গণিমতের মালই ছিল উপার্জনের একমাত্র উপায়। খায়বার বিজয় হলে রসূল সা. তাকে এক টুকরো জমি দেন। হযরত ওমর রা. নিজের খেলাফতকালে ফাদাকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করেন। অন্যান্য সাহাবীদের মত তার জন্যও বার্ষিক পাঁচ হাজার দেরহাম বরাদ্দ করেন। তৃতীয় খলিফার পর যখন খেলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন বাইতুল মাল থেকে তার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। সেটাও কোনো মতে চলা যায় পরিমাণ বরাদ্দ ছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আলী রা. বলেন, একটা সময় এমন গেছে যখন আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধায় রাসূলের সঙ্গে পেটে পাথর বাঁধতাম। অথচ আজ আমার অবস্থা হলো বছরে চল্লিশ হাজার দেরহাম যাকাত দেই।[2]

মূলত এ ঘটনা ও তার দুঃখ-দারিদ্রের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ তার আমদানির বিরাট অংশ দান-সদকায় চলে যেতো। ধনী হওয়া সত্ত্বেও ঘরে অভাব-অনটন লেগে থাকত।

সংসার-জীবনে অনেক সময় হযরত ফাতেমার সঙ্গে মনোমালিন্য হতো। কিন্তু রসূল সা. মধ্যস্থতা করে মিলিয়ে দিতেন। একবার হযরত আলী তার প্রতি কিছুটা কঠোরতা করেন। ফলে হযরত ফাতেমা রসূল সা.-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। পিছনে পিছনে হযরত আলীও আসেন। অভিযোগ শুনে রসূল সা. বলেন, মেয়ে তোমার বোঝা উচিত, কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর কাছে চুপচাপ চলে আসে? একথায় হযরত আলী অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তিনি হযরত ফাতেমাকে বলেন, আমি এখন থেকে আর তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করব না।

১. মুসনাদে আহমদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯।

২. আবু দাউদ কিতাবুল খারাজ।

রসূল সা.-এর ইন্তিকালে হযরত ফাতেমা রা. ভীষণ কষ্ট পান।

www.maktabatulabrar.com

এমনকি তার ইন্তিকালের ছয় মাসের বেশি জীবিত থাকেননি। এর মাঝে এক মুহূর্তের জন্যও তার মন প্রফুল্ল হয়নি। হযরত আলী রা. তার মনোতুষ্টির জন্য সর্বদা বাড়িতে থাকতেন। এমনকি যতদিন বেঁচে ছিলেন বাড়ি থেকে বের হননি। হযরত ফাতেমার পর তিনি একাধিক বিয়ে করেছেন। তাদের সঙ্গে আনন্দ বিনোদন করেছেন। তাদের গর্ভে যেসকল সন্তান হয়েছে তন্মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াকে খুবই মহব্বত করতেন। মৃত্যুর সময় যরত হাসানকে অসিয়্যত করে বলেন, মুহাম্মাদের সঙ্গে সদাচার করবে।

খাবার-দাবার ও পোশাক-আশাক

অসাধারণ যুহুদ ও তাকওয়া তার জীবনকে বানিয়ে দিয়েছে অনাড়ম্বর ও অকৃত্রিম। সাধারণত শুকনো খাবার খেতেন, সাধারণ কাপড় পরিধান করতেন। তবে পাগড়ি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, পাগড়ি আরবদের মাথার মুকুট। কখনো কখনো সাদা টুপি পরতেন। জামার অস্তিন হতো ছোট, প্রায়ই হাত থাকত খোলা। লুঙ্গি পরতেন পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত। কখনো শুধু একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর পরে থাকতেন। সে অবস্থায় খেলাফতের দায়িত্ব আদায় করতে কোড়া নিয়ে বাজারে ঘুরতেন।

মোটকথা, বাহ্যিক আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না। তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, এতে মনে বিনয় ও নম্রতা আসে। মুসলমানদের জন্য এই আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। বাম হাতে আংটি পরতেন। তাতে খোদাই করা ছিল 'আল্লাহুল মালিক'।

তার মাঝে ঠাণ্ডা বা গরমের কোনো অনুভূতি ছিল না। কারণ খায়বার যুদ্ধে রসূল সা. তার জন্য দোয়া করেছেন, اللهم اذهب عنه الحر والبرد 'হে আল্লাহ! তার ঠাণ্ডা-গরম দূর করে দাও।' এর ফলে তিনি শীতকালে গ্রীষ্মের পোশাক আর গ্রীষ্মকালে শীতের পোশাক অনায়াসে পরিধান করতেন। এতে কোনো অসুবিধা মনে করতেন না।[১]

দৈহিক গঠন

তিনি ছিলেন মধ্যাকৃতির। গায়ের রঙ গোধুম বর্ণ। ডাগর ডাগর চোখ। চেহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। চওড়া লোমশ বুক। পেশিবহুল খাটো শরীর ও বাহু। পেট বড়। মাথায় চুল ছিল না। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার তিনি বলেন, আমি রসূল সা. কে বলতে শুনেছি, 'চুলের নিচে ময়লা হয়।'

১. মুসনাদে আহমদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৯।

www.maktabatulabrar.com

তাই আমি চুলের শত্রু। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এক লোক তার দুটি জুলফি দেখেছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ হলো, তার মাথায় চুল ছিলো না। দাড়ি লম্বা ও ঘন ছিল। শেষ জীবনে অবশ্য সব চুল একদম সাদা হয়ে যায়। সমস্ত জীবনে একবার মাত্র চুলে মেহেদি লাগিয়েছেন।

ইন্তিকালের ঘটনা

৩৫ হিজরিতে তাকে খলিফা বানানো হয়। আর তিন দিন কম পাঁচ বছর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ৪০ হিজরির ১৮ই রমজান আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। সংক্ষেপে ঘটনা হলো, নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধের পর তিনজন খারেজী পবিত্র মক্কায় সমবেত হয়। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম, আম্‌র ইবনে বুকাইর ও বরক ইবনে আব্দুল্লাহ। এই হতভাগারা পরস্পর পরামর্শ করে হযরত আলী রা., হযরত মুয়াবিয়া রা. ও হযরত আম্‌র ইবনুল আস রা.কে হত্যা করার। ইবনে মুলজিম হযরত আলী রা.কে হত্যার দায়িত্ব নেয়। আম্‌র ইবনে বুকাইর দায়িত্ব নেয় হযরত আম্‌র ইবনুল আস রা.কে হত্যা করার। আর বরক নেয় হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.কে হত্যা করার দায়িত্ব। ইবনে মুলজিম নিজের কুকর্মে কামিয়াব হয়ে যায় এবং নিজের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে। সেদিন অপর দু'জন তাদের মিশনে সফল হয়নি।

হযরত আলী অতি প্রত্যুষে মসজিদে যেতেন। মসজিদে যেতে যেতে লোকদের নামাজের জন্য ডাকতেন। এক রাতে ইবনে মুলজিম তাঁর মসজিদে যাওয়ার পথে ওঁত পেতে ছিল। তিনি কাছে আসতেই তলোয়ার দিয়ে কপালে আঘাত করে। আঘাত একদম মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দাড়ি বেয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়। লোকেরা দৌড়ে ইবনে মুলজিমকে ধরে ফেলে। হযরত আলী বলেন, তাকে হত্যা করবে না। আমি সুস্থ হলে যা ভালো মনে হয় করব। আর মরে গেলে সে আমাকে যেমন এক কোপে হত্যা করেছে তোমরাও তাকে এক কোপে হত্যা করবে। সেমতে হযরত আলী রা.-এর ইন্তিকাল হলে ইবনে মুলজিমকে হত্যা করা হয়।

রসূল সা. এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ আগেই দিয়েছেন। একবার তিনি বলেন, হে আলী! পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে সবচে' হতভাগা ছিল যে হযরত সালেহ আ.-এর উটনির পা কেটেছে। আর পরবর্তী যুগে সবচে'

হতভাগা হবে যে তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত করবে।[১]

সন্তানাদি

হযরত ফাতেমার ইন্তিকালের পর তিনি কয়েকটি বিয়ে করেছেন। তাদের গর্ভে অনেক সন্তানাদি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ হলোঃ

১. হযরত ফাতেমা ছিলেন রসূল সা.-এর কন্যা। তার গর্ভে হাসান হোসাইন ও মুহসিন নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মুহসিন শৈশবে মারা যায়। আর মেয়েরা হলোঃযয়নবে কুবরা ও উম্মে কুলসুমে কুবরা।

২. উম্মুন নাবীন বিনতে হিযাম। তার গর্ভে আব্বাস, জাফর ও উসমান নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একমাত্র আব্বাস ছাড়া সবাই হযরত হোসাইনের সঙ্গে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন।

৩. লায়লা বিনতে মাসউদ। উবাইদুল্লাহ ও আবু বকর নামে দু'সন্তান রেখে মারা যান। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরাও ইমাম হোসাইনের সঙ্গে শহীদ হন।

৪. আসমা বিনতে উমাইস। তার গর্ভে ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ আসগর জন্মগ্রহণ করে।

৫. উম্মে হাবিবা বিনতে রাবিয়া। তিনি ছিলেন উম্মে অলাদ। তার গর্ভে ওমর ও রুকাইয়া জন্মগ্রহণ করে। ওমর লম্বা হায়াত পান। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

৬. উমামা বিনতে আবুল আস। তিনি ছিলেন হযরত যয়নবের মেয়ে এবং রসূল সা.-এর দৌহিত্রী। তার গর্ভে মুহাম্মাদ আওসাত জন্মগ্রহণ করে।

৭. খাওলা বিনতে জাফর। তার গর্ভে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া জন্মগ্রহণ করে।

১. উম্মে সাঈদ বিনতে উরওয়া। তার গর্ভে উম্মুল হাসান ও রমলায়ে কুবরা জন্মগ্রহণ করে।

২. মাহইয়া বিনতে ইমরুল কায়েস। তার গর্ভে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু শৈশবে মারা যায়।

এ ছাড়া আরো কিছু বাঁদি ছিল তাদের গর্ভে নিম্নলিখিত মেয়েরা জন্মগ্রহণ করেঃউম্মে হানী, মাইমুনা, যয়নবে সুগরা, রমলায়ে সুগরা, উম্মে কুলসমে সুগরা, ফাতেমা, উমামা, খাদিজা উম্মুল করম, উম্মে সালামা, উম্মে জাফর, জুম্মানা ও নাফিসা।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১১৮।

মোটকথা, হযরত আলী রা.-এর ১৭ মেয়ে ও ১৪ ছেলে ছিল। তন্মধ্যে

www.maktabatulabrar.com

চার জনের বংশ টিকে থাকে। হযরত হাসান, ইমাম হোসাইন, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ও ওমর।[১]

কতিপয় ঘটনা ও বাণী

হযরত আলী রা. বলেন, অনেক সময় কয়েক দিন চলে যেতো কিন্তু খাওয়ার মত কিছু থাকত না। এমন কি রসূল সা.-এর কাছেও থাকত না। একবার ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় একটি দিনার পেলাম। কিছুটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত দিনারটি উঠিয়ে নিলাম। কেননা আমি ছিলাম অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। দিনারটি নিয়ে বাজারে গেলাম। আটা কিনে ফাতেমার কাছে এলাম। তাকে বললাম, রুটি বানাও। তিনি আটা গোলা শুরু করলেন। কিন্তু ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা এমন ছিল যে, তার কপালের চুল খামিরার পাত্রে পড়ে যেতো। তিনি রুটি বানালেন। আমি রসূল সা.-এর কাছে গিয়ে ঘটনা শোনালাম। শুনে তিনি বলেন, রুটি খেয়ে নাও, আল্লাহ পাক তোমাকে এই রিজিক দিয়েছেন।[২]

১. হযরত কায়েস ইবনে আবী হাযেম বলেন, হযরত আলী রা. বলেন, আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ফিকির করা উচিত। সেটা হলো, তাকওয়ার সঙ্গে আমল করা। তাকওয়া থাকলে কোনো আমলই ছোট নয়। সেটাকে ছোট আমল কীভাবে বলা যায় যেটা কবুল হয়?

২. তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে, তাকদীর তো তার ওপর প্রতিফলিত হবেই, সঙ্গে তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার কারণে সে সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর অসন্তুষ্ট থাকবে, তার ওপরও তাকদীর প্রতিফলিত হবে, কিন্তু তার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

৩. তিনি আরো বলেন, দুনিয়া হলো মড়ক, আর এর তালাশকারী হলো কুকুর। সুতরাং এই দুনিয়া থেকে কেউ কিছু পেতে চাইলে সে যেন কুকুরের সঙ্গে থাকে।

আল্লামা শা'রানী একথার ব্যাখ্যা করে বলেন, দুনিয়া বলে এখানে বোঝানো হয়েছে– প্রয়োজন অতিরিক্ত জিনিস। প্রয়োজনীয় জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

১. সিয়ারুস সাহাবা ২৯৬।

২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১১৯।

তিনি আরো বলেন, একবার রসূল সা. আমার সম্পর্কে অত্যন্ত

গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন, হে আলী! তোমার ব্যাপারে দুটি দল ধ্বংস হবে। একদল তোমার ভালোবাসায় অতিরঞ্জন করবে। তোমার মাঝে যা নেই তা-ই নিয়ে বড়াই করবে। আরেক দল তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। শত্রুতার বশে তোমাকে অপবাদ দেবে।[১]

(২) সাইয়েদুল আউলিয়া খাজা আবু সাঈদ হাসান বসরী রহ.

নাম ও বংশ-পরিচয়

হযরত হাসান বসরী রহ.-এর কুনিয়্যত আবু সাঈদ। এ ছাড়াও তার আরো দু'টি কুনিয়াত রয়েছে- আবু মুহাম্মাদ ও আবুন নসর। তার পিতার নাম ইসার, যিনি ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের গোলাম। তার সম্মানিত মায়ের নাম বিবি খাইরা, যিনি ছিলেন হযরত উম্মে সালামার বাঁদি। তার পিতা ১২ হিজরিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

জন্ম ও প্রতিপালন

তিনি হযরত ফারুকে আজমের খেলাফতকালে তার ইন্তিকালের দুই বছর পূর্বে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, হযরত হাসান বসরীর জন্ম হলে তাকে হযরত ওমরের খেদমতে নেয়া হয়। তিনি খেজুর চিবিয়ে নিজ হাতে তার মুখে লালা দেন। পরে বলেন, তার নাম রাখো হাসান, কারণ তার চেহারা খুবই সুন্দর।

তার প্রতিপালনে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার অবদান রয়েছে। হযরত আবু যুরআ বলেন, হাসান বসরী চৌদ্দ বছর বয়সে হযরত আলী রা.-এর হাতে বয়াত হন। পরে তিনি কুফা ও বসরার দিকে চলে যান। তার তিন সন্তান- আলী, মুহাম্মাদ ও সাঈদ। এজন্য তিনি তিনটি কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ।

ইলমী উৎকর্ষের দিক থেকে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলেম, আবার আখলাক ও রুহানী জগতেও ছিলেন আলিকুল শিরোমণি। তার পিতামাতা গোলাম ছিলেন। তাদের গোলামীর ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী তার পিতা ইয়াসানের বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২০।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস।

হযরত আনাস ইবনে মালেকের ফুফু রবি বিনতে নসর তাকে ক্রয় করে

www.maktabatulabrar.com

আযাদ করে দেন। অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার পিতামাতা উভয়ে বনি নাজ্জারের এক আনসারের গোলাম ছিলেন। সে স্ত্রীর মহর হিসাবে বনি সালামাকে দিয়ে দেয়। আর বনি সালামা তাকে আযাদ করে দেয়। তৃতীয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার পিতা ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের গোলাম। তার মা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার বাঁদি। এসব মতানৈক্য সত্ত্বেও এতটুকু সুনিশ্চিত যে, ইয়াসার ও তার স্ত্রী উভয়ে গোলাম বাঁদি ছিলেন।

হযরত উম্মে সালামার দুগ্ধপান

হযরত হাসান বসরী রহ. ১২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার গোলাম হিসেবে তার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ হয়, যেমনটা কম লোকেরই হয়ে থাকে। তার মা ছিলেন বাঁদি। এজন্য প্রায়ই ঘরের কাজকর্মে লেগে থাকতেন। তিনি যখন শিশু হাসান বসরীকে ছেড়ে কোনো কাজে লেগে থাকতেন আর সে কাঁদত, তখন হযরত উম্মে সালামা তাকে শান্ত করতে দুধ দিতেন। পরে মা ফিরে এসে দুধ পান করাতেন। এভাবে তার উম্মুল মুমিনীনের দুধ পান করার সৌভাগ্য হয়।[১]

হযরত হাসান বসরী রহ. হযরত উম্মে সালামার স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত হন। এমনকি অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনদের ঘরেও আসা-যাওয়া করতেন। তিনি নিজেই বলেন, হযরত উসমান রা.-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত যখন আমার বয়স ছিলো তের বছর আমি নির্দ্বিধায় সকল উম্মুল মুমিনীনের ঘরে যাতায়াত করতাম।[২]

একটা মতানৈক্য: চিশতী সিলসিলা হযরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছে কি?

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. নিজের কিতাব ইন্তিবাহে লেখেন, হযরত হাসান বসরীর মাধ্যমে চিশতী সিলসিলা হযরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ হযরত হাসান বসরী তখন এত ছোট ছিলেন যে তিনি হযরত আলীর খলিফা হতে পারেন না। হযরত শাহ ফখরুদ্দীন দেহলভী ছিলেন শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর সমসাময়িক। তিনি শাহ সাহেবের মতের বিরুদ্ধে ফখরুল হাসান নামে একটি কিতাব লেখেন। তাতে হযরত আলী রা. থেকে হযরত হাসান বসরীর খেলাফতপ্রাপ্তি প্রমাণ করেন।

১. অফাইয়াতুল আয়ান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৪।
২. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১৫।

সেই কিতাবের আরবী শরাহ লিখেছেন মাওলানা আহসানুজ্জামান

হায়দারাবাদী কওলুল মুসতাহসান ফি শরহি ফখরুল হাসান নামে।[১] এ সম্বন্ধে সামনে হযরত হাসান বসরীর জীবনী আলোচনার মধ্যে **'ইলমে বাতেনে হাসান বসরীর সনদ'** শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত হাসান বসরী এমন সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন বহু সাহাবী জীবিত ছিলেন। এমন পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন যেখানে প্রতিটি অলি গলিতে ছিলো ইলমের চর্চা। তাছাড়া তিনি এমন লোকদের সোহবত লাভ করেছেন যারা ছিলেন ইলমী জগতের ইমাম এবং আখলাকে নববীর অনুপম দৃষ্টান্ত। এজন্য তিনি ইলম-আমল, তাকওয়া-তাহারাত ও যুহুদ-নির্মোহতা মোটকথা সমস্ত আখলাকী ও রুহানী যোগ্যতায় পূর্ণতা লাভ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ লেখেন–

كان الحسن جامعا عالما عاليا رفيعا فقيها، مامونا، عابدا، ناسكا، كبير العلم فصيحا جميلا وسيما.

'হযরত হাসান ছিলেন সকল বৈশিষ্ট্যের আধার– সুবিজ্ঞ আলেম, অতি সম্মানী ও মর্যাদাবান, ফকিহ, আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। তার জানাশোনার পরিধি ছিলো ব্যাপক। বিশুদ্ধভাষী ও সুদর্শন ছিলেন।'[২]

মোটকথা সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামতে ধন্য ছিলেন। হাফেজ যাহাবী লেখেন–

حافظا ، علامة من بحور العلم ، فقيه النفس ، كبير الشان ، عديم النظير ، مليح التذكير ، بليغ الموعظة ، رأس في أنواع الخير .

'তিনি ছিলেন হাদিস শাস্ত্রের ইমাম; সুবিজ্ঞ আলেম ও জাতফকিহ, উঁচু মর্যাদার অধিকারী, সর্বক্ষেত্রে অতুলনীয় ও অনুপম। ওয়াজ নসিহতে শ্রেষ্ঠতম এবং সকল কল্যাণকর কাজে অগ্রণী।'[৩]

সমকালীন আলেমগণের দৃষ্টিতে

তিনি সেসব গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন একজন অলীয়ে কামেলের মাঝে যেসব গুণাবলী পাওয়া যায়। ইলম-আমলে তার কোনো সমতুল্য ছিল না। মুসলমানদের একটা বড় শ্রেণী তার প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ।

১. খালিক নেজামীর তারিখে মাশায়েখে চিশত ১৪১।
২. আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১৫।
৩. তাযকেরাতুল হুফফাজ, খণ্ড ১, পষ্ঠা ৬২।

হাজ্জাজ ইবনে আরতাত বলেন, আমি আতা ইবনে আবি রাবাহের

www.maktabatulabrar.com

কাছে হযরত হাসান বসরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমরা তাকে আঁকড়ে ধরো; তিনি অনুসৃত ইমাম।

হযরত হাম্মাদ ইবনে সালমা ইবনে উবাইদ ও হুমাইদ তাবীলের সূত্রে বর্ণনা করেন, আমরা বহু ফকীহ দেখেছি, কিন্তু হযরত হাসান বসরীর মত ব্যক্তিত্ববান কাউকে দেখিনি। হযরত আ'মাশ বলেন, হযরত হাসান বসরী সর্বদা হেকমত জমা করতেন, পরে সেগুলো বলা শুরু করতেন। ইমাম বাকের বলেন, হযরত হাসান বসরীর কথা নবীদের স্তরে পৌছে যায়। তিনি সর্বদা বাঅজু থাকতেন। এক রাতে সত্তরবারের বেশি জাগ্রত হন এবং প্রত্যেকবার অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়েন।[১]

সে যুগের সমস্ত আলেম-উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার অতুচ্চ মর্যাদার বিষয়ে একমত। ইমাম শাবী বলেন, আমি এই শহরের (ইরাকের) কাউকে পাইনি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হযরত কাতাদা লোকদের হেদায়েত করতেন, এই লোকের (হযরত হাসান বসরীর) আঁচল ধরে রাখ। আমার ধারণামতে হযরত ওমরের সদৃশ তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না।

গালেব আল-কাত্তান বলেন, সমকালীন উলামায়ে কেরামের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন পাখিকুলের মাঝে বাজপাখির শ্রেষ্ঠত্ব যেমন। যে ব্যক্তি এ যুগের সবচে' বড় আলেমকে দেখতে চায়, সে যেন হাসানকে দেখে। হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আহলে বসরার দু'জন তথা শায়েখ হযরত হাসান ও মুহাম্মাদের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়।

হযরত ইমাম মালেক রহ. বলতেন, তোমরা হযরত হাসান বসরীর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করো, কারণ তিনি মনে রেখেছেন আর আমরা ভুলে গেছি। কেউ কেউ এমনটাও বলেছেন, হযরত হাসান যদি উপযুক্ত বয়সে সাহাবীদের যুগ পেতেন তাহলে তারাও বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামতের মুখাপেক্ষী হতেন।

যদিও হযরত হাসান বসরী রহ. সর্বইলমে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে যুহুদ, ইবাদত ও রুহানী মাশগালায়। এজন্য তার রুহানী আলোচনার তুলনায় ইলমী উৎকর্ষের আলোচনা কম পাওয়া যায়। তবে যতটা পাওয়া যায় মোটামুটি ধারণা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাফসীর, ফেকাহ ও হাদিস মোটকথা সমস্ত দ্বীনী শাস্ত্রে ছিল তার সমান পাণ্ডিত্য।[২]

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২২।
২. তাহযিবুত তাহযিব, সিয়ারুস সাহাবার সূত্রে।

মুফাস্‌সির হিসাবে হাসান বসরী

মুফাসসির হিসাবে অবশ্য তিনি তেমন পরিচিত ছিলেন না। তবে তাফসীরের ইলম তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে অর্জন করেছেন। বারো বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। হযরত আবু বকর হুন্দালী বলেন, হযরত হাসান বসরী যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সুরার তাফসীর, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শানে নুযুল ইত্যাদি ভালোভাবে আয়ত্বে না আনতেন সামনে অগ্রসর হতেন না। এই পরিশ্রমের ফলে তিনি কুরআনের বড় আলেমে পরিণত হন। তিনি তাফসীরের দরসও দিতেন।[১]

মুহাদ্‌দিস হিসাবে হাসান বসরী

ইলমে হাদিসে তার মর্তবা হাফেজ যাহাবীর মন্তব্য থেকে বুঝে আসে। তার সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন আল্লামা ও ইলমের সমুদ্র। হাদিসশাস্ত্র তিনি এমন সকল উস্তাদ থেকে অর্জন করেছেন যাদেরকে এই শাস্ত্রের স্তম্ভ মনে করা হয়। সাহাবীদের মাঝে হযরত উসমান, হযরত আলী, আবু মুসা আশয়ারী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, হযরত আনাস ইবনে মালেক, জাবের ইবনে মুয়াবিয়া, মা'কোল ইবনে ইয়াসার, ইমরান ইবনে হুসাইন ও জুনদুব আল-বাজালী থেকে সরাসরি ইস্তিফাদা করেছেন। এমনিভাবে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, সা'দ ইবনে উবাদা, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু হুরায়রা, ছাওবান, উসমান ইবনে আবিল আস ও মা'কেল ইবনে সিনান থেকেও ইস্তিফাদা করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম ছাড়াও বিখ্যাত তাবেয়ীদের একটা বিরাট জামাত থেকে হাদিস শুনেছেন।[২]

ফকিহ হিসাবে হাসান বসরী

বসরা শহরে তিনি ছিলেন ফেকাহের ইমাম ও মুফতীয়ে আজম। হযরত কাতাদা বলেন, তিনি ছিলেন হালাল ও হারাম বিষয়ে সবচে' বড় আলেম।

হযরত আইয়্যুব বলেন, হাসানের চেয়ে বড় ফকিহ আমার চোখ দেখেনি।

হযরত রবি' ইবনে আনাস বলেন, আমি পূর্ণ দশ বছর হযরত হাসান বসরীর কাছে আসা-যাওয়া করি এবং তার কাছে নিত্যনতুন মাসআলা শিখি।[৩]

১. শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬।
২. তাযযিবুত তাহযিব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৪।
৩. তাহযিবুত তাহযিব।

www.maktabatulabrar.com

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, তিনি হাদিস ও ফেকাহে কয়েকটি কিতাবও লিখেছেন। ফেকহি বিষয়ে লেখার জন্য অবশ্য মুজাহিদসূলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জরুরী। ফলে যেসব মাসআলায় নির্ভরযোগ্য সনদ না পেতেন সেখানে নিজে কেয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদ করতেন। একবার আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যেসব বিষয়ে ফতোয়া দেন সেসব বিষয়ে কি আপনার কাছে নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ আছে? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, সব বিষয়ে আমার কাছে সনদ নেই। কিন্তু আমার অভিমত প্রশ্নকারীর অভিমতের চেয়ে নির্ভরযোগ্য।

সঠিক সিদ্ধান্তদানে ও নির্ভুল মত প্রকাশে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের জীবন্ত নমুনা। হযরত আবু কাতাদা লোকদের নির্দেশ দিতেন, বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে রুজু করো। তিনি আরো বলতেন, আল্লাহর কসম, আমি তার মতের চেয়ে বেশি আর কারো মত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের মতের সঙ্গে মিলতে দেখিনি। কেউ কেউ তার সঠিক সিদ্ধান্তদান ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বিষয়ে বলে থাকেন, যদি হযরত হাসান উপযুক্ত বয়সে সাহাবায়ে কেরামের যুগ পেতেন তাহলে তারাও তার অভিমতের মুখাপেক্ষী হতেন।[১]

ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যরুচি

দ্বীনী ইলম ছাড়াও আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ছিলেন বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ইবনে ইমাদ হাম্বলী লেখেন, তিনি বিশুদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যে রুবা ইবনে উজাজের সমতুল্য ছিলেন।

আলেমগণের সোহবতে

বিশিষ্ট আলেমগণের সোহবত ও তাদের সঙ্গে ইলমী মুযাকারার প্রতি তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। একবার কতিপয় আলেম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো। কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল, বরং দুপুর গড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার ছেলে আগন্তুকদের বলল, আপনারা আব্বাজানকে ব্যস্ত রেখেছেন, এখন তাকে আরাম করতে দিন। তিনি এখনো দুপুরের খাবার খাননি। এ কথা শুনে তিনি ছেলেকে সতর্ক করেন, এমনকি বলেন, ওদের সঙ্গে আলোচনার চেয়ে প্রিয় কাজ আমার নেই। যখন দু'জন মুসলমান একত্র

১. ইবনে সাদ, সিয়ারুস সাহাবার সূত্রে।

হয় তখন তারা হাদিস বর্ণনা করে, আল্লাহ পাকের জিকির করে, তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, এমনকি দুপুরে নিয়মমাফিক ঘুমানোরও সুযোগ পায় না।[১]

হাদিস পড়ুয়াদের ভিড়

তার অবস্থা যতটা জানা যায় সম্ভবত তিনি কোনো হালকায়ে দরস কায়েম করেননি। এটা তিনি পছন্দও করতেন না। একান্ত বাধ্য না হলে হাদিস বর্ণনা করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহ পাক যদি আহলে ইলম থেকে অঙ্গীকার না নিতেন তাহলে তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তরে আমি হাদিস বর্ণনা করতাম না। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে লোকেরা তার আঁচল ছাড়েনি। বহু তালিবে ইলম তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইস্তিফাদা করত। তিনি যেখানে যেতেন মানুষের ভিড় লেগে যেতো। পবিত্র মক্কা শরিফেওড়যেটা ছিল মদিনার পর ইলমের সবচে' বড় মার্কায–সেখানেও লোকেরা তার পিছনে ভিড় করত। মক্কাবাসী তাকে মসনদে বসিয়ে হাদিস শুনত। হযরত মুজাহিদ, আতা ও তাউসের মত আকাবির আলেমগণ দরসে উপস্থিত হতেন। তারা বলতেন, আমরা তার মত কাউকে দেখিনি।[২]

রেওয়ায়েত বিল মা'না

তিনি হুবহু শব্দে হাদিস বর্ণনা করা জরুরী মনে করতেন না। শুধু অর্থ ও মর্ম আদায় হয়ে গেলে যথেষ্ট মনে করতেন। সাধারণত তিনি রেওয়ায়েত বিল মা'না করতেন। ফলে কখনো শব্দে পার্থক্য দেখা যেতো; কম বেশি হতো, কিন্তু অর্থ ও মর্ম একই থাকত।[৩]

শাগরেদবৃন্দ

হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা সত্ত্বেও তার শাগরেদ ছিল অনেক। তার শাগরেদদের সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো–হুমাইদ আত-তবীল, ইয়াযিদ ইবনে আবি মারয়াম, আইয়ুব, কাতাদা, আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ মারফী, জারীর ইবনে আবি হাম, আবুল আশহাব, রবি' ইবনে সাবী, সাদ ইবনে ইবরাহিম, সাম্মাক ইবনে হারব, ইবনে আদন, খালেদ আল হাজ্জা, আতা ইবনে সায়েব, উসমান আল বিত্তি, কুররাহ ইবনে খালেদ, মুবারক ইবনে

১. ইবনে সাদ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭০।
২. প্রাগুক্ত।
৩. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১৫।

www.maktabatulabrar.com

ফুযালা, ইয়ালা ইবনে যিয়াদ, হিশাম ইবনে হাসসান, ইউনুস ইবনে উবাইদ, মানসুর ইবনে যাদান, সাঈদ ইবনে হেলাল, মুজাহিদ, আতা ও তাউস প্রমুখ।

হাকিকী আলেম

হযরত হাসান বসরীর মতে নিরেট ইলম থাকলে কাউকে আলেম বলা হয় না, বরং আলেম হওয়ার জন্য বহু শর্ত রয়েছে। একবার মাতার আল-ওয়াররাক তার কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল, সঙ্গে একথাও বলল, ফুকাহায়ে কেরাম আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, আফসোস! তুমি কি ফকিহ দেখেছ কখনো? ফকিহ কাকে বলে জানো? ফকিহ বলা হয়, যিনি হন যাহেদ ও পরহেযগার; নিজের চেয়ে উঁচু মর্যাদার কাউকে পরোয়া করেন না। আবার নিজের চেয়ে কম মর্যাদার হলেও বিদ্রূপ করেন না। আল্লাহ পাক তাকে যে ইলম দান করেছেন তা দিয়ে দুনিয়া অর্জনের ফিকির করেন না।[১]

ইলমে বাতেনে হাসান বসরীর সনদ

হযরত হাসান বসরী যদিও জাহেরী ইলমে শায়খুল ইসলাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন, কিন্তু এই ইলম তার আসল বৈশিষ্ট্য ছিল না। তার আসল বৈশিষ্ট্য ছিল বাতেনী ইলম ও আল্লাহর মারেফত। তিনি ছিলেন তাসাওউফের উৎস ও ইলমে বাতেনের ঝর্ণাধারা। তাসাওউফের সকল স্রোতধারা এই ঝর্ণা থেকে উৎসারিত। তাসাওউফের প্রায় সকল সিলসিলা তার মাধ্যমে হযরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছে। কেমন যেন তার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাসাওউফের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে।

যদিও মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট হযরত আলী রা. থেকে তার রুহানী ইস্তিফাদা প্রমাণিত নয়, কিন্তু সূফীগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনি হযরত আলী রা.-এর সোহবত ও ফয়েযপ্রাপ্ত।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. লেখেন, সকল সূফীর ঐক্যমতে হযরত হাসান বসরী হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সম্পৃক্ত। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের মতে এ সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। শায়েখ আহমদ কুসতাশী নিজের কিতাব ইকদুল ফরিদ ফি সালাসিলি আহলিত তাওহীদ গ্রন্থে প্রামাণিক আলোচনার মাধ্যমে সূফীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি অন্যত্র লেখেন, সকল সূফীয়ায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, হযরত হাসান বসরী হযরত আলী রা.-এর ফয়েয ও সোহবতপ্রাপ্ত।

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১৫।

সালাফ ও খালাফ সমস্ত সূফিয়ায়ে কেরাম হযরত হাসান বসরীকে এই নূরানী সিলসিলার উৎস ও শায়খুল মাশায়েখ মনে করেন। তার কথা দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন। সূফীদের আলোচনায় তার নাম থাকে সর্বাগ্রে। তার কথাবার্তা ও তালীমকে মনে করা হয় তাসাওউফের নেসাব।

শায়েখ ফরিদুদ্দীন তার আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন, তিনি ছিলেন ইলম-আমলের কাবা, তাকওয়া তাহারাতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ...।[১]

শায়েখ আলী ইবনে উসমান হাজুওয়াইরী (মৃত্যু ৪৬৫হি.) নিজের কিতাব কাশফুল মাহজুবে–যেটা ফারসী ভাষায় তাসাওউফের প্রাচীন কিতাব–তাতে লেখেন, ইমামে আসর ফরিদে দাহর শায়েখ আবু আলী হাসান বসরী ছিলেন আহলে তরিকতের কাছে অতি সম্মানী ও মর্যাদাশীল বুযুর্গ। ইলম ও মুয়ামালার ক্ষেত্রেও ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী আলেম।[২]

শায়েখ আবু নসর সিরাজ (মৃত্যু ৩৭০ হি.) ও শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ মহান আকাবির হযারাত নিজেদের কিতাবে যেমন কিতাবুল লুমা ও আওয়ারেফুল মায়ারেফে হযরত হাসান বসরীর বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।[৩]

ফাযায়েল ও আখলাক

যুহুদ ও তাকওয়ায় তিনি ছিলেন জীবন্ত নমুনা আবার ফাযায়েল ও অনুপম আখলাকে ছিলেন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি রাসুলের পূণ্যময় যুগ পাননি, রসূল সা.-এর সোহবত পেয়ে ধন্য হননি, কিন্তু তার আখলাক ছিলো সেই পবিত্র ছাঁচে গড়া। তাবেয়ীদের মাঝে তিনিই ছিলেন সাহাবীদের সঙ্গে সবচে' সাদৃশ্যপূর্ণ। তার প্রতিটি কথাবার্তা ও কাজকর্ম থেকে সাহাবীদের শান প্রকাশ পেতো। এমন কি বড় বড় তাবেয়ীগণও সেটা স্বীকার করতেন। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু বুরদা বলেন, আমি কোনো তাবেয়ীকে দেখিনি সাহাবীদের সঙ্গে হযরত হাসান বসরীর চেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। ইমাম শা'বী সত্তর জন সাহাবীকে দেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হয়ত হযরত হাসান বসরীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এসত্ত্বেও তিনি হযরত হাসান বসরীকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। একবার তার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আব্বাজান! আপনি এই শায়েখের (হাসান বসরী) সঙ্গে যে আচরণ করেন অন্য কারো সঙ্গে তেমনটা করতে দেখি না? জবাবে শা'বী বলেন,

১. তাযকেরাতুল আউলিয়া।
২. কাশফুল মাহযুব।
৩. আওয়ারেফুল মায়ারেফ, কিতাবুত তমা।

বেটা, আমি রসূল সা.-এর সত্তর জন সাহাবীকে দেখেছি, কিন্তু হাসানের চেয়ে বেশি আর কাউকে দেখিনি তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ।[১]

তিনি বলতেন, তাকওয়া-পরহেযগারী দ্বীনের খুঁটি আর লোভ-লালসা সেই খুঁটি ধ্বসিয়ে দেয়। সুন্নতে নববীর প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় আকর্ষণ। ইত্তিবায়ে সুন্নতের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতেন। অন্যদেরও সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। আল্লাহ পাকের খাওফ ও খাশিয়ত ছিল তার অস্থিমজ্জায়। অনেক সময় বলতেন, আমি এজন্য কাঁদি হয়ত কখনো আমার দ্বারা এমন কোনো গোনাহ হয়ে যাবে যে কারণে আল্লাহ পাক বলবেন, হে হাসান! আমার দরবারে তোমার কোনো মর্যাদা নেই; আমি তোমার কোনো ইবাদত কবুল করব না।

বিনয়-নম্রতা ছিল তার মাঝে অপরিসীম। নিজেকে সর্বদা সাধারণ মনে করতেন, বরং সবচে' নগণ্য মনে করতেন। একবার কেউ জিজ্ঞাসা করল, হাসান! তুমি উত্তম না কুকুর উত্তম? অনেক সময় তিনি কুকুর দেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে এই কুকুরের বদৌলতে কবুল করে নাও।

তিনি বলতেন, কারো তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে বুঝতে হবে হয়ত তার দ্বারা কোনো গোনাহ হয়ে গেছে। তিনি আরো বলতেন, প্রতি রাতে নিজের মুহাসাবা করো। দিনে গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করো, যেন রাতে তাহাজ্জুদ নসিব হয়। তিনি আরো বলতেন, তাহাজ্জুদ তার জন্য কঠিন যার দ্বারা গোনাহ বেশি হয়।

ওয়াজ-নসিহতে পারদর্শিতা

আল্লাহ পাক তাকে ওয়াজ-নসিহতের বিরাট যোগ্যতা দান করেছিলেন। সপ্তাহে একবার ওয়াজ করতেন। তার ওয়াজ শুনতে বহু মানুষ সমবেত হতো। সে যুগের বড় বড় অলি-আউলিয়াগণও শরিক হতেন। কিন্তু তার একটা নিয়ম ছিল, ওয়াজে হযরত রাবেয়া বসরী শরিক না হলে তিনি ওয়াজ করতেন না। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, যে শরবত হাতির পাত্রে দেয়া হয়, সেটা পিঁপড়ার পাত্রে কীভাবে দেয়া যায়? হযরত আলী রা. বসরায় গেলে হযরত হাসান বসরীর মাহফিলে যেতেন। একবার জিজ্ঞাসা করেন, হাসান! তুমি আলেম না তালিবে ইলম? জবাবে তিনি বলেন, আমি কিছুই নই, তবে রসূল সা. থেকে যে কথাটা পেয়েছি সেটাই বর্ণনা করি।

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৬২।

www.maktabatulabrar.com

হযরত আলী বলেন, এই লোক ওয়াজ করার উপযুক্ত। একথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে যান এবং সকল বক্তাদের ওয়াজ করতে নিষেধ করে দেন।[১]

অন্তরের দহন জ্বালা

অন্তর হলো রুহানিয়াতের অনন্ত উৎস। সেখান থেকেই ইবাদত-মুজাহাদা ও তাকওয়া-তাহারাতসহ সমস্ত আখলাকে হাসানা ও রুহানী স্রোতধারা প্রবাহিত হয়। হযরত হাসান বসরীর অন্তর এমন ভগ্ন ও জ্বলন্ত ছিল যে, সেখানে দরদব্যথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত ইউনুস বলেন, তার চেহারায় সর্বদা দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-ভাবনা ছেয়ে থাকত। তার ঠোঁট হাসতে জানত না। তিনি বলতেন, মুমিনের হাসি কলবের গাফলতের নমুনা; বেশি হাসলে দিল মরে যায়। পবিত্র কুরআন পড়ে ভয়-বিহ্বলতায় তিনি জারজার হয়ে কাঁদতেন।[২]

কবরের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন

একবার তিনি জানাযার সঙ্গে কবরস্তানে যান। দাফনের পর মৃতের মাথার দিকে বসে অনেকক্ষণ কাঁদেন। পরে বলেন, হে লোকসকল! সাবধান হয়ে যাও! দুনিয়ার শেষ এবং আখেরাতের শুরু এই কবর। হাদিস শরিফে আছে, কবর আখেরাতের প্রথম মানযিল। সুতরাং এমন দুনিয়াকে কেন মহব্বত করো যার পরিণাম এই কবর? আর কেয়ামতকে কেন ভয় করো না যার সূচনাও এই কবর? কথাটা তিনি এমন দরদপূর্ণ কণ্ঠে বলেন যে, উপস্থিত সবাই কাঁদতে শুরু করে।

তিনি আরো বলেন, যখন কোনো লোক মারা যায়, আর তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করে, তখন মালাকুল মওত সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তো তার রিজিক নষ্ট করিনি, সে নিজেই তার রিজিক শেষ করে ফেলেছে। আমি তার জীবন খতম করিনি। আমাকে আরো এই ঘরে আসতে হবে; বারবার আসতে হবে, সবার মৃত্যু পর্যন্ত আসতে হবে। হযরত হাসান বলেন, আল্লাহর কসম! যদি পরিবারের লোকেরা সেই ফেরেশতাকে দেখত, তার কথা শুনত, তাহলে মৃতকে ভুলে নিজেদের ফিকির করত।[৩]

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস।
২. ইবনে সাদ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৪।
৩. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২২।

www.maktabatulabrar.com

যুহদ ও তাকওয়া

তিনি ছিলেন আপাদমস্তক যুহদ ও তাকওয়ায় ভাস্বর এবং ইবাদত-বন্দেগীতে অনুপম নমুনা। হাজ্জাজ আল আসওয়াদ বলেন, এক লোক আফসোস করে বলল, আমি যদি হাসানের যুহদ, ইবনে সিরীনের তাকওয়া, আমের ইবনে আবদে কায়েসের ইবাদত ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের তাফাক্কুহ পেতাম! লোকেরা জরিপ করে দেখল, এ সকল গুণাবলী হযরত হাসানের মাঝে রয়েছে।

তার মজলিসে শুধু আখেরাতের আলোচন হতো। হযরত আশআস বলেন, আমরা যখন হযরত হাসানের খেদমতে উপস্থিত হতাম আমাদের কাছে দুনিয়াবী কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন না, দুনিয়াবী কোনো সংবাদ নিতেন না। শুধু আখেরাতের আলোচনা চলত।[১]

আল্লাহভীতি ছিল তার মাঝে প্রবল; সর্বদা ভয়ে কণ্টকিত থাকতেন। হযরত ইউনুস ইবনে উবাইদ বলেন, হযরত হাসান যখন আসতেন মনে হতো এই মাত্র কোনো আপনজনকে দাফন করে এসেছেন। যখন বসতেন মনে হতো তিনি একজন এমন কয়েদি যার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আর যখন দোজখের আলোচনা করতেন মনে হতো দোজখ একমাত্র তার জন্য তৈরী করা হয়েছে।[২]

ইবাদতে বিশেষ হালত

ফরজ ও সুন্নত ছাড়া বাকি ইবাদত তিনি একাকী করতেন। তিনি তখন অন্য হালতে থাকতেন। হযরত হুমাইদ বলেন, আমরা একবার মক্কায় ছিলাম। হযরত শা'বী হাসান বসরীর সঙ্গে একাকী সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। আমি সেকথা হযরত হাসানকে বললাম। জবাবে তিনি বলেন, তাকে বলো, যখন মনে চায় চলে আসতে, সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। সেমতে একদিন তিনি গেলেন। সঙ্গে আমিও গেলাম। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে বললাম, হাসান ঘরে একা আছেন, আপনি ভিতরে যান। তিনি একা যেতে সাহস পেলেন না, আমাকেও সঙ্গে নিলেন।

আমরা ভিতরে পৌঁছে দেখি তিনি কেবলামুখী হয়ে এক আজীব হালতে বলছেন, হে ইবনে আদম! তুমি ছিলে অস্তিত্বহীন, তোমাকে অস্তিত্বে আনা হলো। তুমি চাইলে আর তোমাকে দেয়া হলো। কিন্তু যখন তোমার সময় এলো, আর তোমার কাছে চাওয়া হলো, তখন তুমি অস্বীকার করলে!

১. ইবনে সাদ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৬৪।
২. শাযারাতুয যাহাব খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৮।

আফসোস, তুমি কত বড় মন্দ কাজ করেছ! একথা বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। পরে হুঁশ ফিরে এলে একই কথা বলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত শা'বী বলেন, চলো, এখন যাই, শায়েখ অন্য হালতে আছেন।[১]

আমল ও ইখলাস

হযরত হাসান বসরীর মতে যুহদ শুধু মৌখিক দাবী বা জাহেরী বেশভূষার নাম নয়, বরং আসল বিষয় হলো আমল ও এখলাস। তিনি বলতেন, মানুষ যা বলে সেটা যদি বাস্তবায়ন করে তাহলে হবে সৌভাগ্যের বিষয়। অন্যথায় সেটা তার জন্য লজ্জার কারণ হবে।[২]

তার জীবন ছিল আপাদমস্তক আমলে মোড়ানো। হযরত আবু বকর হুযালী বলেন, তিনি যতক্ষণ না কোনো আমল নিজে করতেন সে ব্যাপারে অন্যকে নসিহত করতেন না। কোনো গোনাহ নিজে না ছেড়ে অন্যকে ছাড়তে বলতেন না। ইউনুস ইবনে আব্দকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এমন কাউকে জান যে হযরত হাসান বসরীর মত আমল করে? জবাবে তিনি বলেন, তার মত আমল করা দূরে থাক, আমি তো এমন কাউকে দেখিনি যে তার মত কথা বলতে পারে।[৩]

এখলাস ব্যতীত শুধু মজলিস কায়েম করা আর কম্বল পরিধান করাকে তিনি ধোঁকাবাজি মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমার মজলিসে বহু লোক বসে, কিন্তু তাদের অনেকের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া উপার্জন। একবার তার সামনে কম্বল পরিহিতদের আলোচনা এলে তিনি বলেন, এরা অন্তরের গোপন প্রদেশে আত্মগৌরবের ভুত লুকিয়ে রাখে। আর বাহ্যিক পোশাক-আশাকে বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করে। আল্লাহর কসম! ওরা কম্বল পরিহিত হয়েও দামী চাদর পরিহিতদের চেয়েও বেশি আত্মগর্বী।

তাতারী টুপি

এই ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য তিনি কখনো কখনো দামী কাপড় পরিধান করতেন। কুলসুম ইবনে জওশন বলেন, একবার হযরত হাসান বসরী ইয়ামানী জুব্বা ও চাদর পরিধান করে বের হলেন। তাকে এ পোশাকে দেখে হযরত ফরকদ আপত্তি করে বলেন, আপনার মত মানুষকে এ পোশাকে মানায় না? তিনি জবাব দিলেন, ইবনে উম্মে মাজকাদ! তুমি তো জান না, জাহান্নামীদের একটা বিরাট অংশ হবে কম্বল পরিহিত![৪]

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা ১৭১।
২. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭০।
৩. শাযারাতুয যাহাব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৭।
৪. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭২।

www.maktabatulabrar.com

আত্মপ্রতারণার ভয়

মানুষের সবচে' বড় দুশমন হলো তার নফস, যা তাকে কখনো জনপ্রিয়তা, কখনো প্রদর্শনপ্রিয়তা, কখনো আত্মগর্ব ও আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত করে ধ্বংস করে দেয়। হযরত হাসান বসরী এই আত্মপ্রেম ও আত্মপ্রতারণার ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। উঠতে বসতে তিনি এই দোয়া করতেন–হে আল্লাহ! শির্‌ক-নেফাক, গর্ব-অহংকার, ধোঁকাবাজি-প্রতারণা, যশ-খ্যাতি ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে আমাদের অন্তরকে হেফাজত করুন। হে অন্তরসমূহের নিয়ন্তা! আমাদের অন্তরকে দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন এবং ইসলামকে আমাদের দ্বীন বানিয়ে দিন।[১]

জনগণের ভক্তি-ভালোবাসাকে তিনি বড় পরীক্ষা মনে করতেন। গালেব আল-কাত্তান বলেন, একবার হযরত হাসান বসরী মসজিদে আসেন। তার সওয়ারির গাধা ফিরে গেছে। আমি তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার গাধা আনলাম। গাধাটার অভ্যাস ছিল প্রায়ই আরোহীর পা কামড়ে ধরত। তাই নিরাপত্তার জন্য আমি তার লাগাম ধরে রাখলাম। হযরত হাসান বসরী আরোহণ করছেন দেখে অনেক লোক সমবেত হলো। তাদের দেখে তিনি বলেন, তোমাদের অকল্যাণ হোক, মুসলমান যদি নিজের নফসের হিসাব না নেয়, নিজের হাকিকতের ব্যাপারে সর্তক না থাকে, তাহলে জনগণের এই মুগ্ধতা দুর্বল মানুষের অন্তর বরবাদ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিনি আত্মপ্রতারণা ও গর্ব-অহংকার থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজের প্রশংসা শোনা অপছন্দ করতেন। সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ ছাক্বাফী বলেন, কেউ যদি হাসানের সম্মুখে তার প্রশংসা করত তাহলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হতেন। কেউ তার জন্য দোয়া করলে তিনি খুবই খুশি হতেন।[২]

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

সর্বদা ঘরে বন্দি থাকলে আল্লাহর রাস্তায় জানবাজি লাগানোর উষ্ণতা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু তার রক্ত আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত হওয়ার জন্য সবসময় টগবগ করত। যদিও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ ছাড়া তার জিহাদে শরিক হওয়ার কথা প্রমাণিত নেই, কিন্তু সকল জীবনীকার এ

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, প্রষ্ঠা ১৬৪।
২. প্রাগুক্ত।

বিষয়ে একমত যে, শৈশব থেকে তার অন্তরে জিহাদের প্রতি আকর্ষণ ছিল। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে নিজের মিশন বানিয়ে নিয়েছে।[১]

এতে বুঝা যায়, তিনি অনেক জিহাদে শরিক ছিলেন, কিন্তু কাবুল, আন্দরকান ও উজবেকিস্তানের জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ হলো, তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন। জিহাদের মাধ্যমে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ছওয়াব উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য একজন সাধারণ সিপাহী হিসাবে অংশগ্রহণ করতেন। তাদের আলোচনা সাধারণত ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায় না।

জুলুমের তলোয়ারের মোকাবেলায় তওবার ঢাল

জালেম শাহী ও স্বৈরাচার শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা হল উম্মতের বিশিষ্ট লোকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হযরত হাসান বসরীর নীতি ছিল ভিন্ন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে চুপ থাকা ভালো মনে করতেন। উমারা ইবনে মেহরান বলেন, হাসান বসরীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি শাসকদের কাছে গিয়ে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন, মুমিনের উচিত নয় নিজের নফসকে লাঞ্ছিত করা। বর্তমানে শাসকদের তলোয়ারের ধার আমাদের জবানের চেয়ে বেশি। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওরা তলোয়ার দিয়ে জবাব দেয়। এমতাবস্থায় তিনি জুলুমের তলোয়ারের বিরুদ্ধে তওবার ঢাল ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন।

আবু মালেক বলেন, হযরত হাসান বসরীকে যখন বলা হলো আপনি ময়দানে নেমে এ অবস্থায় প্রতিকার কেন করেন না? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তলোয়ারের মাধ্যমে নন, বরং তওবার মাধ্যমে খুশি হন। তিনি বলতেন, মানুষ যদি শাসকদের পক্ষে থেকে মুসিবতে আক্রান্ত হয় আর তারা ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ পাক অচিরেই তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যারা তলোয়ার বের করে এবং তলোয়ারের ওপর নির্ভর করে, আল্লাহর কসম! তারা কখনো কোনো ভালো ফল দেখতে পাবে না।

১. তাযকেরাতুল হুফফাজ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১।

www.maktabatulabrar.com

ফেতনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকা

এজন্যই তিনি সর্বদা ফেতনা-ফাসাদ ও বিপ্লব-বিদ্রোহ থেকে বেঁচে থাকতেন। উমাইয়া শাসনামলে বহু বিপ্লব-বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তিনি নিজস্ব উসূলমতে কারো সঙ্গে শরিক হননি, বরং অন্যদেরকেও এসবে লিপ্ত হতে বারণ করতেন।

খলিফা আব্দুল মালেকের যমানায় যখন ইবনে আশআস বিদ্রোহ করল আর ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকের যমানায় বিদ্রোহ করল ইবনে মুহাল্লাব তখন কিছু লোক হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করল, এই ফেতনায় জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তিনি বলেন, কারো সঙ্গ দেবে না। এক শামী লোক জিজ্ঞাসা করেন, আমীরুল মুমিনীনেরও সঙ্গ দেবো না? তিনি শামী লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনেরও সঙ্গ দেবে না।[১]

ইবনে আশআস হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একটা বিরাট জামাত– যাদের মাঝে কতিপয় বিশিষ্ট তাবেয়ীও ছিলেন– তারাও তার সঙ্গ দেন। একবার উকবা ইবনে আব্দুল গাফের, আবুল জাওযা ও আব্দুল্লাহ ইবনে গালেবসহ কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, আবু সাঈদ! এই জালেম হাজ্জাজ যে অন্যায় রক্ত প্রবাহিত করছে, হারাম মাল নিচ্ছে, নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে, আরো বহু অপরাধ করছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বলেন, আমার মতে লড়াই করা উচিত নয়। কারণ সেটা যদি আল্লাহর আযাব হয়ে থাকে তাহলে তলোয়ার দিয়ে তোমরা সেটা প্রতিহত করতে পারবে না। আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। যেন আল্লাহ পাক নিজেই সে ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করে দেন। আল্লাহ পাকই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী।[২]

একবার ইবনে আশআসের বিদ্রোহের সময় হযরত হাসান বসরী ফাঁদে পড়ে যান। কিন্তু জীবনবাজি রেখে কোনোমতে তিনি সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসেন। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল প্রবল। শুধু বসরা নয়, বরং সমগ্র ইরাকে ছিল তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব। তিনি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৬৪।
২. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৬৩।

করায় অনেক সাবধানী লোক ইবনে আশআসের সঙ্গ দিতে অস্বীকার করে। লোকেরা তাকে বলল, আপনি কি চান মানুষ আপনার জন্য জীবনবাজি লাগাক, যেমন জঙ্গে জামালে হযরত আয়েশার জন্য জীবনবাজি লাগিয়েছে? তাহলে যে কোনো উপায়ে হযরত হাসান বসরীকে ময়দানে নামান! এই পরামর্শ পেয়ে ইবনে আশয়াস জোরপূর্বক তাকে ধরে নিয়ে গেল। তিনি বাধ্য হয়ে তো গেলেন, কিন্তু লোকেরা তার ব্যাপারে কিছুটা গাফেল হলে তিনি জীবনবাজি রেখে একটা নদীতে ঝাঁপ দেন। পরে সেখান থেকে কোনোক্রমে জীবন বাঁচিয়ে ফিরে আসেন।

একবার সাঈদ ইবনে আবুল হাসান নামে এক লোক হাজ্জাজের বিরোধী হয়ে যায়। সে মানুষকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। সে একবার হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা তো আমিরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি না, তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে চাই না, আমরা বরং আমিরুল মুমিনীনের প্রতি এ জন্য ক্ষিপ্ত যে, তিনি হাজ্জাজের মত স্বৈরাচারকে আমাদের শাসক বানিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার কী অভিমত? আহলে শামের ব্যাপারেও আপনার কী অভিমত? তিনি হামদ ও ছানার পর বলেন, ভাইয়েরা আমার! হাজ্জাজকে আল্লাহ পাক শাস্তিস্বরূপ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তলোয়ার দিয়ে আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলা করো না। বরং চুপ থাক, ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ পাকের কাছে কান্নাকাটি ও রোনাজারি করো।[১]

ইজহারে হক

তবে রাজা-বাদশা ও শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় চুপ থাকতেন না। কখনো তাদের সম্মুখে মতামত প্রকাশের সুযোগ পেলে নির্দ্বিধায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকের যুগে ওমর ইবনে হুবায়রা যখন খোরাসান ও ইরাকের গভর্নর হলো তখন সে ইরাকের বিশিষ্ট আলেম যথা হযরত হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন ও ইমাম শা'বীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়াযিদ আল্লাহ পাকের খলিফা, আল্লাহ পাক তাকে বান্দাদের জন্য নিজের নায়েব বানিয়েছেন, তাদের থেকে তার আনুগত্য আর আমরা শাসকদের থেকে তার নির্দেশ বাস্তবায়নের ওয়াদা নিয়েছেন। আপনারা জানেন, তিনি আমাকে গভর্নর বানিয়েছেন, আমার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছেন, আমি তা বাস্তবায়ন করছি।

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৬৪।

www.maktabatulabrar.com

এমতাবস্থায় তার ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? হযরত ইবনে সিরীন ও ইমাম শা'বী গোলমেলে জবাব দিয়ে পার পেয়ে গেলেন। হযরত হাসান বসরী একদম চুপ। ইবনে হুবায়রা বলেন, আপনার মতামতও ব্যক্ত করুন! জবাবে হযরত হাসান বসরী বলেন, ইবনে হুবায়রা! তুমি ইয়াযিদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর বিষয়ে তাকে ভয় করো না। আল্লাহ পাক তোমাকে ইয়াযিদ থেকে বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু ইয়াযিদ তোমাকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারবে না। অতি দ্রুতই আল্লাহ তোমার কাছে ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তোমাকে ক্ষমতার প্রাসাদ থেকে উৎখাত করে কবরের সংকীর্ণতায় ছুঁড়ে দেবেন। তখন আমল ছাড়া আর কিছুই তোমার কাজে আসবে না। আল্লাহ পাক রাজা-বাদশা বানিয়েছেন নিজের দ্বীন ও বান্দাদের সাহায্য করার জন্য। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দ্বীন ও তার বান্দাদের ওপর ছড়ি ঘুরিও না। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা ঠিক নয়।[১]

তাকদীরের মাসআলা

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত হাসান বসরী কাদ্‌রী ছিলেন। এটা একদমই ঠিক নয়। এর কারণ সম্ভবত এই, কোনো কোনো তাবেয়ী এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন যে, কোনো কাদরীর সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। কিন্তু হযরত হাসান বসরী তাদের সঙ্গে মেলামেশাকে ক্ষতিকর মনে করতেন না। ফলে অজ্ঞ লোকেরা কাদরী দর্শন তার দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়। অথচ তিনি ছিলেন সেসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ওমর বলেন, কাদরীরা হযরত হাসানের কাছে আসা-যাওয়া করত। কিন্তু তিনি ছিলেন তাদের চিন্তাদর্শন থেকে মুক্ত।

হযরত হাসান বসরী বলেন, হে ইবনে আদম! আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করো না। আল্লাহর নাফরমানি করে কারো আনুগত্য করো না। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে প্রশংসা করো না। আল্লাহ যা তোমাকে দেননি সেজন্য কাউকে তিরস্কার করো না। আল্লাহ পাক কুলমাখলুক সৃষ্টি করেছেন। সবাই তার চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী চলছে। যে মনে করে লোভ করে নিজের রিজিক বাড়াতে পারবে, তার ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে সে নিজের বয়স কিছুটা বাড়িয়ে নিক।

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৬৫।

নিজের রং, গড়ন, গঠন পরিবর্তন করে নিক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাড়িয়ে নিক। এমন হওয়া যখন সম্ভব নয়, সুতরাং বুঝা গেল, এসবে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। প্রতিটি বিষয় তাকদীর অনুযায়ী চলছে।

মূলত হাসান বসরীর কতিপয় অস্পষ্ট কথা থেকে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি কাদরী। আর যদি তিনি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও থাকেন তাহলে শেষ জীবনে রুজু করে নিয়েছেন। আসমাঈ নিজের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত হাসান কখনো কখনো তাকদীর নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে রুজু করে নিয়েছেন। কাজী আতা ইবনে ইয়াসার ছিলেন কাদরী। তার কথা ছিল জাদুর মত। তিনি ও সাঈদ জুহানী হযরত হাসান বসরীর কাছে আসা-যাওয়া করতেন এবং তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর করতেন। তারা বলতেন, আবু সাঈদ! (হযরত হাসান বসরীর কুনিয়ত) এ সকল শাসকরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করে এবং তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যায়, পরে আবার তারাই বলে, আমাদের সব কার্যকলাপ আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী হচ্ছে। একথা শুনে হযরত হাসান বসরী বলেন, 'আল্লাহর এই দুশমনরা মিথ্যাবাদী।' এ জাতীয় ঘটনা থেকে লোকেরা তাকে কাদরী বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ জানা কথা, কথাটা তিনি ক্ষেত্রবিশেষ বলেছেন, যার সঙ্গে কদরী আকীদার কোনো সম্পর্ক নেই।

তুমি হাসান বসরীর চেয়ে বুদ্ধিমান

একবার হযরত হাসান বসরীকে কেউ বলল, এখানে একজন লোক সর্বদা একাকী থাকেন। একদিন হযরত হাসান বসরী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মনে হয় তুমি নির্জনতা ভালবাস? মানুষের সঙ্গে মেলমেশা কেন করো না? জবাবে তিনি বলেন, আমি কাজে ব্যস্ত থাকি, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার হিম্মত হয় না। তিনি নিজেকে গোপন করে বলেন, এখানে হাসান বসরী থাকেন তার সঙ্গে তো সাক্ষাৎ করতে পারো, তার কাছে আসা-যাওয়া করতে পারো? তিনি বলেন, যে ব্যস্ততার কারণে অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করি না, একই ব্যস্ততার কারণে হাসান বসরীর কাছেও যাওয়া হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সেই ব্যস্ততা? জবাবে বলেন, যখনি চিন্তা করি কেবল আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং নিজের গোনাহ দৃষ্টিগোচর হয়। তাই নেয়ামতের শুকরিয়া করি আর গোনাহের জন্য তওবা করি। তখন তিনি বলেন, আসলেই তুমি হাসান বসরীর চেয়ে বুদ্ধিমান। ঠিক আছে, তুমি নিজের কাজে থাক।[১]

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২৪।

www.maktabatulabrar.com

কথার আশ্চর্য প্রভাব

হযরত হাসান বসরী এক যুবককে দেখেন হাসি-তামাশায় মগ্ন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছ? যুবক জবাব দিল, না। তিনি আবারো জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি জান, তুমি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে? সে আরজ করল, তাও জানি না। তাহলে এভাবে হাসো কেন, জিজ্ঞাসা করলেন হযরত হাসান বসরী। বর্ণনাকারী বলেন, এর পর থেকে আর কখনো তাকে হাসতে দেখা যায়নি।[১]

ইন্তিকাল

আল্লাহর কতিপয় বিশেষ বান্দা আছেন যারা ইন্তিকালের পূর্বেই মাহবুবে হাকিকীর নৈকট্য লাভের ইঙ্গিত পান। স্বয়ং পবিত্র কুরআনে রসূল সা.-এর ইন্তিকালের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কতিপয় লোক স্বপ্নালোকে হযরত হাসান বসরীর ইন্তিকালের ইঙ্গিত পান। তার ইন্তিকালের কয়েকদিন পূর্বে এক লোক স্বপ্নে দেখে, একটি পাখি মসজিদের সবচে' সুন্দর পাথরটি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রসিদ্ধ স্বপ্নের ব্যাখ্যাতা ইবনে সিরীন এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত হাসান বসরীর ইন্তিকাল হয়ে যাবে।[২] স্বপ্ন দেখার কিছু দিনের মধ্যে হযরত হাসান বসরী মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। তখন তিনি আফসোস করে বলতেন, হায়, মানুষ যদি সুস্থতার দিনগুলোতে অসুস্থার জন্য কিছু রেখে দিত! শেষ মুহূর্তে ছেলেকে নিজের সব কিতাবাদি একত্র করার নির্দেশ দেন। সব কিতাব একত্র করা হলে খাদেমকে নির্দেশ দেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে। চোখের পলকে উলুম ও ফুনুনের সমস্ত দফতর পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। শুধু একটি কিতাব অবশিষ্ট রাখেন। সেটা সম্ভবত কুরআন সম্পর্কিত কোনো বিষয়, কুরআনের সম্মানার্থে যা রেখে দিয়েছেন।

জীবনের শেষ মুহূর্তে কাতেবকে দিয়ে লিখিয়েছেন, হাসান এই সাক্ষ্য দেয়া- لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই সাক্ষ্য দেয়, সে সোজা জান্নাতে চলে যায়।

হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে ১১০ হিজরীর ৪ঠা মহররম মতান্তরে পহেলা রজব ৮৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে বসরায় দাফন করা হয়। মুহাদ্দিস আইয়ুব ও হুমাইদ আত-তাবীল তাকে গোসল দেন। পরের দিন জুমার নামাজের পর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২৪।
২. ইবনে খাল্লেকান খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৯। ইবনে সাদ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৪।

জানাযায় মানুষের প্রচণ্ড ভিড় হয়। শহরের সব মানুষ জানাযায় শরিক হয়। এমনকি সেদিন বসরার জামে মসজিদে আসরের নামাজ পড়ার মত কেউ ছিল না।[১]

মৃত্যুর সময় একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটে। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করেন, সেটা কোন্ গোনাহ? পরে ইন্তিকাল করেন। এক বুযুর্গ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেন–মৃত্যুর সময় হাসার কারণ কি? আর সে কথার অর্থই বা কি? তিনি বলেন, মৃত্যুশয্যায় আমি কাউকে বলতে শুনেছি, হে মালাকুল মউত! তার ব্যাপারে কঠোরতা করুন। কারণ এখনো তার একটি গোনাহ রয়ে গেছে। এতে আমি খুশিতে জিজ্ঞাসা করি, সেটা কোন্ গোনাহ?

সিয়ারুল আকতাবের লেখক তার পাঁচজন খলিফার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ।[২]

হুলিয়া তথা দৈহিক গঠন

হযরত হাসান বসরী বাতেনী সৌন্দর্যের পাশাপাশি দৈহিক সৌন্দর্যেও ছিলেন অতুলনীয়। দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে আল্লাহ পাক ব্যক্তিত্বের প্রভাবও দান করেছেন। যেই মজলিসে বসতেন সকলের মধ্যমণি মনে হতো। আসেম আহওয়াল বলেন, আমি একবার বসরা যাওয়ার সময় ইমাম শা'বীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বসরায় আপনার কোনো প্রয়োজন আছে? জবাবে তিনি বলেন, হাসানকে আমার সালাম বলবে। আসেম বলেন, আমি তো হাসানকে চিনি না। শা'বী তার পরিচয় দেন এভাবে, বসরায় গিয়ে যাকে সবচে' সুদর্শন মনে হবে, যাকে দেখে তোমার মনে ভয় ও ভক্তি জাগ্রত হবে, তাকে আমার সালাম বলবে। সেমতে তিনি সালাম পৌঁছালেন। সত্যিই সে লোকটি ছিল হাসান বসরী।[৩]

পোশাক-আশাক

দৈহিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তিনি উন্নত মানের পোশাক পরতেন। তবে বাহ্যিক আড়ম্বর তিনি অপছন্দ করতেন। এটাকে অহংকারের আলামত মনে করতেন। তাই অতি দামী ও সুন্দর কাপড় পরিধান করতেন না। তবে বিখ্যাত জায়গার উন্নত মানের কাপড় আনাতেন। শিকার কাতান,

১. ইবনে সাদ, খণ্ড ৭১, পৃষ্ঠা ১৭৭।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২৭।
৩. তাহযিবুত তাহযিব খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮১।

www.maktabatulabrar.com

ইয়ামানী ফুলতোলা চাদর ব্যবহার করতেন। জুব্বা, চাদর ও পাগড়ি হতো সুতির। পাগড়ি ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না।[১]

হযরত হাসান বসরীর কতিপয় বাণী

হযরত হাসান বসরী অযথা কথাবার্তা কম বলতেন। তার কথাবার্তা হতো জ্ঞানগর্ভ ও হেকমতপূর্ণ; যা ভাষা মাধুর্যে ও চিন্তা-চেতনায় অনন্য। তাতে বহু আখলাকী ও রুহানী রহস্য উন্মোচিত হতো। তার কতিপয় বাণী এখানে উল্লেখ করা হলো–

● হযরত হাসান বসরী বলেন, মানুষের মনে যেসব ওয়াসওয়াসা আসে এবং চলে যায়, সেসব শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ পাকের জিকির ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেসব দূর হয়ে যায়। আর যেসব ওয়াসওয়াসা মনে থেকে যায় সেসব নফসের পক্ষ থেকে। সেসব দূর করার জন্য নামাজ-রোজা ও রিয়াজত-মুজাহাদা করতে হয়।

● আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে পরিবার পরিজনের ফাঁদে ফেলেন না। অর্থাৎ তাদের কল্যাণ করতে গিয়ে নিজের অকল্যাণ বয়ে আনে না।

● বিনয়ী হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ঘর থেকে বের হয়ে যাকে দেখবে তাকেই নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে।

● গোনাহের পর তওবা করলে আল্লাহ পাকের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়।

● এক লোক তার কাছে নিজের অন্তরের কাঠিন্যের অভিযোগ করলে তিনি জবাবে বলেন, তুমি বেশি বেশি জিকির-ফিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণ করবে।

● মৃত ব্যক্তির জন্য সবচে' আপদ হয়ে দেখা দেয় তার পরিবার-পরিজন। কারণ তারা কাঁদে, কিন্তু তার ঋণ আদায় করে না। ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

● এক লোকের শত্রুতার বিনিময়ে হাজার লোকের ভালোবাসাও কাম্য নয়।

● লোভ-লালসা আলেমদেরকে লাঞ্ছিত করে।

● প্রকাশ্যে নিজের নফসকে তিরস্কার করা প্রশংসা করার নামান্তর।

● ভাই বন্ধুর সম্মান বজায় রাখ, তাহলে তাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক থাকবে অটুট।

১. তাহযিবুত তাহযিব খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮১।

● ইবনে আদম যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখে তাহলে আশার ছলনে ভুলবে না।

● যে ব্যক্তি বিনয় প্রকাশের জন্য পশমী কাপড় পরিধান করে, আল্লাহ পাক তার চোখে ও কলবে নুর বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি অহংকারভরে পশমী কাপড় পরিধান করে সে অবাধ্যদের সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

● হায়, আমি যদি এমন কোনো খাবার খেতাম যা পেটে গিয়ে ইটে পরিণত হয়! কেননা আমি শুনেছি, ইট পানিতে তিনশ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে।

● তিনি কসম করে বলেন, যে ব্যক্তি ধনসম্পদকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে আল্লাহ পাক তাকে লাঞ্ছিত করেন।

● জ্ঞানীর জবান থাকে তার কলবের পিছনে। কিছু বলতে গেলে কলবের কাছে রুজু করে। কথাটা উপকারী হলে বলে, অন্যথায় বলে না। আর মূর্খের কলব থাকে তার জবানের কিনারে। কথা বলার সময় সে কলবের দিকে রুজু করে না, বরং জবানে যা আসে তাই বলে ফেলে।

● দুনিয়া মূলত তোমার সওয়ারী। তুমি যদি তার ওপর সওয়ার হও তাহলে সে তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। আর যদি সে তোমার ওপর সওয়ার হয়ে যায় তাহলে তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।

● কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইলে দেখো, সে কেমন? সে যদি আল্লাহর অনুগত হয় তাহলে তার ব্যাপারে সাবধান থাকো। কারণ আল্লাহ পাক তাকে কখনো তোমার হাতে সোপর্দ করবেন না, তাকে একা ছেড়ে দেবেন না। আর যদি সে আল্লাহর নাফরমান হয় তাহলে তার সঙ্গে শত্রুতা করার প্রয়োজন নেই। কারণ সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। খামাখা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

● যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে তার সঙ্গে অবশ্যই বন্ধুত্ব রাখো। কারণ যে ব্যক্তি সৎ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে সে যেন আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে।

● আমি এমন কাউকে দেখিনি যে দুনিয়া চায়, অথচ তার আখেরাত লাভ হয়েছে। পক্ষান্তরে যে আখেরাত চায় তার দুনিয়াও লাভ হতে পারে। তাহলে এমন জিনিস কেন চাইবে না যার ফলে উভয়টি লাভ হয়?

● ইসলাম হলো তুমি তোমার কলবকে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করবে। সব মুসলমান যেন তোমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।

www.maktabatulabrar.com

● তিনি বলেন, জাহান্নাম থেকে এক ব্যক্তিকে এক হাজার বছর পর বের করা হবে। হায়, আমি যদি সেই লোকটি হতাম!

● তিনি আরো বলেন, আমরা এমন আকাবির হযারাতকে পেয়েছি যারা হালাল জিনিসের ব্যাপারেও এতটা নির্মোহ ছিলেন তোমরা হারাম জিনিসের ব্যাপারেও ততটা নির্মোহ নও।

● একবার এক লোককে দেখেন হাদিস পড়ছে–المرء مع من أحب (মানুষ তার সঙ্গে থাকবে যাকে সে মহব্বত করে।) তিনি বলেন, এই হাদিস পড়ে ধোঁকা খেও না। কারণ তার সঙ্গে তখনি থাকবে যখন তার মত আমল করবে।

● তার অভ্যাস ছিল কেউ তার গিবত করলে তাকে হাদিয়া পাঠাতেন। তারপর বলতেন, তুমি যে হাদিয়া পাঠিয়েছ সেটা আমার হাদিয়ার চেয়ে বড়।

● তিনি বলেন, কেউ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে মহব্বত করে, পরে তাকে গোনাহ করতে দেখেও ঘৃণা না করে, তাহলে বুঝতে হবে–সে নিজের দাবীতে মিথ্যাবাদী।[১]

(৩) আবুল ফযল খাজা আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ.

তিনি ছিলেন খাজা হাসান বসরীর সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা। দিনে রোজা রাখতেন আর রাতে নামায পড়তেন। প্রতি তিনদিন পর পর ইফতার করতেন। তাও তিন চার লোকমার বেশি নয়। তার দুনিয়া-বিমুখিতা ছিল বিস্ময়কর। আল্লাহর রাস্তায় সব বিলিয়ে দিতেন। কোনো দিনার দিরহাম হাদিয়া পেলে তখনি বিলিয়ে দিতেন। ছিলেন ফকিহগণের শিরোমণি ইমাম আজম আবু হানিফার শাগরেদ। বয়াতের পূর্বে চল্লিশ বছর মুজাহাদা করেছেন। জাহেরী ইলমও হযরত হাসান বসরী থেকে হাসিল করেছেন। হযরত আলী রা.-এর কাছেও ইলম শিখেছেন।[২]

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

তার সুলুকের পথে আসাটা ছিল বড়ই চমকপ্রদ। তার এক গোলাম ছিল। একদিন সে তার কাছে আবেদন করল, আমাকে রাতের বেলায় ছুটি দিন বিনিময়ে আমি আপনাকে এক দিনার করে দেব। তিনি তাকে রাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। একদিন কেউ তার কাছে অভিযোগ করল,

---
১. অধিকাংশ তবকাতে কুবরা থেকে ৪৫।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২৭।

আপনার গোলাম রাতের বেলায় কাফন চুরি করে। তিনি তদন্তের জন্য একদিন রাতে তাকে পর্যবেক্ষণ করেন। দেখেন সে কিছুটা দূরে একটা কবরস্তানে গেল। সেখানে গিয়ে নামাজে মশগুল হয়ে গেল। সকাল পর্যন্ত নামাজ পড়ল। সকালে অত্যন্ত অনুনয় করে দোয়া করল–হে আমার বড় সরদার, আমার ছোট সরদারের বিনিময় দাও! তৎক্ষণাৎ তার হাতে একটি দিনার পড়ল। সে দিনার নিয়ে চলে এলো, কিন্তু মনিব সেখানেই রয়ে গেলো এবং নিজের বদ-ধারণার জন্য দু'রাকাত নামাজ পড়ে ইস্তিগফার পড়ল। মনিব সেখানেই নিয়ত করল, তাকে আযাদ করে দিবেন।

সকালে সেখানকার লোকদের কাছে মনিব জানতে পারেন, তার বাড়ি দুই বছরের রাস্তা দূরে। তিনি অত্যন্ত পেরেশান হন। হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ার এসে জিজ্ঞাসা করল, আব্দুল ওয়াহেদ! কী ব্যাপার, বসে আছ কেন? তিনি তাকে উক্ত ঘটনা শোনান। সে পরামর্শ দিল, কোথাও যেও না, তোমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে, দ্রুতগতির ঘোড়ায় গেলেও দু'বছর লাগবে। রাতে গোলাম আবার আসবে, তখন তার সঙ্গে চলে যেও। এ ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই।

দ্বিতীয় দিন গোলাম এলো বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে। মনিবকে বলল, খেয়ে নিন আর কখনো এমনটা করবেন না। তিনি তৃপ্তি সহকারে খেলেন। পরে গোলাম রীতিমত ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল। সকালে যথারীতি দিনার এলো। গোলাম দিনারদুটি মনিবের খেদমতে পেশ করল। মনিব তার সঙ্গে কয়েক কদম হেঁটে বাড়ি চলে আসেন। গোলাম আরজ করল, আপনি তো আমাকে আযাদ করতে চেয়েছেন? মনিব বলল, হ্যাঁ, চেয়েছি। পরে সঙ্গে সঙ্গে আযাদ করে দেন। গোলাম অনেক শুকরিয়া আদায় করল। শুকরিয়াস্বরূপ কয়েকটি পাথর অথবা কঙ্কর হাদিয়া দিল। পরে গায়েব হয়ে গেল। সকালে উঠে মনিব দেখল, সেগুলো মূল্যবান পাথর। সেগুলো বিক্রি করে তিনি গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেন এবং সেদিন থেকে দুনিয়া-বিমুখ হয়ে যান।[১]

একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা

শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, একবার আমার পায়ে ব্যথা হয়। ফলে নামাজ পড়তে খুবই কষ্ট হতো। এক রাতে নামাজ পড়তে উঠে পায়ে

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১২৮।

অসম্ভব ব্যথা অনুভব করলাম। অতি কষ্টে নামাজ শেষ করে চাদর মুড়ে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি, একটি রূপবতী মেয়ে কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে আমার পাশে এসে বসল। অন্যরা বসল তার পিছনে। সে তাদের একজনকে বলল, ওকে ওঠাও; কিন্তু সাবধানে যেন জাগ্রত না হয়। তারা সকলে মিলে আমাকে উঠালো। পরে সে বলল, তার জন্য নরম বিছানা বিছাও, নরম বালিশ রাখো। তারা পর পর সাতটি বিছানা বিছাল এবং চমৎকার সবুজ রঙের বালিশ রাখল। এমন সুন্দর বিছানা-বালিশ আমি কখনো দেখিনি। পরে নির্দেশ দিল, তাকে বিছানায় শুইয়ে দাও; কিন্তু সাবধান চোখ যেন না খোলে! তার নির্দেশমত সবাই আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি তাদেরকে দেখতে থাকলাম এবং তাদের কথা শুনতে থাকলাম। পরে সে নির্দেশ দিল, তার চারপাশে ফুল ছড়িয়ে দাও। তারা আমার চারপাশে ফুল ছড়িয়ে দিল। পরে মেয়েটি আমার কাছে এসে আমার ব্যথার জায়গায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর বলল, এখন থেকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন, আল্লাহ পাক আপনাকে সুস্থ করে দিন! একথা বলতেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমি সুস্থ হয়ে গেছি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনো অসুস্থ হইনি। আমি আজো পর্যন্ত তার কথার মিষ্টতা অনুভব করি।

জানমাল কুরবানের বিনিময়

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, একবার আমি কতিপয় মুরিদসহ কোনো জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আমি সঙ্গীদের বললাম, তোমরা জিহাদের ফযিলত সম্বন্ধে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করো। তাদের মধ্যে একজন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করল–

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।'[১] আয়াতটি শুনে চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি বালক উঠে দাঁড়াল। তার পিতা তার জন্য বহু ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছে। সে বলল, হে শায়েখ! সত্যিই কি আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তিনি খরিদ করে নিয়েছেন। বালকটি বলল, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জান-মাল আমি জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। আমি বললাম,

১. সুরা তওবা ১১১।

www.maktabatulabrar.com

দেখ, চিন্তা-ভাবনা করে বলো, তরবারির ধার বড়ই তীক্ষ্ণ আর তুমি এখনো বালক। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। সে বলল, 'হযরত! আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার সমস্ত জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিলাম।'

আমি আমার কথার জন্য পস্তালাম, লজ্জিতও হলাম। মনে মনে বললাম, হায়! এতটুকু ছেলে কেমন বুদ্ধিমান আর আমি বুড়ো হয়েও বুদ্ধিমান হতে পারলাম না!

মোটকথা, ছেলেটি নিজের ঘোড়া, অস্ত্র ও খরচের জন্য কিছু টাকা রেখে সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিল এবং আমার হাতে বয়াত হলো। যাত্রার দিন ছেলেটি আমার নিকট এসে বলল, হযরত! আসসালামু আলাইকুম! আমি বললাম, ওয়াআলাইকুমুস সালাম। সুসংবাদ লও, তোমার ক্রয়-বিক্রয় খুবই লাভজনক হয়েছে। অতঃপর আমরা জিহাদে যাত্রা করলাম। ছেলেটি এ অবস্থায় আমাদের সাথে চলতে লাগল যে, দিনের বেলায় রোজা রাখত আর রাতের বেলা সারারাত নামাজ পড়ত। অবসরে আমার ও সওয়ারির সেবা করত। আমরা ঘুমিয়ে পড়লে সওয়ারিগুলো হেফাজত করত।

আমরা রোম দেশের এক শহরের নিকটবর্তী হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম বালকটি বলছে, হে সুনয়না! হে মনমোহিনী! তুমি কোথায়? আমার সাথীরা বলল, সম্ভবত ছেলেটি পাগল হয়ে গেছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কাকে ডাক? সুনয়না ও মনমোহিনী কে? সে জবাব দিল, আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। এক লোক এসে বলল, তুমি সুনয়না ও মনমোহিনীর নিকট চলো। আমি তার সঙ্গে চললাম। সে আমাকে একটি বাগানে নিয়ে গেল। দেখলাম, সেখানে একটি নহর প্রবাহিত। নহরের পানি খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। নহরের তীরে একদল সুন্দরী যুবতী বহু মূল্যবান পোশাক ও বিচিত্র অলঙ্কারে সজ্জিতা। তারা আমাকে দেখে আনন্দিত হলো এবং বলতে লাগল, ইনিই সুনয়না ও মনমোহিনীর স্বামী। আমি তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের মধ্যে সুনয়না ও মনমোহিনী কে? তারা বলল, আমরা তার বাঁদি, তিনি সম্মুখে আছেন। আমি সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। একটু যেতেই সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ ও দুধের নহর বিশিষ্ট একটি মনোরম বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানেও দেখলাম নহরের তীরে অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দরী

www.maktabatulabrar.com

কতিপয় যুবতীকে দণ্ডায়মান। তাদের দেখে আমি অজ্ঞানের মত হয়ে গেলাম। তারা আমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলো এবং বলতে লাগল, আমরা তার সেবিকা, আপনি আরো সম্মুখে অগ্রহর হোন। আমি অগ্রসর হয়ে দেখলাম, খাঁটি শরাবের নহর প্রবাহিত হচ্ছে। নহরের তীরে আরো অপরূপ সুন্দরী যুবতীরা দণ্ডায়মান। আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সুনয়না ও মনমোহিনী কি তোমাদের মধ্যে আছেন? তারা বলল, আমরা তার দাসী, আপনি আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন। আমি আরো অগ্রসর হয়ে দেখলাম খাঁটি মধুর নহর। নহরে কতিপয় অনিন্দ সুন্দরীকে দেখলাম, এদের সৌন্দর্য সবার সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে। আমি সালাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, সুনয়না ও মনমোহিনী কি তোমাদের মধ্যে আছেন? তারা বলল, আমরা তার সেবিকা, আপনি আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন। আমি অগ্রসর হয়ে একটি মোতিখচিত তাঁবু দেখতে পেলাম। এর দ্বারে একজন অনুপম সুন্দরী দণ্ডায়মান। সে আমাকে দেখেই আনন্দের সাথে আমাকে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেল। তাঁবুতে প্রবেশ করে দেখলাম, সুনয়না একটি স্বর্ণের সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাকে দেখেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সে আমাকে দেখে বলে উঠল, মারহাবা! মারহাবা! হে আল্লাহর অলী! আমার কাছে তোমার আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে চাইলাম। সে বলল, থাম; এখনো সময় হয়নি। এখনো তোমার মধ্যে দুনিয়ার জীবন অবশিষ্ট আছে। আজ রাতে ইনশাআল্লাহ তুমি এখানে এসে ইফতার করবে। এ স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম। তখন আমার অবস্থা এই যে, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

খাজা আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, আমাদের কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই একদল শত্রু সৈন্য এসে আমাদের ওপর আক্রমণ করল। ছেলেটি সকলের আগে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একে একে নয়জন কাফেরকে হত্যা করে শহীদ হয়ে গেল। সে শহীদ হয়ে গেলে আমি তার নিকট গিয়ে দেখলাম, রক্তাক্ত দেহে সে হাসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার প্রাণবায়ু উড়ে গেল।[১]

গায়বী সতর্কবার্তা

খাজা আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, একরাতে আমার এমন ঘুম হল যে, জিকির অজিফা সব ছুটে গেল। স্বপ্নে দেখি, রেশমি কাপড় পরিহিত একটি

১. কারামাতুল আউলিয়া ৫৭ ও নুযহাতুল বাসাতীন।

অনিন্দ সুন্দরী মেয়ে। তার মত রূপসী আমি কখনো দেখিনি। তার পায়ের জুতো ও ফিতা পর্যন্ত তাসবীহ পড়ছে। সে আমাকে বলল, হে ইবনে যায়েদ! আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করো। কেননা আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টায় আছি। পরে সে একটি কবিতা পড়ল। যার অর্থ হলো–'যে আমাকে ক্রয় করবে এবং আমার দিলের প্রশান্তি হবে সে নিজের ব্যবসায় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মূল্য কি? সে জবাব দিল, আমার মূল্য আল্লাহর মহব্বত ও তার আনুগত্য। আমার মূল্য বিষণ্ন মনে দীর্ঘ চিন্তা-ফিকির। পরে জিজ্ঞাসা করলাম, হে মেয়ে! তোমার মালিক কে? সে জবাব দিল, আমার মালিক হলেন তিনি যার কাছে আমার মূল্য পরিশোধ করলে ফিরিয়ে দেন না, বরং কবুল করেন। এ জবাব শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং কসম করে বললাম, রাতে আর কখনো ঘুমাব না। পরে তার অবস্থা হলো এমন, চল্লিশ বছর এশার অজু দিয়ে ফজর নামাজ পড়েছেন।[১]

পাদ্রির নসিহত

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, আমি চীন দেশে এক পাদ্রির ইবাদতগাহে গেলাম। গিয়ে ডাক দিলাম, পাদ্রি মশাই আছেন! তিনি জবাব দিলেন না। আমি আবারো ডাক দিলাম। এবারো তিনি জবাব দিলেন না। তৃতীয় বার ডাক দিলে তিনি উঁকি দিয়ে দেখেন। পরে বলেন, আমি তো পাদ্রি নই। পাদ্রি তাকে বলে যিনি আসমানের প্রভুকে ভয় করেন এবং তার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করেন। তার দেয়া বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেন এবং তার সিদ্ধান্তে রাজি থাকেন। তার দানে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার নেয়ামতের শুকর আদায় করেন। তার বড়ত্বের সামনে করেন মাথা নত। তার হিসাব ও আযাবের ভয় করেন। তার ভয়ে ও মহব্বতে দিনে রোজা রাখেন এবং রাতে নামাজ পড়েন। দোজখের স্মরণ তাকে রাখে সজাগ ও সতর্ক। তাকে বলা হয় পাদ্রি। আমি তো একটা দাগা খাওয়া কুকুর। নিজেকে এখানে বন্দি করে রেখেছি যেন আমার দ্বারা কারো কষ্ট না হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে পাদ্রি! কোন জিনিস মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়? সে জবাব দিল, দুনিয়ার অযাচিত লোভই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়। এমনিভাবে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস।

১. হিলয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৬৯ ও সিফাতুস সফওয়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬০।

www.maktabatulabrar.com

দুনিয়ার লোভ সকল অন্যায় পাপাচারের মূল। বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে বের করে দেয় এবং গোনাহের জন্য তওবা করে।[১]

এক হাবশীর ঘটনা

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, একবার আমি ও আইয়্যুবে সাখতিয়ানী সিরিয়ার পথ ধরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক হাবশী লোককে দেখতে পেলাম লাকড়ির বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে হাবশী! তোমার প্রভু কে? সে জবাব দিল, আমার মত মানুষের কাছে আপনারা এমন প্রশ্ন করছেন? পরে সে বোঝাটি মাটিতে রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, হে আল্লাহ! এটা স্বর্ণ বানিয়ে দিন। বোঝাটা তখনি স্বর্ণে পরিণত হলো। পরে আমাদের বলল, দেখুন! এরপর আবার দোয়া করল, হে আল্লাহ! এটাকে পুনরায় লাকড়ি বানিয়ে দিন। পরে সেটা লাকড়ি হয়ে গেল। পরে বলল, আরেফীনদের জিজ্ঞাসা করতে থাকুন, কেননা তাদের কারামত কখনো খতম হয় না।

হযরত আইয়্যুব বলেন, আমি হাবশীর কারামত দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আবার লজ্জিতও হলাম। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাছে কি খাবার মত কিছু আছে? সে ইশারা করলে হাতে একটি পেয়ালা এলো। তাতে ছিল মধু। দেখতে বরফের চেয়ে সাদা আবার মেশকের চেয়েও খুশবুদার। সে বলল, এটা খেয়ে নিন, এটা মৌমাছির মধু নয়। আমরা খেলাম। মনে হলো, অপূর্ব! এমন মিঠা জিনিস কখনো খাইনি। আমরা তার কারবার দেখে অবাক হচ্ছিলাম। সে তখন বলল, এসব কারামত দেখে যারা অবাক হয় তারা কখনো আরেফ হতে পারে না। যে অবাক হবে মনে করবে সে আল্লাহ থেকে বহু দূরে। যে কারামত দেখে ইবাদত করে সে মূলত আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ।[২]

কয়েকটি কারামত

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ছিলেন বহু কারামতের অধিকারী। শোনা যায়, একবার তিনি নদীর তীরে গেছেন। মাঝি কেবল ধনীদের নৌকায় উঠাচ্ছে, যারা পয়সা দিতে পারবে। যাদের কাছে পয়সা নেই তাদেরকে রেখে যাচ্ছে। তিনি গরীবদের লক্ষ্য করে বলেন, আব্দুল ওয়াহেদের পক্ষ থেকে নদীকে

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত ১৩১ও কারামাতে আওলিয়া ২১১।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৩২।

বলে দাও, তুমি শুকিয়ে যাও। গরীবরা তার পয়গাম নদীকে পৌছে দিল। ফলে নদীর পানি এতটা কমে গেল যে, ওরা নিশ্চিন্তে পার হয়ে গেল। তার জীবনে এ ধরনের বহু কারামত পাওয়া যায়।

একবার তার নিকট কিছু ফকির-মিসকিন বসা ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় তারা তার কাছে কিছুর আবেদন করল। কিন্তু তার কাছে তখন দেয়ার মত কিছুই ছিল না। তিনি দোয়া করলে দিনার বর্ষিত হলো। তা দিয়ে হালুয়া ক্রয় করে তিনি সবাইকে খাওয়ান, কিন্তু নিজে কিছুই খাননি।[১]

শেষ জীবনে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে যান। শোনা যায়, বিকলাঙ্গ হয়ে যান। অজু করার শক্তিটুকুও ছিল না। ঘটনাক্রমে একদিন নামাজের সময় কোনো খাদেম উপস্থিত ছিল না। তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। দোয়া করেন তো সুস্থ হয়ে যান। পরে অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে নামাজ পড়েন, কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে যান।[২]

এক নওমুসলিমের ঘটনা

একবার তিনি নৌকায় চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন। নৌকা বাতাসের তোড়ে এক অজানা দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। সেখানে ছিল এক মূর্তিপূজক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার পূজা করো? সে মূর্তি বের করে দেখাল। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলা, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা। সে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব কীভাবে বুঝা যায়? তিনি জবাব দিলেন, রসূল সা.-এর মাধ্যমে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, রসূল সা. কী বলেছেন? তিনি জবাবে বলেন, রসূল সা. মানুষকে তাবলীগ করেছেন, তালীম দিয়েছেন, পরে ইন্তিকাল করেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, তার সত্যতার প্রমাণ কি? তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের কালাম।

পরে তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। শুনে সে বলে ওঠে, সত্যি, এটা মহান সত্তার কালাম, যার নাফরমানি করা উচিত নয়। পরে সে খাঁটি দিলে মুসলমান হয়ে গেল। ফেরার পথে সে শায়েখের সঙ্গে দ্বীপ থেকে চলে এলো। এক জায়গায় পৌছে তিনি সাথীদের কাছ থেকে তার জন্য কিছু চাঁদা তুলেন। তাকে দেয়া হলে সে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলল, আমি যখন মূর্তিপূজক ছিলাম, আল্লাহকে চিনতাম না পর্যন্ত, তখনো

১. হিলইয়াতুল আওলিয়া খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৬৯, ও রেসালায়ে কুশাইরিয়া ৫৫৩।
২. রেসালায়ে কুশাইরিয়া ৫৬১।

www.maktabatulabrar.com

তিনি আমাকে ধ্বংস করেননি। আজ যখন তার ইবাদত করছি, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ধ্বংস করবেন না। সুতরাং আমার পয়সার প্রয়োজন নেই। রাতের বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল সে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ কি ঘুমান? তারা জবাব দিল, তিনি তো চিরঞ্জীব, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক; ঘুম তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না। তখন সে বলল, তোমরা কেমন গোলাম, মনিব জেগে থাকেন আর তোমরা ঘুমিয়ে থাকো? তার দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা দেখে সবাই অবাক হলো। সে সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকত। কিছুদিন পর তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। খাজা ইবনে যায়েদ স্বপ্নে দেখেন, সে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে বিচরণ করছে।[১]

জান্নাতের সঙ্গিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ বলেন, আমি তিনদিন পর্যন্ত দোয়া করি, হে আল্লাহ! জান্নাতে যে আমার সঙ্গিনী হবে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। তিনদিন পর আমাকে জানানো হলো, তোমার সঙ্গিনী হলো মাইমুনা সাওদা, একটা হাবশী মহিলা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? বলা হলো, সে কুফায় অমুক গোত্রে বসবাস করে। আমি তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কুফায় পৌছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, সে অমুক ময়দানে বকরি চরায়। আমি সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি সে একটা উড়না মুড়ে নামাজ পড়ছে। তার পাশেই বকরি ও ভেড়া চরছে। আমি পৌছতেই সে নামাজ সংক্ষিপ্ত করে সালাম ফেরাল। পরে বলতে লাগল, আব্দুল ওয়াহেদ! আজ নয়, আজ চলে যাও, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আগামীতে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ পাক তোমার ওপর রহম করুন, তুমি কীভাবে বুঝতে পেরেছ আমি আব্দুল ওয়াহেদ? সে জবাব দিল, তুমি কি জানো না রুহের জগতে আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম? সেখানে যাদের পরস্পরে পরিচয় হয়েছে দুনিয়াতেও পরিচয় হবে। (এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের মর্মার্থ)।

আমি আবেদন করলাম, আমাকে কোনো নসিহত করুন। সে বলতে লাগল, বড় অবাক হলাম, যে নিজে বক্তা সে অন্যের কাছে নসিহতের আবেদন করে! পরে বলল, আমি বুযুর্গদের কাছে শুনেছি যাকে আল্লাহ

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত ১৩৩।

পাক দুনিয়াবী নেয়ামত দান করেন, তারপরও সে দুনিয়ার সম্পদের তালাশ করে, আল্লাহ পাক তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তাকে দূরে সরিয়ে দেন। তার প্রতি সন্তুষ্টির পরিবর্তের হন অসন্তুষ্ট। পরে মহিলা পাঁচটি শের আবৃত্তি করল। সেগুলোর অর্থ হলো–

'হে ওয়ায়েজ! তুমি মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করে বেড়াও, মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে বলো, অথচ তুমি নিজেই গোনাহে লিপ্ত! তুমি যদি অন্যকে নসিহত করার পূর্বে নিজের এসলাহ করতে, নিজে গোনাহ থেকে তওবা করতে, তাহলে তোমার কথা অন্যদের মাঝে আসর করতো। তুমি নিজে গোনাহে লিপ্ত থেকে অন্যকে বিরত থাকতে বললে নিজের মাঝে আত্মবিশ্বাস পাবে না। আর নিজের মাঝে আত্মবিশ্বাস না থাকলে অন্যকে জোর গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবে না। পরে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বকরি দেখি নেকড়ের সঙ্গে চরছে, অথচ নেকড়ে আক্রমণ করছে না? জবাবে সে বলল, যাও, নিজের কাজ করো। আমি আমার মনিবের সঙ্গে চুক্তি করেছি, তিনি আমার বকরি ও নেকড়ের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিয়েছেন।[১]

ইন্তিকাল

তার মৃত্যু নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, ২৭ শে সফর ১৭০ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। কেউ বলেন, ১৭৭ বা ১৭৬ হিজরিতে। আবার কেউ ১৮৬ হিজরির কথাও বলেছেন। আজো বসরায় তার মাযার আছে। তার সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন, হযরত খাজা ফুযাইল ইবনে ইয়াজ, খাজা আবুল ফযল ইবনে রাযিন ও খাজা আবু ইয়াকুব সুসী। তাদের অন্যতম হলেন, খাজা ফুয়াইল ইবনে ইয়ায।

(৪) খাজা আবু আলী ফুয়াইল ইবনে ইয়ায তামিমী রহ.

যে সকল তাবে-তাবেয়ী যুহদ ও তাকওয়ায় ছিলেন অতুলনীয় তাদের মাঝে খাজা ফুয়াইল ইবনে ইয়ায অন্যতম। ইলম ও ফযলের দিক থেকে তিনি ছিলেন সমকালীন আলেমদের মাঝে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু মানুষের অন্তরে তার বড়ত্ব, মহত্ব ও সম্ভ্রম ছিল তার তাকওয়া-তাহারাত ও যুহদের কারণে। তিনি ছিলেন যুহদ ও আল্লাহ-নির্ভরতার জীবন্ত নমুনা।

১. কারামাতুল আওলিয়া ৭৯ ও হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭০।

www.maktabatulabrar.com

খোরাসানের তালেকান নামক এলাকায় বসবাস করতেন, পরবর্তীতে যা ফানদিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেই ফানদিনের নিকটে একটা বস্তির নাম আবাওরায়াও। সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক জীবন

প্রথম জীবনে তিনি ডাকাতদের সরদার ছিলেন। সব ডাকাত তার পাশে এসে সমবেত হতো। তবে গুরুত্বের সঙ্গে জামাতে নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন এবং নফল নামাজ পড়তেন। একবার ডাকাতির উদ্দেশ্যে কোথাও যাচ্ছেন, হঠাৎ কুরআনের একটি আয়াত কানে পড়ল–

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ 'মুমিনদের কি এখনো সময় হয়নি আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার।'[১]

আয়াতটি শুনতেই–আল্লাহ জানেন–মনে কী আছর পড়ল, জারজার হয়ে কাঁদতে থাকেন। চিৎকার করে বলতে থাকেন–হে আল্লাহ! সময় হয়ে গেছে। হে আল্লাহ! আমি ফিরে এসেছি।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এক মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে যায়। কিন্তু নফসের খাহেশ পূরণ করার মত কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না। একদিন সুযোগ বুঝে তার ঘরের দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন কোনো আল্লাহর বান্দা এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন–

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ.

পবিত্র কুরআনের এই হৃদয়-মথিত-করা আওয়াজ কানের মাধ্যমে তার অন্তরে পড়ে। ফলে ঈমানের নিষ্প্রভ আগুন জ্বলে ওঠে। নিজের অজান্তে তিনি বলে ওঠেন, হে আল্লাহ! সময় হয়ে গেছে, আমি গোনাহের সাগর থেকে উঠে তোমার রহমতের কোলে আশ্রয় নিচ্ছি।

তওবা ও বয়াত

সেখান থেকে তিনি তখনি ফিরে আসেন। রাত ছিল বিধায় একটা বিরাণ বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। পাশেই একটা কাফেলা তাঁবু ফেলেছে। তারা পরস্পর পরামর্শ করছে, কখন রওয়ানা হবে। কেউ বলছে, এখনি রওয়ানা হওয়া উচিত। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকেরা বলছে, সকাল হওয়ার পূর্বে রওয়ানা হওয়া আশঙ্কামুক্ত নয়। এই রাস্তায় ফুয়াইল কাফেলা লুণ্ঠন করে।

১. সুরা হাদিদ ১৬।

ফুয়াইল বলেন, আমি মনে মনে ভাবছি, আমি রাতভর গোনাহে লিপ্ত থাকি আর আল্লাহর বান্দারা আমাকে ভয় পায়, অথচ আল্লাহ পাক তো আমাকে এজন্য পাঠাননি। পরে তিনি খাঁটি দিলে তওবা করেন আর বলেন, হে আল্লাহ! আমি খাস দিলে তওবা করছি। আর আমার তওবা হলো, বাকি জীবন আমি তোমার ঘরের খেদমতে কাটাব।

পরে তিনি কুফায় চলে যান এবং ইমাম আজম আবু হানিফার খেদমতে কিছু দিন অবস্থান করেন। এরপর বসরায় যান খাজা হাসান বসরীর হাতে বয়াত হওয়ার জন্য। কিন্তু হযরত হাসান বসরী তখন ইন্তিকাল করেছেন। ফলে তিনি খাজা আব্দুল ওয়াহেদের হাতে বয়াত হন। তিনি মানুষকে পানি ভরে দেয়ার কাজ করতেন এবং তাতে নিজের ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

তিনি খাজা আব্দুল ওয়াহেদ ছাড়াও আবু ইয়ায ইবনে মনসুর ইবনে মা'মার সুলামী থেকেও খেলাফত লাভ করেছেন। তিনি খেলাফত লাভ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে হাবিব থেকে আর তিনি খেলাফত লাভ করেছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে। এভাবে সিলসিলা হযরত আবু বকর রা. পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে ইমাম আ'মাশ, শায়েখ মনসুর ও অন্যান্য ইমামের কাছে হাদিস পড়েন। পরে ওয়াদামত হারাম শরিফে বসবাস শুরু করেন এবং সমস্ত জীবন হারামের ছায়ায় কাটিয়ে দেন।[১]

খাজা আবু আলী বলেন, আমি ত্রিশ বছর তার খেদমত করেছি। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরে শুধু একদিন তাকে হাসতে দেখেছি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমি হযরত ফুয়াইলকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় সে লাঞ্ছিত হয়। আমি আবেদন করলাম, আমাকে কোনো নসিহত করুন! তিনি বলেন, ছোট হয়ে থাক, কখনো বড় হতে চেও না।

তওবা কবুলের আলামত

মূলত আল্লাহ পাক যদি কিছু করতে চান সেটার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে দেন। শুরু থেকে তার অভ্যাস ছিল, কারো মাল লুট করলে মালের পরিমাণ, ধরন ইত্যাদি লিখে রাখতেন। তওবা করার পর সেমতে তিনি সমস্ত মাল ফিরিয়ে দেন। তবে এক ইহুদী মাল গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সে বলে, আমার থলেভরা স্বর্ণ ছিল। তিনি কসম করে বলেন,

১. ইবনে খাল্লেকান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬১।

তাতে স্বর্ণ ছিল না। কিন্তু ইহুদী কোনোমতে স্বীকার করেনি। এমনকি কসম করে বলে, আমি স্বর্ণ ছাড়া থলে ফেরত নেবো না, আর তোমাকেও ক্ষমা করব না। সুতরাং থলেতে যা ছিল সেটা আমাকে ফেরত দাও। তিনি ঠিক সেই থলে ফেরত দিলেন। ইহুদী থলে খুলে সত্যিই তাতে স্বর্ণ দেখতে পেল। সে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, ফুযাইল! সত্যিই তোমার তওবা কবুল হয়েছে। কারণ থলেতে ছিল বালি। আমি তাওরাতে পেয়েছি, যার তওবা কবুল হয় তার হাতের বালিও স্বর্ণে পরিণত হয়। তখন সেই ইহুদী মুসলামান হয়ে গেল।[১]

ইলমী মাকাম

পূর্বতন জীবন তার ওপর এমনই প্রভাব ফেলে যে তিনি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে ত্যাগ করে নিভৃতে চলে যান। মুহাদ্দিসীনে কেরাম সাধারণত নিভৃতচারীদের ইলমের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেন না, তাদের রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন না। কিন্তু হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়ায ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার রেওয়ায়েত প্রায় সকল মুহাদ্দিস গ্রহণ করতেন। তিনি নিজেও তাদের থেকে রেওয়ায়েত করতেন। কারণ তার যুহুদপ্রিয়তা তাকে ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখেনি। তওবার সময় যদিও তার বয়স হয়ে গেছে যথেষ্ট, তবুও তিনি কুফায় পৌঁছে সেখানকার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে ইলমে হাদিস ও ফেকাহ অর্জন করেন।

ফেকাহ ও হাদিসে তার বিখ্যাত শায়েখগণ হলেন, ইমাম আ'মাশ, সুলাইমান তাইমী, মানসুর ইবনে মু'তামির, হুমাইদ আত-তাবীল, ইয়াহইয় ইবনে সাঈদ আল আনসারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আস সাদেক, ইসমাইল ইবনে খালেদ ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ। তিনি ইলমে ফেকাহ অর্জন করেন ফেকাহের সুবিখ্যাত ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মাদ ইবনে আবি লায়ালার কাছ থেকে।

তার থেকে যুহদ ও তাকওয়ার তালীম নিয়েছেন অসংখ্য লোক। সকলের নাম নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যুহদ ও তাকওয়ার সঙ্গে ইলম অর্জনকারীর সংখ্যাও কম নয়। হযরত সুফিয়ান সাওরী যদিও তার উস্তাদ ছিলেন, কিন্তু তিনিও তার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এমনিভাবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম শাফেয়ীও তার শাগরেদ। এ ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, ইবনে মাহদী

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস।

www.maktabatulabrar.com

ও আব্দুর রাজ্জাক হুমাইদী ইবনে ওয়াহাব, আসমায়ী, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া তাইমী প্রমুখ তার কাছ থেকে ইস্তিফাদা করেছেন।

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা

সকল মুহাদ্দিস তার ইলম ও ফযলের স্বীকৃতি দিতেন, তার রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন। তবে তিনি যথাসম্ভব হাদিস বর্ণনা করতে চাইতেন না। ইমাম নববী রহ. লেখেন, তিনি হাদিস বর্ণনা করতে ভয় পেতেন। হাদিস বর্ণনা করা তার কাছে গুরুভার বলে মনে হতো। বিশেষত মুহাদ্দিস নয়, এমন কারো কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করতে চাইতেন না। একবার কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি জাফর ইবনে ইয়াহইয়ার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন না কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, আমি হাদিসে নববীকে এরচেয়ে উর্ধ্বের মনে করি। তিনি বলতেন, কেউ আমার কাছে দিনার দিরহাম চাইলে দেয়া আমার জন্য সহজ, কিন্তু হাদিস বর্ণনা করা আমার কাছে সহজ নয়।[১]

মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃতি

তার ইলম ও ফযলের বিস্তারিত বিবরণ বইপত্রে পাওয়া যায় না। ইবনে জাওযী তার জীবনী নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেটা পাওয়া গেলে অবশ্য তার ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা পাওয়া যেতো। তবে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ তার ব্যাপারে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে অবশ্য তার ইলম ও ফযলের বিষয়ে কিছুটা আঁচ করা যায়।

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাকে সেকা তথা বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। কাজী শরিক বলেন, তিনি হুজ্জত। ইবনে নাসিরুদ্দীন তাকে امام الحرم شيخ الإسلام قدوة الأعلام নামে স্মরণ করেছেন। দারাকুতনী ও ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সেকা। ইমাম আবু হাতেম বলেছেন, সাদুক। ইবনে সাদ বলেছেন, সেকা, ফাযেল, মুত্তাকী ও কাসিরুল হাদিস। ইমাম নববী বলেছেন, তার সত্যায়নে সকল ইমাম একমত। তিনি ছিলেন সহিহুল হাদিস ও সদুকুল লিসান। তার রেওয়ায়েত সহিহ ও সঠিক হতো।[২]

তার ইলম ও ফযলের সত্যায়নের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। কতিপয়

১. তবকাতে কুবরা ১০০।
২. তাহযিবুত তাহযিব ও তাহযিবুল আসমা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২।

www.maktabatulabrar.com

মুহাদ্দিস অবশ্য তার রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতস্তত করতেন। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

যুহুদ ও তাকওয়া

তার জীবনের সবচে' বড় স্বীকৃতি হলো, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মত মুত্তাকী পরহেজগার আলেম, আবেদ যাহেদ বলেন, ফুয়াইল এই যমানার সবচে' বড় মুত্তাকী। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমার নিকট বর্তমান পৃথিবীতে তারচে' উত্তম কেউ নেই। তৎকালীন খলিফা বাদশা হারুনুর রশিদ বলতেন, আলেমদের মাঝে ইমাম মালেক হলেন সবচে' প্রতাপশালী আর ফুয়াইল ইবনে ইয়াযের চেয়ে মুত্তাকী আমি দেখিনি। বাদশা হারুনুর রশিদ যা বলেছেন, সেটা শোনা কথা নয়, বরং নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ কথা।

তিনি সর্বদা রোজা রাখতেন। একাধারে পাঁচ দিন রোজা রাখতেন। দৈনিক পাঁচশ রাকাত নফল পড়তেন। আনওয়ারুল আরেফীন গ্রন্থকার লেখেন, একবার অজু করার সময় ভুলে কোনো অঙ্গ তিনবারের পরিবর্তে দু'বার ধৌত করেন। ফলে রাতে স্বপ্নে দেখেন, রসূল সা. তাকে বলছেন, ফুযাইল! তুমি অজুতে আমার সুন্নত ছেড়ে দেবে, এটা আমি ভাবতেও পারিনি! তিনি ভয়ে জেগে ওঠেন এবং কাফফারাস্বরূপ এক বছর দৈনিক পাঁচশ রাকাত নফল ধার্য করেন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ফযল ইবনে রবী' বলেন, আমীরুল মুমিনীন বাদশা হারুনুর রশিদ একবার হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। আমি তার আগমনের সংবাদ শুনে দ্রুত বেরিয়ে এলাম এবং আরজ করলাম, আপনি ডেকে পাঠালেই হতো, আমি নিজেই এসে যেতাম। তিনি বলেন, আমার অন্তর কিছুটা অস্থির, এমন কারো কাছে নিয়ে চলো যার কাছে গেলে মনটা প্রশান্ত হবে। ফযল বলেন, এখানে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আছেন, আপনি তার কাছে চলুন। সেমতে আমরা তার দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আওয়াজ দিলে তিনি ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। একথা শুনে তিনি দ্রুত এসে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি ডেকে পাঠালে হতো, আমি নিজেই উপস্থিত হতাম।

বাদশা হারুন বলেন, আচ্ছা, যে উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা শুরু করুন। বাদশা তার সঙ্গে কতক্ষণ কথাবার্তা বলেন। পরে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি কোনো ঋণ আছে? ইবনে উয়াইনা হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে বাদশা সেটা আদায়ের নির্দেশ দেন। পরে সেখান থেকে চলে যান। বাইরে এসে বলেন, তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মন প্রশান্ত হয়নি। অন্য কোনো আলেমের কাছে নিয়ে চলো। ফযল তখন তাকে আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুমামের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানেও বাদশার আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়নি। পরে তারা হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়াযের কাছে গেলেন। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন এবং একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করছিলেন। সম্ভবত নামাজ শেষে তারা দরজায় আওয়াজ করেন। তিনি ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন, কে? ফযল বলেন, আমিরুল মুমিনীন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। এ কথা শুনে তিনি উদাসীনভাবে বললেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কী প্রয়োজন? ফযল জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি উচিত নয়, বাদশার আনুগত্য করা? পরে তিনি নিচে নেমে আসেন এবং দরজা খোলেন। আমরা তার পাশে বসে গেলাম। তিনি বাতি বন্ধ করে দিলেন এবং নিজে এক পাশে বসে গেলেন।

ঘটনাক্রমে বাদশার হাত হযরত ফুয়াইলের গায়ে লেগে গেল। তিনি অবাক হয়ে বলেন, কত নরম হাত! হায়, কেয়ামতের দিন এই হাত যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারত!

বাদশা তার কাছে কিছু নসিহতের আবেদন করেন। হযরত ফুয়াইল অত্যন্ত দরদভেজা কণ্ঠে বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খলিফা হয়ে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী ও রজা ইবনে হাইওয়াকে ডেকে পাঠালেন। পরে অত্যন্ত ব্যথাভরে বললেন, আমাকে এই বিপদে ফেলা হয়েছে, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তিনি খেলাফতের দায়িত্বকে পরীক্ষা মনে করতেন। এখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা সেটাকে মনে করছেন অমূল্য নেয়ামত।

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে বলেন, এই পৃথিবীতে রোজাদারের মত থাকা উচিত। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, যেসকল মুসলমান আপনার বড় তাদেরকে পিতার মত মনে করবেন; ছোটদেরকে মনে করবেন সন্তানের মত আর সমবয়সীদের মনে করবেন ভাইয়ের মত। সুতরাং পিতার সম্মান বজায় রাখুন, ভাইয়ের

www.maktabatulabrar.com

খাতির করুন, আর সন্তানকে স্নেহ করুন। হযরত রজা ইবনে হাইওয়া বলেন, আপনি যদি কেয়ামতের আযাব থেকে বাঁচতে চান তাহলে মুসলমানদের জন্য তাই পছন্দ করুন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন। তাদের জন্য তা-ই অপছন্দ করুন যা নিজের জন্য অপছন্দ করেন।

হযরত ফুয়াইল বাদশাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আপনার ওপর সেদিনের আশঙ্কা করছি যেদিন মানুষের পদস্খলন হবে। আল্লাহ পাক আপনার ওপর রহম করুন। আসলে আপনার পাশে এমন কেউ নেই যে আপনাকে ভালো পরামর্শ দেবে। এ কথা শুনে খলিফা হারুনুর রশিদ ডুকরে কেঁদে ওঠেন। তিনি অনেকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে যান। অবস্থা স্বাভাবিক হলে বলেন, আল্লাহ পাক আপনার ভালো করুন, আপনি আরো কিছু বলুন! হযরত ফুয়াইল একই ঢঙ্গে বলেন, আমিরুল মুমিনীন! আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের এক গভর্নর তাকে চিঠির মাধ্যমে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জানাল। জবাবে তিনি লেখেন, ভাই, আমি তোমাকে চিরদিন জাহান্নামীদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করছি। তুমি যেন এ অবস্থায় আল্লাহর কাছে না যাও যে, তোমার ক্ষমার আশা নেই। চিঠি পড়ে গভর্নর সমস্ত কাজকর্ম ফেলে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তিনি আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আপনার চিঠি পড়ে আমি পাকা সংকল্প করেছি, মৃত্যু পর্যন্ত কোনো দায়িত্ব নেব না। এ কথা শুনে বাদশা আবারো কেঁদে পড়েন। তিনি বেহুঁশের মত হয়ে যান। পরে সুস্থির হয়ে আরো নসিহতের আবেদন করেন। তখন হযরত ফুয়াইল বলেন, আমিরুল মুমিনীন! রসূল সা.-এর চাচা হযরত আব্বাস রা. একবার তার কাছে এসে আবেদন করেন, আমাকে কোনো এলাকার আমীর বানিয়ে দিন! জবাবে রসূল সা. বলেন, ইমারতের দায়িত্ব কেয়ামতের দিন দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। আপনি এর খাহেশ করবেন না। এ কথা শুনে বাদশা হারুনুর রশিদ আবারো কেঁদে ফেলেন। আরো কিছু উপদেশ দেয়ার আবেদন করলে হযরত ফুয়াইল বলেন, হে সুদর্শন চেহারাওয়ালা! কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দাদের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি এই চেহারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাইলে কখনো কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। কেননা রসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি

কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখে তার জন্য জান্নাতের খুশবু হারাম। একথা শুনে বাদশা আবারো কেঁদে পড়েন। শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার ওপর কারো ঋণ আছে? জবাবে ফুযাইল ইবনে ইয়ায বলেন, হ্যাঁ, আমার প্রভুর ঋণ আছে, যার হিসাব তিনি চাইবেন। তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহলে আমার ধ্বংস অনিবার্য। বাদশা বলেন, আমি মানুষের পাওনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। জবাবে তিনি বলেন, আমার প্রভু আমাকে এ নির্দেশ দেননি। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাকে রব হিসাবে মানার এবং তারই ইবাদত করার। পরে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

'আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার যোগাবে। আল্লাহ তাআলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার ও পরাক্রান্ত।'[১]

বাদশা তখন বলেন, এই একহাজার দিনার কবুল করুন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করুন। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো আপনাকে নাজাতের রাস্তা বাতলে দিচ্ছি আর আপনি এভাবে বিনিময় দেয়ার চেষ্টা করছেন। একথা বলে একদম খামুশ হয়ে যান। বাদশা সেখান থেকে বেরিয়ে ফযলকে বলেন, সামনে কখনো কারো কাছে নিয়ে গেলে ওনার কাছে নিয়ে আসবে। বাস্তবে তিনি সাইয়েদুল মুসলিমীন।[২]

আলোচ্য কথাবার্তায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝে আসে।

১. শাসনক্ষমতা কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য নয়, বরং আল্লাহ পাকের পরীক্ষা মনে করে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

২. শাসকদের উচিত আখেরাতের জবাবদেহির ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং নিজেদের জিম্মাদারির বিষয়ে সজাগ থাকা। অন্যথায় তারা আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

৩. তিনি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের দৃষ্টান্ত বেশি দিয়েছেন যিনি ছিলেন উমাইয়া খলিফা। যাদের ব্যাপারে আব্বাসী খলিফাগণ বদ-ধারণা করতেন এবং নিজেদেরকে তাদের থেকে ভালো মনে করতেন। হযরত ফুয়াইল এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের মোহ ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করেন।

১. সুরা যারিয়াত ৫৭-৫৯।
২. সফওয়াতুস সফওয়া।

www.maktabatulabrar.com

এতে তার সীমাহীন সাহস বুঝে আসে এবং শাসকদের প্রতি তার অসন্তুষ্টিও প্রতিয়মান হয়।

৪. রসূল সা. হযরত আব্বাস রা.কে ক্ষমতা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এটা কোনো উত্তরাধিকার সম্পত্তি নয়। যদি এমনটাই হতো তাহলে তিনি তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করতেন। কিন্তু এর ভিত্তি যেহেতু যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর তাই তিনি তাকে নিষেধ করেছেন।

হালাল উপায়ে রিজিক অর্জন

হালাল রিজিকের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একারণেই তিনি আমীর-উমারা, খলিফা বা জনগণের সাহায্য কবুল করতেন না। নিজের হাতে উপার্জন করে যা পেতেন তাতেই জীবন ধারণ করতেন। ইমাম শা'রানী বলেন, তিনি চাষবাসের কাজ করতেন এবং তাতে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

জিকির ও তিলাওয়াতে মগ্নতা

পূর্বে চলে গেছে কুরআনে কারিমের সঙ্গে ছিল তার গভীর সম্পর্ক। বাদশা হারুনুর রশিদ যখন তার কাছে যান তখন একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করতে শোনেন। তার খাস খাদেম ইবরাহিম ইবনে আশআস বলেন, শায়েখের দিলে আল্লাহর প্রতি এতটা ভক্তি-ভালোবাসা দেখেছি, অন্য কারো মাঝে তেমনটা দেখিনি। তার সামনে আল্লাহর নাম নেয়া হলে বা কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তার মাঝে ভয়-বিহবলতা দেখা দিতো। এমনভাবে কাঁদতেন যেই দেখত মনে দয়া এসে যেতো।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, একবার আমরা হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়াযের কাছে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি পেলাম না। কেউ বলল, তিনি কুরআনের আওয়াজ শুনলে বেরিয়ে আসবেন। আমাদের সঙ্গে একজন উঁচু আওয়াজের লোক ছিল। আমরা তাকে বললাম, আপনি কুরআন তেলাওয়াত করুন। তিনি উঁচু আওয়াজে সুরা তাকাসুর পড়া শুরু করলে হযরত ফুয়াইল তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসেন। তখন তার অবস্থা ছিল এমন দাড়ি অশ্রুতে ভেজা। তিনি অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও সুমিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে কুরআন পড়তেন। মনে হতো কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলছেন।

১. তাবাকাতে শা'রানী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮।
২. সফওয়াতুস সফওয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৫।

বন্ধুত্বের ব্যাপারে নির্দেশনা

তিনি বলেন, রহমানের বান্দা হলো যাদের মাঝে বিনয়-আনুগত্য ও নম্রতা-ভদ্রতা থাকে। আর দুনিয়ার বান্দা হলো, যাদের মাঝে গর্ভ-অহংকার থাকে এবং তারা জনগণকে নিকৃষ্ট মনে করে। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি নিষ্কলুষ বন্ধু তালাশ করে সে বন্ধুহীন থাকবে। এমন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না যে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তোমাকে অপবাদ দেয়। এমন কেউ তোমার বন্ধু হতে পারে না যে কিছু চেয়ে না পেলে রেগে যায়। আজকাল এমন ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা নেই, ভাই-বন্ধু কেউ মারা গেলে তার সন্তানাদিকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেবে, বালেগ হওয়া পর্যন্ত নিজের সন্তানের মত লালন পালন করবে।[১]

ইলম ও যুহুদের ব্যাপারে হেদায়েত

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তাকে এমনভাবে প্রশ্ন করা হবে যেমন নবী-রসূলদেরকে রেসালাতের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। কেননা কুরআন পড়ুয়াগণ নবীগণের ওয়ারিস। আখেরাতমুখী আলেমের ইলম গোপন থাকে আর দুনিয়ামুখী আলেমের ইলম প্রসারিত হয়। এটা তখনি যখন ইলমের চর্চা করে প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আখেরাতমুখী আলেমের সোহবত অবলম্বন করো আর দুনিয়ামুখী আলেমের সোহবত থেকে বেঁচে থাকো। কেননা সে তোমাকে ধোঁকাবাজি ও দুনিয়ার ভোগবিলাসের ফাঁদে ফেলে দেবে। আবার তার দাওয়াত হয় আমলহীন, আমলও হয় ইখলাসহীন।

একবার সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তার খেদমতে এলে তিনি বলেন, একসময় তোমরা আলেমগণ ছিলে শহরবাসীর চেরাগ, তোমাদের কাছে আলো পাওয়া যেত। এখন তোমরা হয়ে গেছো তাদের জন্য অন্ধকারের কারণ। তোমরা ছিলে আসমানের সেতারা, যার মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়া যেত। এখন তোমরা হয়ে গেছো তাদের পেরেশানির কারণ। তোমরা আসলে আল্লাহকে ভয় করো না। তোমরা ধনীদের কাছে যাও এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ করো। কিন্তু এটা ভেবে দেখো না, সেটা হালাল না হারাম। পরে আবার মিম্বরে বসে হাদিস বর্ণনা করো। হযরত সুফিয়ান এই নসিহত শুনতে থাকেন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে ইস্তিগফার পড়তে থাকেন।[২]

১. তবকাতে শা'রানী ১০০।
২. তবকাতে সুফিয়া ১০০।

www.maktabatulabrar.com

তিনি বলেন, হযরত লোকমান হাকিম ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। এসত্ত্বেও তিনি বনি ইসরাঈলের কাজী হয়েছেন। কারণ তিনি অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং সততা অবলম্বন করতেন। এরই ফলে তিনি এত বড় মর্যাদা লাভ করেছেন।

তিনি বলেন, উলামায়ে কেরাম যদি যুহুদ অবলম্বন করে তাহলে বড় বড় অহংকারী লোকদের গরদানও তাদের সামনে ঝুঁকে যাবে। কিন্তু তারা দুনিয়াদারদের কাছে কিছু পয়সার বিনিময়ে নিজেদের ইলম-কালাম বিক্রি করে দেয়। ফলে তারা মানুষের কাছেও অপদস্থ হয়ে যায়। তিনি বলেন, যারা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তারা অবশ্যই রিয়ায় আক্রান্ত হবে।[১]

তিনি বলেন, সেই আলেমের ওপর আমার আফসোস হয় দুনিয়া যাকে নিয়ে খেলে। আলেমগণ যদি দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হতো তাহলে মানুষকে নিজেদের রুমাল বানাতে পারত। পরে বলেন, অনেক ব্যথা পাই যখন শুনি অমুক আলেম বা অমুক বুযুর্গ কোনো ব্যবসায়ীর পয়সায় হজে করতে গেছেন।

তিনি আরো বলেন, ইলম হাসিলের নিয়্যত যদি ভালো থাকে এরচে' বড় কোনো আমল নেই, কিন্তু মানুষ আমলের নিয়্যতে ইলম শিখে না।

কতিপয় উপদেশ

হযরত ফুযাইল বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয় ব্যতীত শুধু মহব্বত ও মারেফত লাভ করবে সে মান-অভিমানে হালাক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মহব্বত ছাড়া কেবল ভয় পেতে থাকবে, সেও আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে। আল্লাহর প্রতি সৃষ্টি হবে তার ভীতিজনক দূরত্ব। আর যে ব্যক্তি মহব্বতের সঙ্গে ভয়ও করবে, আল্লাহ পাক তাকে গভীর নৈকট্য দান করবেন।

তিনি আরো বলেন, ঈমান তখন পরিপূর্ণ হয় যখন মানুষ সমস্ত করণীয় কাজগুলো করে এবং বর্জনীয় কাজগুলো থেকে বিরত থাকে। আবার তাকদীরের ওপর রাজি থাকে। সবিশেষ আমল কবুল না হওয়ার আশঙ্কায় থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

তিনি আরো বলেন, যদি তুমি এমন জায়গায় ইবাদত করার সুযোগ পাও যেখানে তোমাকে কেউ দেখে না আবার তুমিও কাউকে দেখো না,

১. তবকাতে কুবরা, শা'রানী ১০১।

এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি বলেন, আমি তার প্রতি শুকরগুজার যে আমার কাছে আসে না, এমনকি আমি অসুস্থ হলেও খোঁজ নেয়া না। তিনি বলেন, জান্নাতে কাঁদা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, দুনিয়াতে হাসা তারচে' বেশি আশ্চর্যের বিষয়।

তিনি বলেন, তিনটি বিষয় তলব করে কখনো পাবে না। প্রথমত ইলম অনুযায়ী আমলকারী আলেম। দ্বিতীয়ত আমল পরিমাণ এখলাসওয়ালা। তৃতীয়ত নির্দোষ কাউকে পাবে না। এ ধরনের লোক খুঁজে কোথাও পাবে না। তিনি বলেন, দুটি জিনিস দিলকে বরবাদ করে দেয়–বেশি ঘুম ও বেশি খাওয়া।

আরাফার রাতে লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আরাফাবাসীর ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? জবাবে তিনি বলেন, যদি ফুয়াইল তাদের মাঝে না থাকত তাহলে সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হতো। লোকেরা আবার জিজ্ঞাসা করল, মানুষ কখন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে? জবাবে বলেন, যখন দান করা ও বিরত থাকা তার কাছে সমান মনে হয়।

তিনি বলেন, আল্লাহ পাক যাকে মহব্বত করেন তাকে নানান রকম দুঃখকষ্ট ও দুশ্চিন্তা দিয়ে রাখেন। আর দুশমনকে হরেক রকম আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে রাখেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ভাইয়ের সঙ্গে বাহ্যত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে অথচ প্রকৃত পক্ষে সে তার শত্রু–এমন লোকের ওপর আল্লাহ পাক লানত করেন। তার অন্ধ হওয়া বা বধির হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একবার তিনি মসজিদে তাশরিফ আনেন। এক লোক সালাম করে তার পাশে বসে পড়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? আরজ করল, আপনার মনতুষ্টি ও মহব্বত লাভের আশায়। তিনি বলেন, কাজটা করেছ ভীতি-জাগানিয়া, মহব্বতের মত নয়। হয় তুমি চলে যাও, না হয় আমি চলে যাচ্ছি। বাধ্য হয়ে সে চলে গেল।

একবার আরাফার দিন জারজার হয়ে কাঁদছেন। সূর্য ডোবার সময় নিজের দাড়ি মুঠি করে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, যদি তুমি ক্ষমা করেও দাও, তবুও তোমাকে আমার ভীষণ লজ্জা হয়। এরপর চলে যান।

একবার বলেন, হে লোকেরা! আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে থাকো। কেননা এমনটা কম হয় আল্লাহ পাক

www.maktabatulabrar.com

কারো নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় ফেরত দেন। তিনি বলেন, যদি পুরো দুনিয়া আমার হয়ে যায়, আর আমার থেকে হিসাব নেয়া না হয়, তবুও আমি সেটা এমন ঘৃণা করব মৃত প্রাণীকে তোমরা যেমন ঘৃণা করো।

তিনি বলেন, যে চায় লোকেরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুক তাকে যাহেদ বলা হয় না। তিনি বলেন, তোমার দুশমনও যদি তোমার গিবত করে তুমি তাকে বন্ধুর চেয়ে উপকারী মনে করবে। কেননা সে তোমাকে নিজের নেকি দিয়ে দিচ্ছে।

ইন্তিকাল

তিনি ৩রা রবিউল আউয়াল ১৮৭ হিজরিতে হারাম শরিফে ইন্তিকাল করেন। পরে জান্নাতুল মুয়াল্লায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়। শোনা যায় তার মাযার উম্মুল মুমিনীন হযরত খদিজার পাশে। কেউ কেউ বলেন, তিনি মহররম মাসে ইন্তিকাল করেছেন। ঘটনা হলো কেউ সূরা اَلْقَارِعَةُ পড়ছিল। শুনে চিৎকার করে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়াযের মৃত্যুতে আসমান জমিন কেঁদেছে। পুরো পৃথিবী যেন নীরব হয়ে গেছে।

তার পাঁচজন খলিফা ছিলেন– সুলতান ইবরাহিম ইবনে আদহাম, শায়েখ মুহাম্মদ শিরাজী, খাজা বিশর হাফি, শায়েখ আবু রজা উতারিদী ও খাজা আব্দুল্লাহ। তন্মধ্যে সুলতান ইবরাহিম আদহাম ছিলেন অন্যতম।[১]

পরিবার পরিজন

তার পরিবার-পরিজনের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। কোনো কোনো ঘটনার মাধ্যমে শুধু এতটুকু জানা যায়, তিনি বিয়েশাদি করেছেন। একজন সন্তানও আছে, যার নাম আলী। স্বভাব-চরিত্রে পিতার মতই ছিলো। কিন্তু যৌবনে ইন্তিকাল করেছেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন, 'মৃত্যুর সময় সে ছিল যুবক, বিশিষ্ট আলেম ও আবেদ। তাকে সেসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় যাদের মৃত্যু হয়েছে আল্লাহর এশকে।' কিন্তু হযরত ফুয়াইলের ধৈর্য ছিল পাহাড়ের মত। যোগ্য যুবক ছেলে ইন্তিকাল করলেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। বরং বিষাদ-ক্লিষ্ট হেসে বলেছেন, আল্লাহ পাক যা চেয়েছেন আমি তাতে রাজি।[২]

---

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস।
২. ইবনে খাল্লেকান, খণ্ড ২, ২৬১।

অমিয় বাণী

উপরোক্ত আলোচনায় যুহুদ-তাকওয়ায় ভরপুর একটি জীবনচিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তার জীবনের পুরো চিত্র বোঝার জন্য তার অমিয় বাণীগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। যা তার প্রজ্ঞাপূর্ণ হৃদয় থেকে বেরিয়েছে।

১. আমি কখনো আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে ফেললে এর প্রভাব দেখি নিজের সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন, খাদেম ও গাধা-ঘোড়ার মাঝে। অর্থাৎ সবাই আমার নাফরমানি করতে শুরু করে।

২. যদি আমার কোনো দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয় তাহলে আমি শাসকদের জন্য দোয়া করব। কারণ শাসকরা ভালো হয়ে গেলে জনগণও ভালো হয়ে যাবে। দেশ ও জনগণের মাঝে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে।

৩. একবার বাদশা হারুনুর রশিদ জিজ্ঞাসা করেন, আপনার যুহুদের কী হালত? জবাবে তিনি বলেন, আপনি তো আমার চেয়ে বড় যাহেদ। কারণ আমি হলাম দুনিয়ার যাহেদ, যার মূল্য মাছির ডানার মতও নয়; আর আপনি হলেন আখেরাতের যাহেদ, যার বিপরীতে দুনিয়ার কোনো মূল্যই নেই। তাহলে আপনি হলেন অবিনশ্বর জিনিসের যাহেদ, আর আমি হলাম নশ্বর জিনিসের যাহেদ।[১]

৪. অন্যকে দেখানোর জন্য আমল করা শিরক। আবার কেউ দেখবে বলে আমল ছেড়ে দেয়া রিয়া। এখলাস হলো যাকে আল্লাহ উভয়টি থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।[২]

৫. যদি তোমরা রাতে উঠে নফল পড়তে না পারো, দিনের বেলায় রোজা রাখতে না পারো, তাহলে মনে করবে তোমরা মাহরূম। গোনাহ তোমাদের ঘিরে নিয়েছে।

৬. কেউ সাহেবে কামাল ও ফযল তখন হয় যখন সে নিজেকে সাহেবে কামাল মনে করে না।

৭. সব জিনিসের একটা আলামত থাকে। আলেমদের আলামত হলো গিবত ছেড়ে দেয়া। তিনি আরো বলেন, আলেমদের উচিত নয় নিজেদের প্রয়োজন আমীরদের সামনে পেশ করা। বরং তাদের শান হলো, মানুষ নিজেদের প্রয়োজন তাদের সামনে পেশ করবে।[৩]

১. অফায়াতুল আ'য়ান ২/২৬১।
২. প্রাগুক্ত।
৩. তবকাতে সুফিয়া ২৪।

www.maktabatulabrar.com

হালাল খাবার

যে ব্যক্তি নিজের খাবার-দাবারের বিষয়ে সর্তক থাকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাকে সিদ্দীক গণ্য করা হয়। তোমাদের উচিত খাবার কোত্থেকে আসছে, কীভাবে আসছে, খবর রাখা।

(৫) সুলতান ইবরাহিম ইবনে আদহাম ইবনে সুলাইমান রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তিনি ছিলেন প্রথম স্তরের বুযুর্গ। তার কুনিয়াত আবু ইসহাক। তার বংশ পরিক্রমা হলো–ইবরাহিম ইবনে আদহাম ইবনে সুলায়মান ইবনে মনসুর বলখী। তার বংশ পরিক্রমা পাঁচ সূত্রে হযরত ওমর রা. পর্যন্ত পৌঁছে। কেউ কেউ তাকে সাইয়েদ হোসাইনী বলেছেন। তিনি বলখ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বলখ আফগানিস্তানের একটি ঐতিহাসিক এলাকা।

বাদশাহী ছেড়ে ফকিরী

তিনি ছিলেন বলখের শাহজাদা। যৌবনে তওবা করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, আমার পিতা ছিলেন খোরাসানের বাদশা। আমি ছিলাম তখন যুবক। একবার শিকারে বের হলাম। আমার সঙ্গে ছিল একটা কুকুর। আমি কুকুরটি একটি খরগোশের পিছনে লেলিয়ে দিলাম। আমিও ছুটলাম সেটির পিছনে। হঠাৎ শুনতে পেলাম, হে ইবরাহিম! তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, না এ কাজের আদেশ করা হয়েছে! আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আবার ঘোড়া ছোটালে আবারো শুনতে পেলাম, তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, এ কাজের আদেশ করা হয়নি! এভাবে তিনবার শুনতে পেলাম। ফলে আমি ঘোড়া থেকে নেমে গেলাম। হঠাৎ দেখি আমাদের রাখাল বকরি চরাচ্ছে। তার গায়ে ছিল পশমি জামা। আমি জামাটি নিয়ে ঘোড়াটি তাকে দিয়ে দিলাম। পরে সেই অবস্থায় হয়ে গেলাম পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা।[১]

অন্য বর্ণনামতে, বলখের বাদশার পালক পুত্র হওয়ার সুবাদে রাজত্বের জন্য তিনিই নির্বাচিত ছিলেন। এমনকি একসময় বাদশাও হন। এর পরের ঘটনা প্রায় সবাই জানে। আল্লাহ পাকের তৌফিক ছিল বলে তেমন উপযোগ তৈরী হয়ে যায়। একবার তিনি দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ এক বুযুর্গ অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে দরবারে আগমন করেন। তার গাম্ভীর্যের কারণে কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায়নি–আপনি কে? কাছে গেলে

১. তবকাতে সুফিয়া ৩৭।

বাদশা নিজেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কে? জবাবে তিনি বলেন, আমি মুসাফির, সারাইখানা খুঁজছি। বাদশা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, এটা সরাইখানা নয়, শাহী মহল। মুসাফির জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পূর্বে এখানে কে ছিল? তিনি বলেন, অন্য বাদশা ছিল। মুসাফির আবারো জিজ্ঞাসা করেন, তার পূর্বে কে ছিল? এভাবে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর হয়। পরে মুসাফির বলেন, তাহলে তো এটা সরাইখানাই। এই আলোচনা হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে তিনি আল্লাহকে তালাশ শুরু করেন।

এমন আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায়। একবার তিনি শাহী বিছানায় আরাম করছিলেন। ছাদে কারো পায়ের আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করেন, কে? জবাব এলো, আমি মানুষ, উট তালাশ করছি। তিনি বলেন, তোমার চেয়ে বড় বেকুফ কে আছে, তুমি ছাদে তালাশ করছ উট? জবাব এলো, আমার চেয়ে বড় বেকুফ সে ব্যক্তি যে শাহী মহলে বসে আল্লাহকে তালাশ করে। এরপরই তার মাঝে আল্লাহ-প্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ শাহী মহল ছেড়ে জঙ্গলে চলে যান এবং এক পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান করেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসতেন এবং লাকড়ি কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করতেন। যে মূল্য পেতেন অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন আর বাকি অর্ধেক দিয়ে আট দিনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ইবাদত ও মুজাহাদায় মশগুল ছিলেন। পরে গায়েবী ইশারায় মক্কা শরিফে উপস্থিত হন এবং হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়াযের হাতে বয়াত হয়ে ফুয়ুয ও বারাকাত হাসিল করেন। হযরত জুনাইদ বলেন, যে ইলম আউলিয়াদের দেয়া হয় তার চাবি ছিল হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের হাতে।

তিনি মক্কা শরিফে সুফিয়ান সওরী, ফুয়াইল ইবনে ইয়ায, আবু ইউসুফ গাসুলীর সোহবতে থাকেন। তিনি খাজা ফুয়াইল ইবনে ইয়ায থেকে খেলাফত লাভ করেন। এছাড়া খাজা ইমরান ইবনে মুসা, খাজা ইমাম বাকের, শায়েখ মনসুর সুলামী ও খাজা ওয়াইস কারনী থেকেও খেলাফত লাভ করেন। তার অভ্যাস ছিল, একাধারে চার পাঁচ দিন রোজা রাখতেন এবং ঘাস ইত্যাদির মাধ্যমে ইফতার করতেন। অনেক কম ঘুমাতেন। অধিকাংশ সময় তালিযুক্ত কাপড় পরতেন।

www.maktabatulabrar.com

এরপর সিরিয়ায় গিয়ে হালাল মাল উপার্জন করতে থাকেন। এমনকি বাগানের মালীর কাজও করেন। তিনি ছিলেন স্বচ্ছহৃদয়, কাশফ ও কারামতওয়ালা বুযুর্গ। সিরিয়ায় ১৬১ বা ১৬২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেন, ১৬৬ হিজরিতে। এটাই প্রসিদ্ধ।

বাদশাহী ছেড়ে দিলে আমীর-উমারাগণ তার কাছে বার বার আবেদন করত, আপনি ফিরে আসুন; পুনরায় বাদশাহী করুন। কিন্তু তিনি কবুল করেননি।[১]

জলেস্থলে বাদশাহী

একবার তিনি সমুদ্রের কিনারে বসে নিজের জামা সেলাই করছিলেন। আমীর-উমারাগণ উপস্থিত হয়ে একই আবেদন করেন, আপনি ফিরে চলুন! তিনি নিজের সুই সমুদ্রে ফেলে দেন। পরে তাদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তো বড় বড় আমীর-উমারা, আমার সুইটি সমুদ্র থেকে এনে দাও দেখি! সকলে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তিনি মাছকে সম্বোধন করে বলেন, আমার সুই এনে দাও! হাজার হাজার মাছ স্বর্ণের সুই নিয়ে উপস্থিত হলো। এক মাছের মুখে ছিল তার সুইটি। তিনি সেটি গ্রহণ করে বলেন, দেখলে তো, আমার রাজত্ব এখন সমগ্র জগতে। তোমাদের সামান্য রাজত্ব আমার প্রয়োজন নেই।

একবার তিনি মক্কার মসজিদে হারামের পাশে অবস্থিত জাবালে আবি কুরাইসে তাশরিফ নিয়ে যান। নসিহত স্বরূপ বলেন, আল্লাহর অনেক বান্দা এমন আছেন যদি পাহাড়কে বলেন, চলো, পাহাড় চলতে শুরু করে। একথা বলতেই পাহাড় নড়াচড়া শুরু করল। তিনি বলেন, থাম, আমি তোমাকে নড়তে বলিনি, আমি তো ঘটনা বলছি মাত্র। তখন পাহাড় থেমে গেল।[২]

আল্লাহর ভয় ও তাওয়াক্কুল

একবার এক সাহেবে কারামত বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করেন, উপার্জনের কী ব্যবস্থা করেছেন? তিনি জবাবে বলেন, পেলে খাই, না পেলে সবর করি। তিনি বলেন, আমাদের শহরের কুকুরের অবস্থাও তেমনি–পেলে খায়, না পেলে খায় না। আসলে হওয়া উচিত এমন–পেলে ইসার (নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য প্রদান) করবে, না পেলে সবর করবে।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৩।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৫।

একবার কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কার বান্দা? এটা শুনে তিনি ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং বেহুঁশ হয়ে যান। হুঁশ ফিরে পেয়ে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন–

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

'আসমান ও জমিনে যারাই আছে সবাই অনুগত হয়ে রহমানের কাছে আসবে।'[১]

সে জিজ্ঞাসা করল, প্রথমবার জবাব দেননি কেন? তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দা বলতে ভয় হচ্ছিল। কারণ বন্দেগির হক তো আদায় করতে পারছি না। তাহলে কোন্ মুখে বলবো, আল্লাহর বান্দা। আর না বললেও কুফরির আশঙ্কা।[২]

নয় বছর সাধনা

বছরের পর বছর তিনি বন-জঙ্গলে ছিলেন। নয় বছর নিশাপুরের গুহায় মুজাহাদা করেছেন। সর্বদা নিজের হাতে উপার্জন করে খেতেন। কখনো লাকড়ি বিক্রি করতেন, কখনো বাগানে মালির কাজ করতেন। একবার বাগানে পাহারাদারি করছিলেন। হঠাৎ এক সিপাহী এসে ফল চাইল। তিনি দিতে অস্বীকার করলে সিপাহী তাকে কোড়া মারল। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, যে মাথা আল্লাহর নাফরমানি করে সেটা মার খাওয়ারই উপযুক্ত। একথা শুনে সিপাহী ঘাবড়ে গেল এবং ওজরখাহী শুরু করল। তিনি তখন বলেন, যে মাথার কাছে ওজরখাহী করা হতো সেটা আমি বলখে রেখে এসেছি।

একবার তওয়াফের সময় কাউকে নসিহত করে বলেন, তুমি সালেহীনের স্তরে উপনীত হতে পারবে না যতক্ষণ না ছয়টি ঘাঁটি অতিক্রম করবে। প্রথমত নেয়ামতের দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ না দারিদ্রের দরজা খোলবে। দ্বিতীয়ত সম্মানের দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ না অসম্মানের দরজা খুলবে। তেমনিভাবে আরামের দরজা, ঘুমের দরজা, ধন-সম্পদের দরজা ইত্যাদি।[৩]

কতিপয় কারামত

একবার কিছু লোক এসে অভিযোগ করল, একটা বাঘ আমাদের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। তিনি সেখানে গিয়ে বলেন, হে আবুল হারেস! আল্লাহর

১. সুরা মারয়াম ৯৩।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৫।
৩. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৬।

www.maktabatulabrar.com

পক্ষ থেকে যদি তোর কাছে কোনো নির্দেশ থাকে তাহলে তুই সেটা কর, অন্যথায় চলে যা! বাঘ তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

একবার তিনি এক মসজিদে যান। এশার পর ইমাম সাহেব এসে বলেন, আপনি বাইরে যান, আমি দরজা বন্ধ করব। তিনি অনুনয় করে বলেন, বাইরে অত্যন্ত শীত, যদি অনুমতি দেন আমি এখানে শুয়ে থাকি! তিনি বলেন, এখানে শোয়ার অনুমতি নেই, কারণ মুসাফির অনেক সময় জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। তিনি পীড়াপীড়ি করলে ইমাম সাহেব বলেন, ইবরাহিম ইবনে আদহাম এলেও অনুমতি নেই। তিনি বলেন, আমিই ইবরাহিম ইবনে আদহাম। ইমাম সাহেব তাকে মিথ্যাবাদী মনে করলেন। এমনকি ক্ষিপ্ত হয়ে পায়ে ধরে টেনে-হেঁচড়ে মসজিদ থেকে বের করে দেন। তিনি সেখান থেকে উঠে একটা গোসলখানার কাছে যান। সেখানে এক লোক বাতি জ্বালাচ্ছে। তিনি সালাম দিলে সে জবাব দিল না, বরং নিজের কাজে মশগুল রইল। তবে ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকাল। কাজ থেকে অবসর হয়ে সে সালামের জবাব দিল। দেরীতে জবাব দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমি এক লোকের গোলাম। আমার আশঙ্কা হলো, জবাব দিলে কাজে দেরী হয়ে যাবে। তাতে আমানতের খেয়ানত হবে। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এদিক ওদিক কী দেখছিলে? সে বলল, আমি আতঙ্কে ছিলাম মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যায় কি না! এ ধরনের আরো কথাবার্তা হলো। কথায় কথায় বলল, আমি বিশ বছর যাবত দোয়া করছি, হে আল্লাহ! মৃত্যুর পূর্বে ইবরাহিম ইবনে আদহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও! সে আকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, আমিই ইবরাহিম ইবনে আদহাম! আল্লাহ পাক পায়ে হেঁচড়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমার তামান্না পূরণ করেছেন! সে তার সঙ্গে মোয়ানাকা করল। পরে বলল, হে আল্লাহ! আমার তামান্না পূরণ হয়েছে, আমার আর কোনো তামান্না বাকি নেই। সুতরাং এখনই আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন। আল্লাহ পাক তার এই দোয়াও কবুল করেন। তৎক্ষণাৎ সে ইন্তিকাল করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন![১]

এক যুবকের আক্ষেপ

উসমান উমারা বলেন, আমি হাজর নামক এলাকায় ছিলাম। ইবরাহিম ইবনে আদহাম, মুহাম্মাদ ইবনে ছাওবান ও উব্বাদ মিনকারীর সঙ্গে আলাপ

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত ও কারামাতুল আওলিয়া ২২২।

করছিলাম। এক যুবক বসা ছিল দূরে। হঠাৎ সে ভক্তিভরে আমাদের বলল, হে ভাইয়েরা! আমি একজন যুবক। আমি রাতদিন সাধনা করছি; আমার রাতে ঘুম নেই, দিনে খাবার নেই, জীবন আমার কাটছে বড় কষ্টে! এক বছর হজ করি, আরেক বছর জিহাদ করি, কিন্তু কী যে হলো, আমি সেই স্তরে পৌছতে পারছি না? আমার অন্তরে কিছু উপলব্ধি হচ্ছে না? আচ্ছা, তোমরা এ ব্যাপারে কী বলো? আমরা কেউ তার কথার জবাব দেইনি, বরং নিজেদের আলাপে মশগুল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের একজন বলে উঠল, তার ব্যর্থতা দেখে আমার অন্তর পুড়ছে। পরে বলেন, হে যুবক! এরা যে সাধনা করছে, এরা আল্লাহর সত্যিকার তালেব। এরা ইবাদত ও খেদমত বেশি করে না, তবে দেখার চেষ্টা করে খুব। শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ আনসারী বলেন, এর অর্থ এই নয় যে, ইবাদত ও খেদমত করা যাবে না। উদ্দেশ্য হলো, অন্য জিনিসের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত নয়। ইবাদত ও খেদমত ব্যতীত কেউ সূফী হতে পারে না, তবে তাসাওউফ খেদমত নয়। সূফীরা ইবাদত ছাড়ে না, বরং সবার চেয়ে বেশি করে। কিন্তু যাই করে সেটা বড় করে দেখে না। অর্থাৎ সেটার বিনিময় চায় না। তাদের বাতেনী পুঁজি ভিন্ন কিছু। বাহ্যিকভাবে এশতেবাহী হালতে জীবন যাপন করেন, কিন্তু বাতেনে অন্য জগতে বসবাস করেন।

ইবরাহিম আদহাম, আলী বাক্কার, হুযাইফা মারআশী ও সাল্লাম খাওয়াস পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। সবাই মিলে একবার অঙ্গীকার করেন, কোনো জিনিস নিশ্চিত হালাল না জানা পর্যন্ত খাবেন না। তবে একদম খালেস হালাল না পেলে অল্প পরিমাণ খেতেন যেন প্রাণটা বাঁচে।[১]

দোয়া কেন কবুল হয় না?

একবার লোকেরা হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, কিন্তু কবুল হয় না কেন? জবাবে তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহকে জান, কিন্তু তার বন্দেগি করো না। তার রসূল সা. ও কুরআনকে চেন, কিন্তু আনুগত্য করো না। তার নেয়ামত খাও, কিন্তু শুকরিয়া আদায় করো না। তার জান্নাত পাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো না। শয়তানকে শত্রু জেনেও তার সঙ্গে শত্রুতা করো না। জান মৃত্যু আসবে, তবুও মৃত্যুর ফিকির করো না। মা-বাবাকে কবরে দাফন করেও উপদেশ গ্রহণ করো না।

১. নফহাতুল উনস ৬১।

www.maktabatulabrar.com

নিজের দোষ জেনেও অন্যের দোষ তালাশ করো। সুতরাং এমতাবস্থায় দোয়া কীভাবে কবুল হতে পারে?[১]

তিনি বলেন, মানুষ পৃথিবীতে সুখ-শান্তি খোঁজে, কিন্তু পায় না। তারা যদি জানত আমরা যে রাজত্ব করছি, সুখ ভোগ করছি সে সম্পর্কে, তাহলে তলোয়ার হাতে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত।

একবার এক লোক তার কাছে দশ হাজার দেরহাম পাঠাল। তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, তুমি কি চাও আমি এগুলো নিয়ে আমার নাম গরীবদের তালিকা থেকে মুছে ফেলি। এমনটা কখনো হবে না।

একবার এক মদ্যপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে রাস্তায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। তার মুখ থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। তিনি তার মুখ ধুয়ে দিয়ে বলেন, এই জবান আল্লাহ পাকের জিকির করে, অথচ আজ তার কত দুর্গতি! হুঁশ ফিরে এলে লোকেরা তাকে সে ঘটনা বলল। ফলে সে সীমাহীন লজ্জিত হলো এবং তওবা করে মদ্যপান ছেড়ে দিল। এ ঘটনার পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ বলছে, তুমি আমার জন্য তার মুখ পরিষ্কার করে দিয়েছ, আমিও তোমার উসিলায় তার দিল পরিষ্কার করে দিলাম।[২]

বন্ধুত্বের দাবী

একবার এক লোক তার কাছে কিছুদিন ছিল। বিদায়ের সময় আরজ করল, আমার মাঝে কোনো দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বলে দিন! তিনি বলেন, আমি তোমার মাঝে কোনো দোষ দেখতে পাইনি। কেননা আমি তোমাকে সর্বদা মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখেছি। সুতরাং অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো। একথা বলে তিনি একটা কবিতার দিকে ইশারা করেছেন। কবিতার অর্থ হলো– মহব্বতের দৃষ্টি হয় সব দোষের ক্ষেত্রে অন্ধ। যেমন বিদ্বেষের চোখ সব দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করে দেয়।[৩]

কতিপয় নসিহত

এক ব্যক্তি আবেদন করল, আপনি আসুন, আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু নসিহত শুনব। তিনি বলেন, আমি এখন চারটি কাজে ব্যস্ত আছি, অবসর হয়ে পারলে আসব।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৭।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৮।
৩. তবকাতে কুবরা, শা'রানী ১০১।

প্রথমত : সৃষ্টির আদিতে যখন অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তখন আল্লাহ পাক এক দল সম্পর্কে বলেছেন, ওরা জান্নাতী। আর আরেক দল সম্পর্কে বলেছেন, ওরা জাহান্নামী। আমি সবসময় চিন্তিত থাকি–না জানি আমার নাম কোন্ দলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে!

দ্বিতীয়ত : শিশু যখন মায়ের পেটে বড় হতে থাকে তখন একজন ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করে, তাকে সৌভাগ্যবান লিখব না দুর্ভাগা লিখব? আমি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকি, কারণ আমার নাম কোন্ দলে লেখা হয়েছে জানা নেই।

তৃতীয়ত : ফেরেশতা যখন মানুষের রুহ কবজ করে তখন জিজ্ঞাসা করে, রুহটি মুসলমানের রুহের মাঝে রাখব না কাফেরদের রুহের মাঝে? জানি না আমার ব্যাপারে ফেরেশতা কী জবাব পাবেন!

চতুর্থত : কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক নির্দেশ দিবেন,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

'আজ হে পাপীরা! তোমরা পৃথক হয়ে যাও!' আমি সর্বদা পেরেশান থাকি। কারণ জানি না আমি কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত হব?

তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন মিজানে সবচে' ভারী হবে সেই আমল যা করতে বেশি কষ্ট হয়।

একজন আলেম নসিহতের আবেদন করলে তিনি বলেন, লেজ বনে থাকবে, মাথা বনে নয়। কেননা মাথা কেটে ফেলা হয়, আর লেজ ছেড়ে দেয়া হয়।[১]

এক লোক আরজ করল, রাতে আমার তাহাজ্জুদের জন্য ওঠার তৌফিক হয় না। জবাবে তিনি বলেন, দিনের বেলা আল্লাহ পাকের নাফরমানি করবে না। কেননা রাতের বেলায় আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়ানো বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কোনো নাফরমান এ সৌভাগ্য পেতে পারে না। সূফীদের প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, গোনাহের কারণে মানুষ তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

এক লোক তার খেদমতে থাকার আবেদন করলে তিনি বলেন, তুমি নিজের মালের ব্যাপারে আমার চেয়ে নিজেকে বেশি হকদার মনে করতে পারবে না। সে বলল, এতটা ত্যাগের হিম্মত আমার নেই, বলে চলে গেল।[২]

---

১. তবকাতে কুবরা, শা'রানী ১০২।

২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৪৮।

www.maktabatulabrar.com

ইন্তিকাল

তার ইন্তিকাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর তাহকীক অনুযায়ী তিনি ১৬২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। হাফেজ সমআনী বলেন, তিনি ১৬১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। ঐতিহাসিক ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের কথা নির্ভরযোগ্য। সুতরাং সে হিসাবে তার ইন্তিকাল নিজের শায়েখ হযরত ফুয়াইল ইবনে ইয়ায থেকে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পূর্বে হয়েছে। তিনি ১০২ বছর বেঁচে ছিলেন। শোনা যায়, তার ইন্তিকালের পর الأن إمام الأرض قد مات আওয়াজ গায়েব থেকে শোনা যায়। কোনো কোনো কিতাবে أمان الأرض قد مات বাক্যটি পাওয়া যায়। তার মাজার কেউ বলে সিরিয়ায়, কেউ বলে মদিনায়। তার দু'জন খলিফা ছিলেন। একজন হলেন খাজা শাকিকে বলখী, অন্যজন হলেন খাজা হুজাইফা মারআশী।

(৬) কুতুবুল আলম সাদীদুদ্দীন খাজা হুজাইফা মারআশী রহ.

কুতুবুল আলম খাজা হুজাইফা মারআশী ছিলেন আউলিয়ায়ে কেরামের শিরোমণি। ছিলেন মুত্তাকী পরহেযগার ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ। খাজা ইবরাহিম ইবনে আদহামের প্রধান খলিফা। তৎকালীন সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীন তার ফয়েয ও বরকত লাভের জন্য তার মজলিসে আসতেন।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত মারআশ (বর্তমান নাম 'কাহ্রামান মারআশ') নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খাজা ফুযাইল ইবনে ইয়ায ও খাজা বায়েযীদ বোস্তামীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তার নীতি ছিল জাহের ও বাতেনে একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি একনিষ্ঠ থাকা এবং নিবাসে প্রবাসে জিকরে জলী করা। তিনি কারো কাছে না চেয়ে যা পেতেন তাতেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

সাত বছর বয়সে কুরআনের সপ্ত কেরাতের হাফেজ হয়ে যান। প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করতেন। ষোল বছর বয়সে সমস্ত জাহেরী উলুম সমাপ্ত করে ফেলেন। পরে হযরত খিজিরের পরামর্শে সুলতান ইবরাহিম ইবনে আদহামের কাছে যান এবং ছয় মাসে সুলুকের পথ অতিক্রম করেন। একদিন খাজা ইবরাহিম তাকে আলিঙ্গন করে বলেন,

হুজাইফা! তুমি নিশ্চিন্তে থাক, অদূর ভবিষ্যতে তুমি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে উপনীত হবে এবং তোমার উঁচু মর্যাদা লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ!

দীর্ঘ ছয় মাস তিনি খাজা ইবরাহিম ইবনে আদহামের খেদমতে ছিলেন। নির্জনে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাজা ইবরাহিম তার কঠোর রিয়াযত দেখে বলতেন, তরীকতের পথে চলার জন্য যা প্রয়োজন তা তোমার মধ্যে রয়েছে। ফলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি শায়েখের তাওয়াজ্জুহের বরকতে কামালাতের স্তরে উপনীত হন।

হালাত ও গুণাবলী

ইলমে সুলুকে তিনি কয়েকটি কিতাব লিখেছেন। তিনি সাধারণত ছয় দিন অন্তর অন্তর ইফতার করতেন। তিনি বলতেন, আহলে দিলের খাবার হলো–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও রোনাজারির প্রবণতা ছিল তার মাঝে প্রবল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি এতো কাঁদেন কেন? আল্লাহ পাক যে রহিম করিম আপনি বিশ্বাস করেন না? জবাবে তিনি বলেন, فريق في الجنة وفريق في السعير আয়াতটি আমাকে কাঁদায়, জানি না আমি কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত! সে আবারো জিজ্ঞাসা করল, এমন যখন অবস্থা তখন আপনি অন্যদের বয়াত করেন নেন? একথা শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং বেহুঁশ হয়ে যান। পরে হুঁশ ফিরে এলে গায়েব থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পান, যা উপস্থিত সবাই শুনতে পায়। শোনা যায়, সেই আওয়াজের কারণে তিনশ কাফের তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। গায়েব থেকে বুযুর্গির সুসংবাদ আসে এবং রওজায়ে আতহার থেকে জান্নাতের সুসংবাদ আসে।[১]

কতিপয় বাণী

একবার তিনি বলেন, কেউ যদি আমার ব্যাপারে কসম করে বলে, তোমার আমল সেই ব্যক্তির মত নয় যার কেয়ামতের ওপর বিশ্বাস আছে। আমি কসমকারীকে বলব, তুমি ঠিকই বলেছ, তোমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না।[২]

তিনি বলেন, আমার নিকট সবচে' উত্তম নেকী হলো ঘরে বসে থাকা। যদি ফরজ নামাজের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন না হতো আমি সর্বদা ঘরে বসে থাকতাম।[৩]

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৫১।
২. তবকাতে কুবরা, শা'রানী ৯০।
৩. তবকাতে কুবরা, শা'রানী ৯০।

www.maktabatulabrar.com

তার কয়েকজন খলিফা ছিলেন। প্রসিদ্ধ হলেন, খাজা আবু হুবায়রা বসরী, ইমাম শাফেয়ীকেও তার খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

ইন্তিকাল

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ২০২ হিজরির ১৪ বা ২৪শে শাউয়াল ইন্তিকাল করেছেন। এ ছাড়াও তার ইন্তিকাল নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। আল্লামা শা'রানী বলেন, তিনি ২০৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন।

(৭) অলিকুল শিরোমণি খাজা আবু হুবায়রা বসরী রহ.

হযরত খাজা আবু হুবায়রা বসরী ছিলেন তরিকতের ইমাম এবং উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ। হযরত খাজা হুযাইফা মারআশীর প্রধান খলিফা।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

অনেকে তার নাম শুধু হুবায়রা লিখেছেন। কেউ লিখেছেন, আবু হুবায়রা। উপাধী আমীনুদ্দীন। ১৬৭ হিজরিতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে হাফেজ ও আলেম হন। এমনকি সমস্ত জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ হয়ে যান। অতঃপর ইবাদত-মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কঠোর রিয়াযত ও দুঃসাধ্য মুজাহাদা করেন। শুরু থেকেই ছিলেন মুজাহাদায় অভ্যস্থ। দৈনিক দু'বার কুরআন খতম করতেন।

খাজা হুজাইফার দরবারে

ত্রিশ বছর মুজাহাদা করেও ব্যর্থ হয়েছেন মনে করে কাঁদতেন। তখন ক্ষমার সুসংবাদ এলো। সঙ্গে এ আওয়াজও এলো, ফকিরি শেখার জন্য খাজা হুজাইফার কাছে যাও! তিনি সেখানে উপস্থিত হন। যেহেতু ত্রিশ বছর মুজাহাদা করেছেন, তাই সপ্তাহখানিকের মধ্যে কামাল হাসিল করে ফেলেন। পরে এক বছরের মধ্যে খেলাফত-লাভে ধন্য হন। খেলাফত প্রদানের সময় খাজা হুজাইফা মারআশী বলেন, হে হুবায়রা! তুমি সর্বদা তরীকতের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গদের অনুসরণ করবে, তাহলে শীঘ্রই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছতে পারবে। খাজা আবু হুবায়রা বলেন, আমি যখন পীর সাহেব-প্রদত্ত খেরকা পরিধান করলাম তখন নবী কারিম সা. সহ বহু আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের রুহ উপস্থিত ছিলো। তারা প্রত্যেকে আমার জন্য দোয়া করেছেন।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৫৩।

দেরহাম দেখে বেহুঁশ হয়ে যান

একবার এক লোক তার সামনে এক হাজার দেরহাম পেশ করল। দেরহাম দেখে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। লোকে চোখে মুখে পানি দিতেই হুঁশ ফিরে এলো। কিন্তু তার চেহারায় ছিল ভয়ের ছাপ আর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, দেরহাম দেখে আপনার এমন অবস্থা হলো কেন? জবাবে তিনি বলেন, আফসোস! যে লোক মাহবুবে হাকিকীর সাক্ষাৎপ্রার্থী সে অবাঞ্ছিত জিনিস দেখে ভয় পাবে না? বাধা সৃষ্টিকারী জিনিস দেখে ভীত হবে না, যদি মাহবুবে হাকিকীর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হতে হয়!

হালাত ও মুজাহাদা

তিনি একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করতেন। এমনকি এক কামরায় জীবন কাটিয়ে দেন। তিনি এতো কাঁদতেন যে, লোকেরা ক্ষতির আশঙ্কা করত। দুনিয়ার সুস্বাদু খাবার বর্জন করতেন। সর্বদা রোজা রাখতেন, নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন, কারো দান গ্রহণ করতেন না। প্রথম দিকে কিতাব অনুলিপি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রায় রাত কাটিয়ে দিতেন ইবাদত-বন্দেগিতে। সর্বদা অজুর সঙ্গে থাকতেন। যাকে মনে ধরত এক তাওয়াজ্জুহ দিয়ে তার অন্তরে ইলম ইলকা (প্রবেশ) করে দিতেন। তার বহু কারামত ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেয়েছে।

মুরিদগণের তালীম-তরবিয়তে তার পদ্ধতি ছিল অসাধারণ। তিনি সকলের নিকট প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন। উদার হস্তে মেহমানদারি করতেন। তার মুরিদদের বলা হতো হুবাইরিয়ান। তাদের অভ্যাস ছিল সবসময় অজুর সঙ্গে থাকা এবং একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়া। তার মজলিসে আল্লাহ পাকের জিকির ছাড়া অন্য কোনো আলোচনা হতো না।

এসলাহে বাতেনের বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। একাধারে কয়েক দিন রোজা রেখে শাক-শজি ও ফলমুল দ্বারা ইফতার করতেন। সর্বদা নফসের হিসাব নিতেন এবং মুরাকাবায় মশগুল থাকতেন। সামাজিক মেলামেশা থেকে বিরত থাকতেন ।

ইন্তিকাল

তিনি ২৮৭ হিজরির ৭ই শাউয়াল ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেন, ২৭৯ হিজরিতে। বসরাতে এখনো তার মাজার আছে। তিনি ১২০ বছর হায়াত পেয়েছেন। তার থেকে কতজন খেলাফত পেয়েছে জানা যায় না। যাদের

www.maktabatulabrar.com

ব্যাপারে জানা যায় তাদের মধ্যে খাজা মামশাদ দীনাওয়ারী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৮) কুতুবুয যমান খাজা উলু মামশাদ দীনাওয়ারী রহ.

তিনি ছিলেন তৃতীয় স্তরের বুযুর্গ; যুগের গাউস কুতুব ও তরীকতের সর্বজন-বরেণ্য ইমাম। ইলম-কালামে ছিলেন অদ্বিতীয় এবং যাবতীয় গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রে ছিলেন অতুলনীয়। চিশতিয়া সিলসিলার ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন। ইবাদত রিয়াযত ও খেদমতে খলকে ছিলেন একনিষ্ঠ।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তিনি দীনাওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। দীনাওয়ার ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ কেরমানশাহ-এর অন্তর্গত একটি জেলা, কেরমানশাহ-এর কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। দীনাওয়ারে জন্ম হলেও তিনি অবশ্য ইরাকের বাগদাদে প্রতিপালিত হন। তার আসল নাম উলু, উপাধী করিমুদ্দীন মুনয়িম, মামশাদ উলু দীনাওয়ারী নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি খাজা ইয়াহইয়া জাল্লা ও আযদরী শায়েখদের সোহবতে ছিলেন। ছিলেন খাজা জুনাইদ বাগদাদী, খাজা রুয়াইম দীনাওয়ারী ও খাজা আবুল হাসান বাগদাদীর সমসাময়িক। হযরত খাজা সিররী সাক্বতী ও আরো কতিপয় বযুর্গের সোহবতও লাভ করেছেন।

প্রাথমিক জীবন

প্রথম জীবনে খুবই ধনী ছিলেন। কিন্তু মহব্বতে এলাহীতে সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। এমনকি রোজা রাখা ও ইফতার করার জন্যও কিছু রাখেননি। পবিত্র মক্কায় গিয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও জিকির-শুগলে মশগুল হয়ে যান। কারো হাতে বয়াত হওয়ার পূর্বে বিশ বছর মুজাহাদা করেন।

মুজাহাদা ও খেলাফতলাভ

অতঃপর খাজা হুবাইরাতুল বসরীর খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাকে বয়াত করে নির্জন প্রকোষ্ঠে তালীম দেন। দীর্ঘদিন তালীম দেয়ার পর একদিন বলেন, তোমার তালীম পূর্ণ হয়েছে, অজু করে আমার কাছে এসো। তিনি অজু করে এলে খাজা হুবাইরাতুল বসরী তার হাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ! উলুকে কামালাতের উঁচু স্তরে পৌঁছে দিন! এ কথা শোনা মাত্র তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য জ্ঞান ফিরে

আসে। এরূপ কয়েকবার করেন। প্রতিবার তিনি বেহুঁশ হন এবং জ্ঞান ফিরে পান। অবশেষে শায়েখ নিজের মুখের লালা তার মুখে লাগিয়ে দেন। ফলে আর বেহুঁশ হননি। পরে শায়েখ তাকে খেলাফতের জুব্বা পরিয়ে গদীতে বসিয়ে দেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তিনি সর্বদা রোজা রাখতেন। এমনকি শৈশবেও দিনের বেলা মায়ের দুধ পান করেননি। এজন্য তাকে মাদারজাদ অলী তথা জন্মগত অলী বলা হতো। বয়াত হওয়ার পূর্বে হযরত খিজির আ.-এর সোহবতে ছিলেন। পরে তার ইশারায় বয়াত হন। বয়াতের পর দ্রুত খেলাফত লাভে ধন্য হন। শায়েখ তাকে তাওয়াজ্জুহ দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। দোয়ার সময় তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। পরে অবশ্য হুঁশ ফিরে আসত। এমনটা চল্লিশ বার হয়েছে। একসময় শায়েখ নিজের মুখের লালা তার মুখে লাগিয়ে দেন। ফলে তিনি একদম সুস্থ হয়ে যান। শায়েখ তখন জিজ্ঞাসা করেন, উলু, কী দেখছ? তিনি আরজ করেন, ত্রিশ বছর মুজাহাদা করে যা পাইনি, আপনার সামান্য তাওয়াজ্জুহের বরকতে তা পেয়েছি।

উলু দীনাওয়ারী-র কথার প্রভাব ছিল অপরিসীম। একবার কয়েকজন মূর্তিপূজককে শুধু এতটুকু বলেন, লজ্জা হয় না আল্লাহকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে? এতে সবাই মুসলমান হয়ে যায়।

ওয়াজ-নসিহত

খেলাফত পেয়ে তিনি মানুষের হেদায়েত ও ওয়াজ-নসিহতের কাজ শুরু করেন। কেউ মুরিদ হওয়ার জন্য এলে মোরাকাবায় বসে যেতেন। অনুমতি পেলে মুরিদ করতেন, অন্যথায় বিদায় করে দিতেন। তিনি তরীকতের ঊর্ধ্বতন বুযুর্গদের জন্য ঈসালে সওয়াব করতেন। মজলিসে যারা যোগদান করত সবাইকে খাওয়াতেন, কিন্তু নিজে অনাহারে থাকতেন। তিনি খুব কম ঘুমাতেন, ছেঁড়া ও তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। রাতদিন মশগুল থাকতেন কুরআন তেলাওয়াত ও ইবাদত-বন্দেগিতে। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ক্রন্দন করতেন। কখনো কাঁদতে কাঁদতে হয়ে যেতেন একদম বেহুঁশ। তার বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তার হালাত ছিল খুবই উন্নত। শোনা যায়, ২৯৯ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

বাতেনী কামালাত

তিনি রিয়াজত ও মুজাহাদায় ছিলেন কামেল বুযুর্গ। ছিলেন হাফেজে কুরআন, জাহেরী ও বাতেনী ইলমের ইমাম। ইবনে জালা ও তার

www.maktabatulabrar.com

আকাবিরের সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন। খাজা হুবায়রা ছাড়াও আরো কয়েকটি সিলসিলা থেকে খেলাফত লাভ করেছেন। এতে অবশ্য মতানৈক্য রয়েছে যে, খাজা মামশাদ দীনাওয়ারী ও খাজা উলু দীনাওয়ারী একই ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ে যেহেতু একই সময়ে ইন্তিকাল করেছেন আবার হালাত ও মাশায়েখও প্রায় অভিন্ন, তাই একই ব্যক্তি বলে ভ্রম হয়। কিন্তু উভয়ের বংশক্রম যেহেতু ভিন্ন, তাই কেউ কেউ বলেছেন, দুই ব্যক্তি। খাজা উলু দীনাওয়ারীকে চিশতী সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। আর খাজা মামশাদ দীনাওয়ারীকে মনে করা হয় সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম মতটি অবশ্য বেশি স্পষ্ট।[১]

বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য হবে না

খাজা মামশাদ দীনাওয়ারী-র অভ্যাস ছিল খানকার দরজা সর্বদা বন্ধ রাখতেন। কোনো অপরিচিত লোক এলে ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি মুসাফির না মুকিম? মুকিম হলে ভিতরে আসার অনুমতি দিতেন আর মুসাফির হলে ফিরিয়ে দিতেন। কারণ হিসাবে বলতেন, তুমি এখানে কিছু দিন থাকার পর আমার সঙ্গে মহব্বত হয়ে যাবে। তখন হঠাৎ একদিন বলবে, আমাকে বিদায় দিন! তখন তোমার বিচ্ছেদ-বেদনা আমি সহ্য করতে পারব না। সুতরাং মুকিম হলে এসো, মুসাফির হলে চলে যাও।

আশ্চর্য কারামত

একবার এক লোক খাজা মামশাদ দীনাওয়ারী-র কাছে এসে দোয়া চাইল। তিনি বললেন, যাও, আল্লাহর দরবারে যাও, তাহলে আমার দোয়ার প্রয়োজন হবে না। সে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আল্লাহর দরবার কোথায়? তিনি বলেন, যেখানে তুমি নেই, সেখানেই আল্লাহর দরবার। লোকটি এতটুকু শুনে চলে গেল এবং নির্জন কোণে গিয়ে বসে পড়ল। লোকটির প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ হলো। ফলে সে পরম সৌভাগ্য লাভ করল।

ঘটনাক্রমে দেশে একবার ভয়াবহ রকম বন্যা হলো। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। খাজা মামশাদের খানকা ছিল উঁচু টিলার ওপর। ফলে সকলে তার খানকার দিকে আসতে লাগল। ইতিমধ্যে সেই দোয়াপ্রার্থী লোকটিকে দেখেন, পানির ওপর জায়নামায বিছিয়ে আসছে।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৫৪।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কী খবর? সে উত্তর দিল, হযরত! সবই আপনার দোয়ার ফল। আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা সবকিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। তখন খাজা দীনাওয়ারী বলেন, যখন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি দরবেশদের সমস্ত কার্যক্রম দৃঢ়তা ও সত্যানুসন্ধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তখন থেকে তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি না।

বর্ণিত আছে, হযরত খাজা মামশাদ দীনাওয়ারী রহ. বলেন, একবার আমি কিছুটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ফলে সর্বদা আমার মনে দুশ্চিন্তা লেগে থাকত। একদিন স্বপ্নে দেখি, কেউ আমাকে বলছে, হে কৃপণ! এতটুকু ঋণ আমি পরিশোধ করে দেব, তুমি তোমার অন্তরকে চিন্তামুক্ত রাখো। তোমার যা প্রয়োজন নিতে থাক। তোমার কাজ হলো নেয়া আর আমার কাজ হলো দেয়া। খাজা দীনাওয়ারী বলেন, এরপর থেকে আমি কখনো মুদি বা রুটি বিক্রেতার সঙ্গে দরাদরি করিনি। তারা যা চায় দিয়ে দিতাম।

অমিয় বাণী

■ খাজা দীনাওয়ারী বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বুযুর্গের সোহবতে যায়, সেখানে গিয়েও নিজেকে বড় মনে করে, সে তার সোহবত থেকে কিছুই হাসিল করতে পারবে না।

■ তিনি আরো বলেন, আহলে দিলের সোহবতে গেলে অন্তরে এসলাহ আসে আর আহলে ফাসাদের কাছে গেলে অন্তরে ফাসাদ পয়দা হয়।

■ তিনি বলেন, তাসাওউফ অযথা কাজকর্ম ও কথাবার্তা ছেড়ে দেয়ার নাম। আর যে জিনিসের দিকে নফ্স ধাবিত হয় সেটা ছেড়ে দেয়ার নাম তাওয়াক্কুল।

■ তিনি আরো বলেন, আমি বুযুর্গদের দরবারে নিজের সমস্ত ইলম-কালাম ও হালাত ছেড়ে দিয়ে উপস্থিত হতাম। পরে অপেক্ষায় থাকতাম সেই ফুয়ুয ও বরকতের যা তাদের সোহবত থেকে হাসিল হতো। কেননা বুযুর্গের কাছে নিজের ইলম-কালাম ও হালাত নিয়ে গেলে নিজের ইলমী গুণের কারণে তার ফয়েয থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

■ তিনি বলেন, তুমি যদি পূর্বাপর সকলের হেকমত জমা করো এবং নিজেকে অলী বলে দাবী করো, তবুও আরেফদের স্তরে পৌঁছতে পরবে না

www.maktabatulabrar.com

যতক্ষণ না তোমার বাতেন আল্লাহর প্রতি আশ্বস্ত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর ওয়াদার ওপর এবং তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। তিনি বলেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের যাত বিপদাপদ তাকে কখনো হতাশ করতে পারে না।

■ তিনি আরো বলেন, আমি এক সফরে এক শায়েখকে দেখেছি, তার দেহে ছিল নেকীর আছর। আমি আবেদন করলাম, আমাকে কিছু নসিহত করুন! তিনি বলেন, নিজের হিম্মত উঁচু রাখো এবং সেটার প্রতি মনোযোগী থাক। কেননা হিম্মতই সমস্ত কাজের উৎস। যার হিম্মত উঁচু তার কাছে সমস্ত আমল ও হালত সহজ হয়ে যাবে।

■ তিনি আরো বলেন, আমি কোনো পীরের কাছে যাইনি, কোনো আমীরের ব্যাপারে আমার অন্তর সায় না দিলে কিছু চাইনি। তিনি বলেন, আল্লাহর পথ বহু দূর, আল্লাহর রাস্তায় চলা বহু কঠিন। শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ আনসারী কথাটা ব্যাখ্যা করে বলেন, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা বহু কঠিন। কিন্তু আল্লাহ পাক হাত ধরলে পৌঁছা সহজ হয়ে যায়।[১]

ইন্তিকাল

ইমাম শা'রানী তাবাকাতে লেখেন, খাজা মামশাদ ২৯৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। খাজিনাতুল আউলিয়ার গ্রন্থকার লেখেন, সকলের ঐক্যমতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন ২৯৮ হিজরিতে। আনওয়ারুল আশেকীন গ্রন্থকার ১৪ই মহররম ২৯৯ হিজরী লিখেছেন। সময়টা ছিল মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামল। তার মাজার দীনাওয়ারে অবস্থিত। আহলে শাজারাও এটা গ্রহণ করেছেন। ইন্তিকালের সময় এক বুযুর্গ ছিলেন পাশে। তিনি জান্নাতের জন্য দোয়া করলে খাজা মামশাদ মুচকি হেসে বলেন, ত্রিশ বছর যাবত জান্নাত সমস্ত জৌলুসসহ আমার সামনে উপস্থিত হতো, আমি একবারও সেদিকে চোখ তুলে তাকাইনি। আমি তো জান্নাতের মালিকের আকাঙ্ক্ষী।

তার খলিফা ছিলেন খাজা আবু মুহাম্মদ, খাজা আবু আহমদ বাগদাদী, খাজা আবু ইসহাক ও খাজা আসআদ আহমদ দিনুরী।[২]

তার দুনিয়া মিলে গেছে

হযরত খাজা মামশাদের শাগরেদ আবু আমের বলেন, একদিন আমি শায়েখের খেদমতে ছিলাম। এক যুবক এসে খাওয়ার দাওয়াত দিল।

১. তবকাতে কুবরা, তবকাতে সুফিয়া ও সিফাতুস সফওয়া অবলম্বনে।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৫৬।

শায়েখ বললেন, তুমি কি সূফীদেরকে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারবে যেন পথে কোনো বাজার না পড়ে? আসলে তিনি অজুহাত খুঁজছিলেন দাওয়াত কবুল না করার। যুবক চলে গেলে সাথীরা জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি তো কখনো এমনটা করেন না, এভাবে ফিরিয়ে দিলেন কেন? শায়েখ জবাবে বলেন, সেই যুবকের দুনিয়া মিলে গেছে, ফলে তার নিসবত চলে গেছে। এখন আমাদের পিছনে কিছু খরচ করে দেখতে চায়, নিজের পুঁজি ফিরে পায় কি না। কিন্তু যতক্ষণ না দুনিয়ার মহব্বত দিল থেকে বের করবে, এই নিসবত ফিরে পাবে না।

শায়েখ আব্দুল্লাহ তাফী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে হাফিফকে বলতে শুনেছি, আমি খাজা মামশাদ দীনাওয়ারীকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতদু'টো আকাশের দিকে তুলে বলছেন, হে অন্তরসমূহের প্রভু! আকাশ তার মাথার ওপর ছিল, এমন কি মাথায় পড়ে গেল এবং ফেটে গেল। পরে তাকে উঠিয়ে নিল।

একদিন খাজা মামশাদ ঘর থেকে বের হলে কুকুর চিৎকার করল। তিনি বললেন, لا إله إلا الله। ফলে কুকুর তৎক্ষণাৎ মরে গেল।

হযরত মামশাদ বলেন, মুরিদের আদব হলো শায়েখের সম্মান করা এবং সাথীসঙ্গীদের খেদমত করা। আসবাবের ওপর ভরসা না করা, আদবে শরিয়তের হেফাজত করা।[১]

(৯) শরীফুদ্দীন খাজা আবু ইসহাক চিশতী রহ.

খাজা আবু ইসহাকের উপাধী ছিল শরফুদ্দীন বা শরীফুদ্দীন। তিনি শামদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। একসময় মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে এবং বাতেনী তালকীন দেয়ার জন্য খোরাসানের চিশতে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাকে এবং তার সিলসিলাভুক্ত সকল বুযুর্গানে দ্বীনকে চিশতী বলা হয়।

খাজা আবু ইসহাক শামী ছিলেন প্রথম বুযুর্গ যার নামের সঙ্গে চিশতী শব্দ লেখা হয়। আফসোস, তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কোথাও পাওয়া যায় না! সিয়ারুল আউলিয়া কিতাবে তার সম্পর্কে কয়েক লাইন মাত্র পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে তার একটা আবছা জীবনচিত্রও আঁকা যায় না। পরবর্তী কিতাব যেমন মিরআতুল আসরার, শাজারাতুল আনওয়ার ও খাজিনাতুল আছফিয়া ইত্যাদি গ্রন্থে যে আলোচনা পাওয়া যায় তা নিতান্তই

১. নফহাতুল উনস ১০৬।

www.maktabatulabrar.com

কিচ্ছা-কাহিনী ও সামা' সম্পর্কিত কতিপয় ঘটনা। এতে তার ব্যক্তিত্ব কিছুই ফুটে ওঠে না। একটা বিরাট রুহানী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা যে বিপুল যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এসব আলোচনায় তার কিছুই অনুমিত হয় না।[১]

শায়েখ দীনাওয়ারী-র খেদমতে

তিনি ছিলেন শামের বাসিন্দা। নিজ দেশ ছেড়ে বাগদাদ আসেন এবং খাজা মামশাদ দীনাওয়ারীর খেদমতে উপস্থিত হন। খাজা দীনাওয়ারী ছিলেন তৎকালীন সর্বজনস্বীকৃত বুযুর্গ। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ তার খেদমতে উপস্থিত হতো। তার হালত খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার তাজকেরাতুল আউলিয়ায় এবং মাওলানা আব্দুর রহমান জামী নাফহাতুল উনসে লিপিবদ্ধ করেছেন। খাজা আত্তার লেখেন–খাজা মামশাদ দীনাওয়ারী খানকার দরজা সাধারণত বন্ধ রাখতেন। কেউ এলে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি মুসাফির না মুকিম? পরে বলতেন, মুকিম হলে এসো আর মুসাফির হলে খানকায় তোমার জায়গা নেই। কেননা কিছুদিন থেকে যখন আমার সঙ্গে মহব্বত হয়ে যাবে, তখন চলে যেতে চাইবে। এতে আমার কষ্ট হবে। এখন আমার আর বিচ্ছেদ-বেদনা সইবার শক্তি নেই।

খাজা আবু ইসহাক তার খানকায় উপস্থিত হলে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কি? তিনি বলেন, আবু ইসহাক শামী। শায়েখ দীনাওয়ারী বলেন, আজ থেকে লোকেরা তোমাকে আবু ইসহাক চিশতী বলে ডাকবে। চিশত ও আশপাশের লোকেরা তোমার মাধ্যমে হেদায়েত পাবে। তোমার সিলসিলায় যারাই প্রবেশ করবে কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে চিশতী বলে ডাকা হবে। পরে খাজা দীনাওয়ারী তাকে চিশতে পাঠিয়ে দেন দাওয়াত ও ইরশাদের জন্য। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেখানে একটা সিলসিলার গোড়াপত্তন হয় এবং অতি দ্রুত একটা বিরাট রুহানী সিলসিলার মারকায হিসাবে পরিচিত হয়।

তিনি অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে বসবাস করতেন। এমনকি সেজন্য গর্ববোধ করতেন। একদিন নিজের মুরিদ খাজা আবু আহমদ চিশতীকে বলেন, হে আবু আহমদ! দরবেশী আরব আজমের বাদশাহীর চেয়েও বড়। যদি আবু ইসহাককে সোলায়মানের রাজত্বও দেয়া হয়, আল্লাহর কসম! তবুও সে তা গ্রহণ করবে না।[২]

১. খালিক আহমদ নেজামীর তারিখে মাশায়েখে চিশত, পৃষ্ঠা ১৩৬।
২. তারিখে মাশায়েখে চিশত, খালিক নেজামী ১৩৭।

মারেফতের ঝর্ণাধারা

খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতে মারেফতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন। তিন সেখানে মাদরাসাতুল ফয়য নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও কায়েম করেন। বহু পীর-মাশায়েখ তার ঝর্ণাধারা থেকে তৃষ্ণা নিরারণ করত এবং দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত। আজ অনেকে জানে না চিশত কোথায় অবস্থিত? অথচ তাদের বরকতে চিশত নামটি চিরদিনের জন্য অক্ষয় হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মোবারক সিলসিলার মাধ্যমে হাজার হাজার পীর-মাশায়েখ সৃষ্টি হয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে শরীয়তে মুহাম্মাদী সারা বিশ্বে পৌঁছে গেছে। বিশেষত প্রাচ্যের এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে এ সিলসিলার বুযুর্গানে দ্বীন চিশতিয়া তরিকার আলো পৌঁছাননি।

তিনি ছিলেন জাহেরী ও বাতেনী ইলমে সুবিজ্ঞ এবং কাশ্‌ফ ও কারামতের অধিকারী। তবে স্বাভাবিক হালতে থাকতেন যেন কাশ্‌ফ-কারামত প্রকাশ না পায়। সুদীর্ঘ সাত বছর শায়েখের খেদমতে ছিলেন এবং কঠোর রিয়াযত-মুজাহাদা করেছেন। অতঃপর সুলুকের সুউচ্চ স্তরে সমাসীন হন। চিশতে আরো চারজন বিখ্যাত বুযুর্গ বিগত হয়েছেন। তারা হলেন, হযরত আবু আহমদ আবদাল, খাজা আবু মুহাম্মাদ, খাজা নাসিরুদ্দীন ও খাজা মওদুদ। এরা ছিলেন চিশতী তরিকার প্রাচীন বুযুর্গ।

হালাত ও কারামত

তিনি ছিলেন জাহেরী ও বাতেনী ইলমের অধিকারী বড় আবেদ ও যাহেদ। সাত দিনে একবার ইফতার করতেন। তিনি বলতেন, ক্ষুধার্ত থাকলে এমন নেয়ামত পাওয়া যায় যা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। তিনি আরো বলতেন, ফকিরদের মেরাজ হলো ক্ষুধা। বয়াত হওয়ার ইচ্ছায় একাধারে চল্লিশ দিন ইস্তিখারা করেন। গায়েব থেকে আওয়াজ আসে, যদি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাও তাহলে মামশাদ দীনাওয়ারী-র কাছে চলে যাও! সুদীর্ঘ সাত বছর ছিলেন শায়েখ মামশাদের খেদমতে। পরে খেলাফত-লাভে ধন্য হন।

তার বিশেষ কিছু কারামত ছিল। কেউ একবার তার মজলিসে বসলে গোনাহের আকর্ষণ দুর্বল হয়ে যেতো, গোনাহ করতে পারত না। এমনকি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে আনা হলেও সুস্থ হয়ে যেত। কোথাও সফরের ইচ্ছা করলে সঙ্গে দু'একশ লোক থাকলেও চোখ বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ গন্তব্যে পৌঁছে যেতেন।

www.maktabatulabrar.com

বাদশার সঙ্গে সাক্ষাতে অনীহা

একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বাদশা দোয়ার জন্য আসেন। তিনি তাওয়াজ্জুহ দিলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। পরে আবার কোনো প্রয়োজনে বাদশা এলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। বাদশা আরজ করেন, হযরতের কষ্টের কী কারণ? তিনি বলেন, বাদশার বার বার আগমনে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার দ্বার হয়ত কোনো গোনাহ হয়ে গেছে! যে কারণে আমীরদের সঙ্গে ওঠাবসা শুরু হয়ে গেছে আর গরীবদের সঙ্গে ওঠাবসা কমে গেছে। আল্লাহ না করুন, আমার হাশর গরীবদের সঙ্গে না হয়ে আমীদের সঙ্গে হয় কি না!

কথিত আছে, সুলতান মাহমুদ গাজনবী সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করার সময় খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতী তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি স্বয়ং জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন কি সুলতান মাহমুদ গজনবী তার ভক্ত হয়ে যান। সোমনাথের যুদ্ধে জয়লাভের পর সুলতান মাহমুদ গজনবী তার কদমবুসীর সৌভাগ্য লাভ করেন।

ইন্তিকাল

তিনি ১৪ই রবিউল আউয়াল ৩২৯ হিজরী মোতাবেক ৯৪০ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তার মাজার সিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল উক্কা নামক স্থানে অবস্থিত। তার খলিফা হলেন খাজা আবু আহমদ আবদাল, খাজা আবু মুহাম্মাদ ও খাজা তাজুদ্দীন।

(১০) খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশতী আল হাসানী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

কুদওয়াতুদ্দীন তার উপাধী। বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সাইয়েদ হাসানী। তার সম্মানিত পিতার নাম সুলতান ফারাসনাফা। ২৬০ হিজরির ৬ই রমজান চিশতে জন্মগ্রহণ করেন। দৈহিক সৌন্দর্যে ছিলেন অতুলনীয়। চেহারার ঔজ্জ্বল্য এমন ছিল যে, যদি বলা হয় অন্ধকার রাতে তা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হয়, অত্যুক্তি হবে না।

জন্মের সুসংবাদ

খাজা আবু ইসহাক শামী সুলতান ফারাসনাফার কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। একদিন সুলতানের ভাইকে বলেন, তোমার এক ভাতিজা হবে, তোমার ভাবীকে বলবে সতর্ক থাকতে। কোনো সন্দেহপূর্ণ খাবার যেন না খায়। শায়েখের নির্দেশমত তিনি খুবই সতর্ক থাকেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, খাজা আবু আহমদের ফুফু ছিলেন সতীসাধ্বী ও নেককার মহিলা। খাজা আবু ইসহাক শামী একবার তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, তোমার ভাইয়ের ঔরসে একটি মহান সন্তান জন্ম নেবে। তুমি তার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তোমার ভাবীর তত্ত্বাবধান করবে, যেন কোনো হারাম বা সন্দেহজনক খাবার তার পেটে না যায়। তিনি তখন গর্ভবতী ভাবীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা শুরু করেন। ভাবীকে হালাল খাবার খাওয়াতে নিজে চরকায় সুতা কাটতেন এবং তা বিক্রি করে হালাল খাবার সংগ্রহ করতেন।

অবশেষে ২৬০ হিজরির ৬ই রমজান সেই মহান সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাকে নিজের কাছে রেখে প্রতিপালন করেন। এটা ছিল খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে।

শায়েখের খেদমতে

সাত বছর বয়সে তিনি খাজা আবু ইসহাক চিশতীর খেদমতে আসা-যাওয়া শুরু করেন এবং জাহেরী ও বাতেনী উভয় ইলম অর্জন করেন। শায়েখের তাওয়াজ্জুহের বরকতে অল্প বয়সেই বাতেনী ইলম তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। কচি বয়সেই বলতে শুরু করেন মারেফতের বহু গোপন রহস্য। যা শুনে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও সুবিজ্ঞ শায়েখগণও অবাক হয়ে যেতেন।

তের বছর বয়সে খাজা আবু ইসহাকের মুরিদ হন এবং নির্জন প্রকোষ্ঠে কঠোর সাধনা শুরু করেন। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত শায়েখের খেদমত করেন এবং আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। আট বছরের কঠিন রিয়াযত ও মুজাহাদার পর লাভ করেন খেলাফত। শায়েখ তার জন্য প্রাণভরে দোয়া করেন এবং খেলাফত দিয়ে নিজের জন্মভূমি শামে প্রত্যাগমন করেন।

তালীম ও তরবিয়ত

একসময় পীরের নির্দেশে তিনি চিশত নগরে জাহেরী ও বাতেনী দীক্ষা দিতে শুরু করেন। আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েতে মনোনিবেশ করেন। কালক্রমে আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি যখন আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হতেন তার ললাটদেশ থেকে নূরের বিচ্ছুরণ হতো। যার আলোতে আসমান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যেতো। তখন দর্শকরা বুঝত তিনি আল্লাহর ধ্যানে আত্মমগ্ন হয়েছেন। সেই শুভ মুহূর্তে যার দিকে দৃষ্টি পড়ত সে-ই কারামতের অধিকারী হয়ে যেতো।

www.maktabatulabrar.com

তার বাণীগুলো ছিল খুবই মার্জিত ও উচ্চমানের। মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করত। তৎকালীন আলেমগণ তার বাণী শুনে চমৎকৃত হতেন। তিনি ছিলেন হাফেজে কুরআন। রাতদিন তেলাওতে মশগুল থাকতেন। সর্বদা অজুর সঙ্গে থাকতেন। ছেঁড়া-ফাটা ও তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত কখনো ঘুমাননি। দুনিয়াকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। তাহাজ্জুদের পর অনেক সময় এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি রসূল সা.-এর উম্মতকে ক্ষমা করে দিন!

শায়েখের মহব্বতে বাঁধা পড়েন

একবার নিজের পিতার সঙ্গে শিকারে যান। ঘটনাক্রমে এক পাহাড়ে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। অনেক তালাশ করেও রাস্তা খুঁজে পাননি। এক জায়গায় গিয়ে দেখেন, শাহ আবু ইসহাক শামী বসে আছেন। তার সঙ্গে চল্লিশজন বুযুর্গ দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি শায়েখের কদমে পড়ে যান এবং তাদের সঙ্গে চলে যান। অবশেষে কিছুদিন পর জানা গেল, শাহজাদা অমুক পাহাড়ে খাজা আবু ইসহাকের সঙ্গে অবস্থান করছেন। বাদশা লোক পাঠিয়ে অনেক বোঝালেন চলে আসতে। কিন্তু শায়েখের মহব্বতে বাঁধা পড়েন, ফলে ফকিরিকে প্রাধান্য দেন। তারপর সুদীর্ঘ আট বছর সীমাহীন মুজাহাদা করে খেলাফত লাভ করেন।

কৈশোরে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা

তার পিতার একটা শুঁড়িখানা ছিল। সেখানে ছিল বহু পুরনো মদ। কৈশোরে তিনি একবার শুঁড়িখানায় ঢোকেন। ভিতর থেকে খিল এঁটে মটকা ভাঙ্গতে শুরু করেন। জানতে পেরে পিতা ছুটে আসেন। কিন্ত ভিতর থেকে খিল আঁটা। পরে ছাদে উঠে অত্যন্ত ধমকের স্বরে নিষেধ করেন। তবুও সে নিরস্ত হয়নি। পরে একটা পাথর উঠিয়ে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পাথর মাঝপথে আঁটকে থাকে, নিচে পড়ে না। এটা দেখে পিতা অবাক হন এবং ছেলের হাতে মদ্যপান থেকে তওবা করেন।[১]

দুটি অলৌকিক ঘটনা

একবার তিনি সফরে ছিলেন। ঘটনাক্রমে এমন জায়গা দিয়ে অতিক্রম করেন যেখানে কাফেরদের বসবাস। আশপাশে কোনো মুসলমান নেই।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৫৯।

তাদের নিয়ম ছিল কোনো মুসলমান সেদিকে গেলে কঠিন শাস্তি দিয়ে আগুনে পুড়ে ফেলত। তাকেও তারা তুমুল প্রহার করল, কিন্তু আগুনে ফেলার হিম্মত হয়নি। শায়েখ তখন বলেন, তোমাদের চিন্তার কারণ নেই, আমি নিজেই আগুনে যাচ্ছি। একথা বলে তিনি নিজের মুসল্লা আগুনে ফেলে ঢুকে যান। আগুনে প্রবেশ করতেই আগুন নিভে যায়। ঘটনা দেখে সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ়। ফলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। এমনকি পরম ভক্ত ও প্রাণোৎসর্গী হয়ে যায়।

একবার কতিপয় সাথীসঙ্গীসহ দাজলা নদী পার হতে চাইলেন। কিন্তু পার হওয়ার মতো কোনো নৌকা ছিল না। তিনি সবাইকে চতুর্দিকে বসিয়ে নিজে বসেন মাঝখানে। পরে জিকির-ফিকিরে মশগুল হয়ে যান। এই অবস্থায় নদী পার হয়ে যান। অথচ কারো পা সামান্য ভিজেনি। নিকটেই ছিল কয়েকজন অমুসলিম। তারা এ ঘটনা দেখে মুসলমান হয়ে যায়। এমনকি তারাও শায়েখের বরকতে নদী পার হয়ে যায়। অতঃপর সকলে তার সোহবতে থেকে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা লাভ করে।

ইন্তিকাল

তার অভ্যাস ছিল দিনে একবার কুরআন খতম করতেন আর রাতে করতেন দুই বার। তিনি ছিলেন বাতেনী ইলমের অধিকারী, তবে বাতেনী ইলম প্রকাশ করতেন না। ছিলেন যমানার সর্বস্বীকৃত কুতুবে আবদাল। কারো হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতেন না। ভালো পোশাক ও ভালো খাবার থেকে বিরত থাকতেন। ৩৫৫ হিজরির ৩রা জুমাদাল উখরা ইন্তিকাল করেন। চিশতে এখনো তার মাজার আছে। তার উল্লেখযোগ্য খলিফা হলেন, খাজা আবু মুহাম্মাদ ও খাজা খোদাবান্দা।

(১১) খাজা নাসেহুদ্দীন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু আহমদ রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার উপাধী অলীউদ্দীন বা নাসেহুদ্দীন। তিনি আবু মুহাম্মাদ চিশতী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন জন্মগত অলী। শোনা যায়, মাতৃগর্ভে থাকতেই জিকিরের আওয়াজ শোনা যেতো। বংশীয় দিক থেকে ছিলেন সাইয়েদ হাসানী। ৩৩১ হিজরির মহররম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় সাতবার কালিমা পড়েন। দুগ্ধপানের সময়ও জিকরে এলাহীতে মশগুল থাকতেন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য

www.maktabatulabrar.com

বার কালিমা পড়তেন। যেই পরীক্ষা করতে আসত সেই মুসলমান হয়ে যেত।

শিক্ষাদীক্ষা

চার বছর বয়সে ইলম অর্জনের জন্য মক্তবে যান। অল্পদিনেই কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর ইলমের অন্যান্য শাখায়ও করেন বুৎপত্তি অর্জন।

খেলাফত লাভ

তের বছর বয়সে পিতা খাজা আবু আহমদ আবদালের হাতে বয়াত হন এবং অল্প দিনের মধ্যে সুলুকের পথে কামাল অর্জন করেন। একসময় পিতা তাকে খেলাফতের খেরকা পরিয়ে দেন এবং নিজের গঞ্চীনশীন করেন। তিনি পুত্রকে অসিয়ত করে বলেন, ফকিরী তথা দারিদ্র ও উপবাস অবলম্বন করবে। সর্বদা ফকির-দরবেশদের সোহবতে থাকবে। দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সংশ্রব বর্জন করবে। তাহলে তুমি কামালাতের দরজা লাভ করতে পারবে।

তিনি পিতার নির্দেশিত পথে আমল করতে থাকেন এবং উঁচু মর্যাদা লাভ করেন। বারো বছর ঘরে একাকী থেকে রিয়াযত ও মুজাহাদা করতেন। প্রতিদিন রোজা রাখতেন। ২৪ বছর বয়সে পিতা ইন্তিকাল করেন। ৩৫৫ হিজরির পহেলা জুমাদাস সানিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। চিশতে তার মাজার আছে।

পিতার ইন্তিকালের পর গঞ্চীনশীন হন এবং মানুষকে হেদায়েত করা শুরু করেন। অনেক রাজা-বাদশা ও আমীর-উমারা তার মুরিদ হয়ে হালকায় প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন যুগের সমস্ত আউলিয়া ও সূফিয়ায়ে কেরামের শিরোমণি। সংসার-বিরাগ ও পরহেযগারিতে ছিলেন অতুলনীয়।

গায়েবী খাজানার মালিক

একবার সমুদ্রের কিনারে বসে নিজের জামায় তালি লাগাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বাদশা এসে তাকে এক থলে দিনার হাদিয়া পেশ করল। তিনি নিতে অস্বীকার করেন। বাদশা পীড়াপীড়ি করলে বলেন, এটা আমাদের আকাবিরের নীতি-বিরুদ্ধ, তাই নিতে পারছি না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে তিনি সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরান। তখন অগণিত মাছ মুখে করে দিনার নিয়ে আসে। তিনি তখন বলেন, যার কাছে এই পরিমাণ গায়েবী খাজানা আছে, সে তোমার থলের কী কদর করবে?

আশ্চর্য স্বপ্ন

খাজা আবু মুহাম্মাদের বোন ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার। সর্বদা জিকরে এলাহীতে মশগুল থাকতেন। ফলে বিয়েশাদির প্রতি আগ্রহ ছিল না। একবার খাজা আবু মুহাম্মাদ তার কাছে গিয়ে বলেন, তোমার একটি ছেলে হবে, যে একসময় কুতুবুল আকতাব হবে। বিয়ে ছাড়া তো তার আসা সম্ভব নয়, সুতরাং তুমি বিয়ে করো। বোন ব্যস্ততার অজুহাতে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন পর বোন পিতাকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে পিতা একই নির্দেশ দেন। এমনকি ভাবী স্বামী মুহাম্মাদ সামআনও একই স্বপ্ন দেখেন। খাজা আবু মুহাম্মাদও দেখেন একই স্বপ্ন। অবশেষে মুহাম্মাদ সামআনকে ডেকে বিয়ে পড়িয়ে দেন। তার গর্ভে জন্মলাভ করেন খাজা আবু ইউসুফ, যিনি খাজা আবু মুহাম্মাদের ভাগিনা ও বিশিষ্ট খলিফা।[১]

ইন্তিকাল

তিনি ৪১১ হিজরীর ৪ঠা রবিউল আউয়াল অথবা রজবের শুরুতে ইন্তিকাল করেন। তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। তার ঐতিহাক নাম امام بر حق। চিশতে তার মাজার অবস্থিত। তার খলিফা তিনজন হলেন–খাজা আবু ইউসুফ, খাজা মুহাম্মাদ কাকু ও খাজা উস্তাদ মারওয়ান।

(১২) খাজা আবু ইউসুফ ইবনে সামআন হোসাইনী চিশতী রহ.

খাজা আবু ইউসুফ চিশতী ছিলেন তৎকালীন সময়ের মহান সাধক ও অলিকুল শিরোমণি। তিনি ছিলেন ইলমে মারেফতে সুপণ্ডিত ও বহু কারামতের অধিকারী। রিয়াযত-মুজাহাদা ও তাকওয়া-তাহারাতে ছিলেন অদ্বিতীয়। খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতীর ভাগিনা, পালকপুত্র ও খলিফা।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তিনি ৩৭৫ হিজরিতে চিশত নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বংশক্রম তের সূত্রে ইমাম হোসাইন পর্যন্ত পৌঁছে। তার নাম ছিল আবু ইউসুফ, উপাধী নাসেরুদ্দীন। পিতার নাম মুহাম্মাদ সামআন এবং মাতার নাম ইসমত খাতুন। এই মহিয়সী নারী ছিলেন খুবই পরহেযগার ও ইবাদতগুজার। আবার সংসার-বিরাগিণী। দিনরাত বুযুর্গ ভাই খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতীর খেদমত করতেন। চরখায় সূতা কেটে ভাইয়ের জন্য হালাল জীবিকা সংগ্রহ করতেন।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৬৩।

www.maktabatulabrar.com

স্বপ্নের নির্দেশ

খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতী ৬৫ বছর পর্যন্ত বিয়ে করেননি। তার সহোদর বোন তার খেদমত করতেন। ভাইয়ের খেদমতের লক্ষ্যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি নিজেও বিয়ে করেননি। একরাতে খাজা মুহাম্মাদ তার পিতা খাজা আবু আহমদকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলেন, তোমার রাজত্বে মুহাম্মদ ইবনে সামআন নামে একজন আলেম থাকেন। তুমি নিজের বোনকে তার সঙ্গে বিয়ে দাও। খাজা মুহাম্মাদ তাকে ডেকে নিজের বোনের বিয়ে দিলেন। পরে তিনিও চিশতে থেকে যান। খাজা ইউসুফ তারই ছেলে।

তালীম-তরবিয়ত

৬৫ বছর বয়সে খাজা আবু মুহাম্মাদ বিবাহ করেন, কিন্তু তার কোনো সন্তানাদি হয়নি। খাজা আবু ইউসুফকে তিনি সন্তানের মত লালন-পালন করতেন। ইলম-কালাম শিখাতেন এবং সুলুকের তালীম দিতেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি খাজা আবু মুহাম্মাদের হাতে বয়াত হন। একদিন খাজা আবু মুহাম্মাদ তাকে বলেন, বৎস! সাতবার আমার নাম উচ্চারণ করে আসমানের দিকে তাকাও। তিনি তদ্রূপ করলে আরশ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। পরে আবারো সাতবার বলে নিচের দিকে তাকাতে বলেন। তিনি তদ্রূপ নিচের দিকে তাকালে পাতালপুরী পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। শায়েখের তাওয়াজ্জুহের ফলে তার সামনে বাতেনী ইলম উন্মুক্ত হয়ে যায়। অল্প দিনেই জাহেরী ও বাতেনী ইলমে কামালাত অর্জন করেন এবং মারেফত ও হাকিকতের সুউচ্চ স্তরে সমাসীন হন। অতঃপর খাজা আবু মুহাম্মাদ তাকে খেলাফতের খেরকা পরিয়ে দেন এবং নিজের গঙীনশীন করেন। শায়েখের ইন্তিকালের পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১]

আশ্চর্য কারামত

একবার গরমের মৌসুমে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড গরমে সবার তীব্র পিপাসা পায়। কিন্তু কোথাও পানি নেই। উপায়ান্তর না দেখে তিনি পাথরে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। ফলে সেখান থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। তিনি প্রথমে পান করেন, পরে সাথীরা পান করে।

১. নাফহতুল উনস ২৯৯।

তিনি হাফেজ ছিলেন না, তাই সবসময় মনঃক্ষুণ্ণ থাকতেন। মন থাকত ভারাক্রান্ত। একবার খুবই চিন্তিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আলমে ওয়াকিয়ায় নিজের শায়েখকে বলতে শোনেন, একশ বার সুরা ফাতেহা পড়, অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাবে। তিনি একশ বার সুরা ফাতেহা পড়তেই পুরো কুরআন মুখস্থ হয়ে গেল। পরে দৈনিক পাঁচ খতম তেলাওয়াত করতেন। কোনো কোনো ঐতিহসিক লেখেন, তার খেদমতে কেউ তিন দিন থাকলে সাহেবে কারামত হয়ে যেতো।[১]

দু'টি কারামত

একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় কঙ্গ নামক এলাকায় পৌছেন। সেখানে এক দরবেশ ছিল তিনি, তার বাড়িতে মেহমান হন। রাতে তার মেয়ে স্বপ্নে দেখল, পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ থেকে তার কোলে নেমে এসেছে। মেয়ে সকালে পিতার কাছে স্বপ্নের কথা বলল। পিতা তার কাছে উপস্থিত হন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতে। দরবেশ কিছু বলার পূর্বেই তিনি নিজেই স্বপ্নের কথা বলেন এবং ব্যাখ্যাও বলে দেন। ফলে দরবেশ নিজের পূণ্যবতী মেয়েকে বিয়ে দেন শায়েখের সঙ্গে। তার গর্ভে জন্ম নেয় শায়েখ মওদুদ চিশতী যার আলোচনা সামনে আসবে।

একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নির্মীয়মাণ একটি মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সেখানকার লোকেরা একটা বিষয়ে পেরেশান ছিল। মসজিদের ছাদের বড় কড়িকাঠ ছিল খানিকটা ছোট। সেটা লাগানোর কোনো উপায় ছিল না। তার কাছে কেউ বিষয়টা উত্থাপন করলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ছাদে যান। পরে একদিক থেকে সেটা নিজে উঠান। ফলে কড়িকাঠ সেদিক থেকে এক গজ বড় হয়ে গেল। দেখে সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ়!

একবার ইবাদতে কিছুটা অলসতা এসে গেছে বলে বিশ বছর পানি পান করেননি। সাধনা ও মুজাহাদায় তিনি ছিলেন আকাবিরের জীবন্ত নমুনা। বাড়িতে একটা চিল্লাখানা বানিয়ে সেখানে সুদীর্ঘ বারো বছর চিল্লাকাশি করেন।

দুনিয়া-বিরাগ

তিনি অভাব-অনটন ও অনাহারে দিন কাটাতেন এবং দুঃখী-দরিদ্রদের সঙ্গে খানাপিনা করতেন। দুনিয়াদার কেউ তার মজলিসে এলে তার চেহারা

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৬২।

www.maktabatulabrar.com

হয়ে যেতো বিবর্ণ। দুনিয়াদারদের তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি ফকির, আমি মিসকীন!

তার নিকট নযর-নিয়ায যা আসত সবই গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। রাতদিন কয়েকবার কুরআন খতম করতেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে মাটির নিচে নির্মিত একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে থাকতে শুরু করেন। বার বছর সেখানে ইবাদত ও মুজাহাদা করেন। ইবাদতখানাটি আজো বিদ্যমান আছে। দেশবিদেশ থেকে বহু লোক এটি যিয়ারত করে।

ইন্তিকাল

তিনি ৪৫৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৮৪ বছর। অনেকের মতে তিনি ৩রা রজব ৪৫৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এমনকি এ ব্যাপারে তারা ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতও দাবী করেন। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক রজবের পরিবর্তে জুমাদাল উখরা বলেছেন। কেউ বলেছেন, পহেলা জুমাদাল উলা, কেউ বলেছেন ৪ঠা রবিউল আখের। চিশতে তার মাজার অবস্থিত। ইন্তিকালের সময় নিজের ছোট ছেলে কুতুবুদ্দীন মওদুদ চিশতীকে ইলম শেখার অসিয়্যত করেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান। তার আরেক খলিফা হলেন খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী।

(১৩) কুতুবুল আকতাব, শামসে সূফিয়া, চেরাগে চিশতিয়া খাজা মওদুদ চিশতী

কুতুবুল আকতাব ও কুতুবুদ্দীন তার উপাধী। শাময়ে সূফিয়া ও চেরাগে চিশতীয়া ইত্যাদি উপাধিতেও তিনি ভূষিত ছিলেন। ৪৩০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। বংশীয় দিক থেকে ছিলেন সাইয়েদ হাসানী।

শিক্ষা-দীক্ষা

ইলম অর্জনের জন্য তিনি বুখারায় পর্যন্ত গিয়েছেন। সেখানে শায়খুল মাশায়েখ খাজা নাজমুদ্দীন ওমর থেকে ফেকাহশাস্ত্র অর্জন করেন। প্রায়ই তিনি বুখারার আলেমগণের সঙ্গে ইলমী বিতর্ক করতেন। এমনকি জাহেরী ইলম ও বাতেনী শক্তির বলে সেখানকার সকল আলেমকে অনুগত করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত আলেম তার হাতে বয়াত হন। কেউ তার সোহবতে এলে প্রভাবিত হয়ে পড়ত এবং বাতেনী কামালাত হাসিল করে ফিরে যেতো।

বয়াত ও খেলাফত লাভ

বাল্যকাল থেকেই তার হাতে বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে লোকেরা তখন থেকে তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। অতঃপর ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ষোল বছর বয়সে সমস্ত উলুমে জাহেরী থেকে ফারেগ হয়ে যান। তারপর লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে রিয়াযত ও মুজাহাদায় আত্ম মগ্ন থাকেন। বুযুর্গ পিতা খেলাফতের খেরকা পরিয়ে দেয়ার সময় বলেন, আমি তোমাকে কামেল মনে করে খেলাফতের খেরকা পরিয়ে দিচ্ছি। পিতার তাওয়াজ্জুহের বরকতে তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মারেফত উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে খেলাফতপ্রাপ্তির পর শায়েখ আহমদের পরামর্শে জাহেরী ইলম তাকমীল করেন। তখন তিনি মিনহাজুল আরিফীন ও খুলাসাতুশ শরীয়াহ নামে দুটি কিতাবও লেখেন। ২৯ বছর বয়সে পিতা খাজা আবু ইউসুফ ইন্তিকাল করেন এবং তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

তিনি ছিলেন উত্তম গুণাবলীর অধিকারী এবং সত্যিকার অর্থে পিতার গদিনশীন। রাজ্যের মানুষ তার ভক্ত-অনুরক্ত ও অনুগত ছিল। মানুষের হেদায়েতে তিনি পিতার দায়িত্ব পালন করেন। শোনা যায়, তার দশ হাজার খলিফা ছিল। ভক্ত ও মুরিদের সংখ্যা ছিল অগণিত। তিনি শায়খুল ইসলাম আহমদ জামীর সোহবত ও তরবিয়ত পেয়েছেন। তার কাশফ ও কারামত দেখে বিশিষ্ট সাধারণ সকলে তার ভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তার প্রসিদ্ধির কথা রাজ্যের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

তার জমিন সংকোচনের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। যখনি তওয়াফ করতে চাইতেন বাতাসে ভর করে মক্কায় চলে যেতেন। গরীব-মিসকিনদের তিনি খুবই ভালোবাসতেন। দামী পোশাক অপছন্দ করতেন। বিনয়-নম্রতার দরুণ সবাইকে আগে সালাম দিতেন। প্রত্যেকের সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। কাশফে কুলুব ও কাশফে কুবুর তার হাসিল ছিল।

শায়খুল ইসলামের সঙ্গে বিরোধ

বড় বড় শায়েখগণ তাকে খুবই সম্মান করতেন। এমনকি তারা তার ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। শায়খুল ইসলাম শেখ আহমদ জামী থেকেও তিনি ফয়েয হাসিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, শায়খুল ইসলাম

১. আখবারুল আখইয়ার।

www.maktabatulabrar.com

আহমদ জামী রহ. একবার হেরাতে তাশরীফ আনেন। তখন দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তার কামালাতের খ্যাতি। তিনি হেরাতে কিছুদিন অবস্থান করে চিশত অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন লোকেরা তাকে সংবাদ দেয়, খাজা মাওদুদ চিশতী মুরিদগণকে নিয়ে আসছেন আপনাকে এই এলাকা থেকে বের করে দিতে। অবশেষে তাই হলো। খাজা মাওদুদ নিজের মুরিদদের নিয়ে আহমদ জামীর কাছে এসে পৌঁছেন। মুরিদগণ তখন তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। তিনি ধৈর্যসহকারে সব শুনে বলেন, এ রাজ্য মওদুদ চিশতীরও নয়, আমারও নয়। যদি বেলায়েতের অর্থ তাই হয় আমি যা জানি, তাহলে আগামীকাল বোঝা যাবে। ঠিক সেই সময় তার একটি কারামত প্রকাশ পায়। নদীতে প্রবল জোয়ার ও মুষলধারে বৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি নিজের মুরিদানসহ নৌকা ছাড়াই নদী পার হয়ে যান। খাজা মওদুদ চিশতীর মুরিদগণ তার কারামতের কথা শায়েখের কর্ণগোচর করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একদল মুরিদ নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হন এবং তার ঘোড়ার রেকাব চুম্বন করেন। তিনি খাজা মওদুদের অনুতাপ ও অনুশোচনা বুঝতে পেরে তাকে সান্তনা দেন। পরে ঘোড়ায় চড়ে সকলের সঙ্গে এক গ্রামে গিয়ে অবতরণ করেন। খাজা মওদুদের মুরিদেরা তার সঙ্গে পুনরায় গোস্তাখী শুরু করে। খাজা মওদুদ তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা মানেনি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সবাইকে পলায়ন করতে হয়। সবাই চলে গেলে খাজা মওদুদ চিশতী শায়খুল ইসলামের পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

তাবাররুকের অবমূল্যায়ন

একবার এক শাহজাদা তার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাবাররুক প্রার্থনা করে। তিনি দিতে অস্বীকার করেন। সে শায়েখের প্রিয়জনদের মাধ্যমে সুপারিশ করায়। ফলে তিনি তাকে একটি টুপি হাদিয়া দেন। সঙ্গে একথাও বলে দেন, টুপিটি সযত্নে রাখবে, অন্যথায় বিপদে পড়বে। বাড়ি গিয়ে সে রঙ-তামাশায় লিপ্ত হয়ে যায়। জানতে পেরে শায়েখ বলেন, টুপি কি তার কেরামতি দেখায়নি? কিছুদিনের মধ্যেই সে এক অপরাধে গ্রেফতার হয়। এমনকি তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়।

তার খলিফার সংখ্যা ছিল দশ হাজার। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– শায়েখ আবু নাসিব শাকিবান, খাজা আবু আহমদ, খাজা শরিফ যিন্দানী, শাহ সুবহান, শায়েখ হাসান তাবতী, শায়েখ আহমদ বদরুন, খাজা সবুজপুশ, শায়েখ উসমান, খাজা আবুল হাসান প্রমুখ।

ইন্তিকাল

তিনি ৫২৭ হিজরীর রজবের শুরুতে ইন্তিকাল করেন। ৯৭ বছর হায়াত পান। তার জানাযার নামাজ প্রথমে অদৃশ্যের লোকেরা পড়ে। পরে মানুষ পড়ে। নামাজের পর জানাযা নিজেই উড়তে থাকে। খাজা সাহেবের এই কারামত দেখে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তার মাজার চিশতে অবস্থিত।

(১৪) খাজা নায়্যিরুদ্দীন শরিফ যিন্দানী রহ.

পরিচয় ও খেলাফত লাভ

তিনি বর্তমান ইরানের অন্তর্গত যিন্দান শহরে ৪৯২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপাধী ছিল নায়্যিরুদ্দীন। তিনি খাজা মওদুদ চিশতীর হাতে বয়াত হন এবং খেলাফত লাভে ধন্য হন। রিয়াযত ও মুজাহাদায় তিনি উৎকর্ষ লাভ করেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিজন জঙ্গলে গাছের লতাপাতা খেয়ে অতিবাহিত করেন। অভাব অনটন তিনি পছন্দ করতেন। অধিকাংশ সময় পরতেন পুরনো কাপড়। তিন দিনে একবার মাত্র ইফতার করতেন। লবণবিহীন শব্জিতে তুষ্ট থাকতেন।

কারামত

একবার এক ফকির এসে কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমার সাত মেয়ে, অথচ টাকা-পয়সা কিছুই নেই। এমন কোনো উপায় বলে দিন যেন তাদের বিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে পারি। শায়েখ বলেন, আগামী কাল এসো, তখন কোনো উপায় বলে দেবো। একথা শুনে ফকির চলে গেল। রাস্তায় এক কাফেরের সঙ্গে তার দেখা। সে কুশল জিজ্ঞাসা করলে শায়েখের দরবারে উপস্থিত হওয়ার কথা বলল এবং উপায় বলে দেয়ার কথাও বলল। কাফের লোকটি বলল, শায়েখ নিজেই তো ফকির, তোমার কী ব্যবস্থা করবেন? তাকে গিয়ে বলো, তিনি যদি সাত বছর আমার খেদমত করতে রাজি হন, তাহলে আমি তাকে সাত হাজার দিনার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। শুনে শায়েখ রাজি হয়ে যান এবং কাফেরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। সাতহাজার দিনার ফকিরকে দিয়ে তিনি তার খেদমতে লেগে যান। ঘটনা জানতে তৎকালীন বাদশা পরে সাত হাজার দিনার পাঠিয়ে দেন। শায়েখ একথা বলে সমস্ত দিনার বিলিয়ে দেন যে, আমি খেদমতের অঙ্গীকার করেছি, কোনো প্রকার বিনিময় নয়। কাফের শায়েখের এমন নির্মোহতা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং শায়েখকে নিজের

www.maktabatulabrar.com

খেদমত থেকে অব্যহতি দেয়। শায়েখ তার জন্য দোয়া করেন আর বলেন, তুমি আমাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছ, আল্লাহ পাকও তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন। কথাটা তার ওপর এত আছর করে যে, তৎক্ষণাৎ সে মুসলমান হয়ে যায়। পরে শায়েখের খেদমতে থেকে ইলমে সুলুক হাসিল করে।

একবার এক ভক্ত কিছু হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বলে দেন, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। এই বনজঙ্গল তো এসবে পরিপূর্ণ বলে একদিকে ইশারা করেন। ভক্ত সেদিকে তাকিয়ে দেখে স্বর্ণের নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, শায়েখের ঝুটা যেই খেতো একদম মাজযুব হয়ে যেতো। তিনি বেশি বেশি কাঁদতেন। অনেক সময় উচ্চস্বরে কাঁদতেন এবং বেহুঁশ হয়ে যেতেন। একবার কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি এত কাঁদেন কেন? জবাবে তিনি বলেন, যখনই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ আয়াতটির কথা স্মরণ হয় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। মনে হয় আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য, অথচ আমি যায়েদ ওমর নিয়ে পড়ে আছি।

ইন্তিকাল

তিনি ৬১২ হিজরির ৩ অথবা ১০ই রজব ইন্তিকাল করেন। ১২০ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে তিনি ৫৮৪ হিজরিতে বা ৫৮০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তার মাজার কোথায়, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন কান্নুজে, কেউ বলেন যিন্দানে, কেউ বলেন সিরিয়ায়। তার বিখ্যাত খলিফাদের মাঝে খাজা উসমান হারুনী অন্যতম।

(১৫) ইমামে তরিকত হযরত খাজা উসমান হারুনী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

আবুন নুর অথবা আবুল মনসুর তার কুনিয়াত। ৫২৬ হিজরিতে খোরাসানের হারুন নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। নগরটি বর্তমান ইরানের অন্তর্গত নিশাপুরে অবস্থিত। তিনি ছিলেন উলুমে শরীয়ত ও তরিকতে কামেল বুযুর্গ। ছিলেন কাশফ কারামত ও রুহানী শক্তির অধিকারী। খাজা আজমীরীর মত সুমহান ব্যক্তিত্বের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। এটাই তার অত্যুচ্চ মর্যাদা ও উঁচু শানের পক্ষে যথেষ্ট। পবিত্র কুরআন মুখস্থ ছিল। দৈনিক একবার কুরআন খতম করতেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় দেশভ্রমণে কাটান। তৎকালীন বিখ্যাত সব পীর-মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সোহবতে থেকে জাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জন করেন। ছিলেন খুবই দীর্ঘায়ু। তার মাযার জান্নাতুল মুআল্লার পাশে অবস্থিত। নজদীদের ক্ষমতা লাভের পূর্বে মাজার-টি চিহ্নিত ছিল। পরে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।

বয়াত ও খেলাফতলাভ

তিনি খেলাফত লাভ করেন শায়েখ হাজী শরিফ যিন্দানী থেকে। কিন্তু নিজের দাদা পীর খাজা কুতুবুদ্দীন থেকেও বরকত হাসিল করেন। নিশাপুরের হারুন নামক এলাকায় বসবাস করতেন। একাধারে সত্তর বছর সাধনা-মুজাহাদা করেন। এর মাঝে কখনো পেট ভরে খাননি। শোনা যায়, রিয়াজত-মুজাহাদায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রতি সপ্তম দিনে মুখ ভরে পানি পান করতেন।

তিনি স্বীয় পীর ও মুরশিদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং সুদীর্ঘ তিন বছর কঠোর রিয়াযত-মুজাহাদা করেন। একসময় পীর সাহেব তাকে পরীক্ষা করে দেখেন, তিনি সর্বপ্রকারে সফলকাম হয়েছেন। তখন তাকে খেলাফতের খেরকা পরিয়ে দেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

খেলাফত-দানের সময় শায়েখ তাকে চার কল্লি টুপি পরিয়ে দেন। পরে বলেন, হে উসমান! এ চার কোণবিশিষ্ট টুপির মাধ্যমে চারটা তরক (তরক শব্দের অর্থ বর্জন)-এর দিকে ইশারা; তরকে দুনিয়া, তরকে আখেরাত (আল্লাহ পাকের যাত ছাড়া)। অতিরিক্ত আহার নিদ্রা তরক করা আর নফসের সর্ববিধ খাহেশ তরক করা। তিনি আরো বলেন, এই টুপি মস্তকে ধারণ করার সেই উপযুক্ত যে ওই চারটি বস্তু তরক করবে। সবাইকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং নিজেকে মনে করবে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট। যার মধ্যে এ গুণ থাকবে না সে এ টুপি পরার উপযুক্ত নয়, বরং এ টুপি পরিধান করা তার জন্য হারাম।

দেশভ্রমণ

এরপর পীর সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি দেশভ্রমণে বের হন এবং দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে সফর করেন। সেখানকার পীর-মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমে তিনি পবিত্র মক্কায় গমন করেন। সেখান থেকে যান মদিনা মুনাওয়ারায়। অতঃপর সেখান থেকে

www.maktabatulabrar.com

বদখশানে যান। বদখশান ও তার আশপাশ এলাকার সকল বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সোহবত লাভে ধন্য হন। মোটকথা– সুদীর্ঘ দশ বছর তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। পরে বাগদাদ গিয়ে কিছুকাল বসবাস করেন। এরপর পুনরায় দেশভ্রমণে বের হন এবং পূর্ণ দশ বছর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন।

কতিপয় কারামত

একবার অগ্নিপূজকদের এক শহরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানকার লোকেরা বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে রাখে। তিনি নিজের খাদেমকে পাঠান আগুন আনতে। তারা আগুন দিতে অস্বীকার করে বলে, এই আগুন পূজার জন্য, তা থেকে দেয়া ঠিক নয়। পরে তিনি নিজেই গিয়ে তাদেরকে বোঝান। তিনি বলেন, আগুন কখনো পূজা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলা, যার কোনো শরিক নেই। আগুন নিজেই সৃষ্ট, সে কীভাবে পূজা পেতে পারে? তার পূজা করলেও সে তোমাদের জ্বালাবে না করলেও জ্বালাবে। আর কেয়ামতের দিন তো অবশ্যই জ্বালাবে। একথা শুনে সবাই বলতে লাগল, আচ্ছা, আপনি কি আগুনের পূজা করেন না? না করলে আগুনে ঢুকে দেখিয়ে দিন আগুন আপনাকে পোড়ায় কি না? একথা শুনে তিনি অজু করে দু'রাকাত নামাজ পড়েন। পরে সরদারের কাছ থেকে একটা অল্প বয়সী শিশুকে কোলে নিয়ে আগুনে ঢুকে যান। তারপর দু'ঘণ্টা বসে থাকেন আগুনে। আগুন তার ক্ষতি করা দূরে থাক শিশুটিরও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এটা ছিল হযরত ইবরাহিম আ. এর মুজিযার প্রতিচ্ছবি। এটা দেখে সরদারসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়। সরদারের নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ আর তার ছেলের নাম রাখা হয় ইবরাহিম। পরে তিনি শায়েখের খাদেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী বলেন, একবার আমি শায়েখের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। সামনে পড়ল নদী। ঘটনাক্রমে নদীতে কোনো নৌকা ছিল না। হঠাৎ শায়েখ বলেন, চোখ বন্ধ করো। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কিছুক্ষণ পর বলেন, চোখ খোল। আমি চোখ খুলে দেখলাম নদীর ওপারে পৌঁছে গেছি। আমি এখনো বুঝতে পারছি না ওপারে কীভাবে পৌঁছে গেলাম।

একবার এক লোক এসে আরজ করল, আমার ছেলে দীর্ঘদিন হলো হারিয়ে গেছে, কোনো হদিস নেই। তিনি তার অভিমুখী হয়ে দোয়া করেন, কিছুক্ষণ মুরাকাবাও করেন। পরে বলেন, তোমার ছেলে তোমার ঘরে চলে

এসেছে। সে অবাক হয়ে ঘরে গিয়ে দেখল, ঠিকই ছেলে ঘরে আছে। তৎক্ষণাৎ সে শুকরিয়া-স্বরূপ ছেলেকে নিয়ে শায়েখের কাছে এলো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এতদিন কোথায় ছিলে? জবাবে সে বলল, আমি দীর্ঘদিন এক দ্বীপে বন্দি ছিলাম। হঠাৎ শায়েখের মত দেখতে এক বুযুর্গ এসে বলেন, চলো। একথা বলে আমার উভয় পা নিজের পায়ের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, চোখ খোল। আমি চোখ খুলতেই দেখলাম, ঘরে এসে গেছি।

শোনা যায়, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীকে তিনি একদিন একরাতে আল্লাহ-ওয়ালা বানিয়ে দিয়েছেন।

হযরত শায়েখ উসমান হারুনী বলতেন, যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে, সে নিজেকে আল্লাহর বন্ধু মনে করবে। প্রথমত সমুদ্রের মত দানশীলতা। দ্বিতীয়ত সূর্যের মত স্নেহমমতা। তৃতীয়ত জমিনের মত বিনম্রতা।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী থেকে বর্ণিত, একবার তিনি নিজের পীর-ভাইয়ের দাফন-কার্যে শরিক ছিলেন। দাফনের পর সবাই চলে গেলে তিনি কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকেন। হঠাৎ কবরের অবস্থা তার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল। তার কোনো অপরাধের কারণে কবরে আযাবের ফেরেশতা এলো। তখন খাজা উসমান হারুনী উপস্থিত হয়ে বলেন, ও আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। শায়েখের সুপারিশে তার আযাব মুলতবি করে দেয়া হয়।

কতিপয় বাণী

● মৃত্যু, অনাহার ও দারিদ–এ তিনটি বিষয়কে যে ভালোবাসে সেই প্রকৃত মুমিন।

● হালাল খাবার খাও, হালাল কাপড় পর এবং তওবা করো। হিংসা-বিদ্বেষ করো না। এটি অতি নিকৃষ্ট কাজ।

● ইলম দুই প্রকার। যথা: মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা। আরেক প্রকার হলো সাধারণ শিক্ষা। তদ্রূপ আমলও দুই প্রকার। যথা: খাস আমল যা একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে করা হয়। আরেক প্রকার হলো যা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে করা হয়। এরূপ আমলের কোনো ছওয়াব নেই।

● ঈমানও দুই প্রকার। যথা: মুখে স্বীকার করা, কিন্তু অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকা। এটি মুনাফেকের ঈমান। আরেক প্রকার হলো, মুখে ও অন্তরে সমানভাবে বিশ্বাস করা। এটি প্রকৃত মুমিনের ঈমান।

www.maktabatulabrar.com

ইন্তিকাল

তিনি ৬১৭ হিজরির ৫ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ৬০৩ হিজরিতে। ৫৬৭ বা ৫৯৭ বা ৬৩৩ হিজরির কথাও পাওয়া যায়। পবিত্র মক্কায় তার মাজার। তার প্রসিদ্ধ চারজন খলিফা– খাজা মুঈনুদ্দীন আজমীরী, খাজা নাজমুদ্দীন সুগরা, শায়েখ সুরী মাঙ্গুহী, খাজা মুহাম্মাদ তুর্ক।

(১৬) গরীব নেওয়ায খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার সম্মানিত পিতা সাইয়্যেদ গিয়াসুদ্দীন। তিনি ৫৩৬/৫৩৭ হিজরিতে সীস্তান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। সীস্তানকে সাজিস্তান বা সিজিস্তান বলা হয়, যার সিংহভাগ বর্তমান ইরানের মধ্যে এবং কিছু অংশ বর্তমান আফগানিস্তানের মধ্যে পড়েছে। সেদিকে সম্পৃক্ত করে তাকে সাজ্‌যী বা সানজারী বলা হয়। তার বংশক্রম এগারো পুরুষে গিয়ে ইমাম হোসাইন পর্যন্ত পৌঁছে। সুতরাং পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে তিনি সাইয়্যেদ। তার পিতা একজন ধনবান ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার আবেদ যাহেদ ও বুযুর্গও ছিলেন। ফলে তিনি যথেষ্ট আরাম-আয়েশে প্রতিপালিত হন।

তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানের ইমামে তরিকত এবং চিশতীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা। চিশতীয়া সিলসিলা তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে প্রসারিত হয়েছে। হিন্দুস্তানে উলুমে মারেফতের সূচনা করেন তিনি। জীবদ্দশায় তার খলিফা ও মুরিদদের সিলসিলাও কায়েম হয়ে যায়। তার হাতে এ দেশের নব্বই লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। তার কামালত ছিল অথৈ সমুদ্রের মত। এমনকি শোনা যায়, যার দিকে দৃষ্টি দিতেন আল্লাহ-ওয়ালা হয়ে যেত। উলুমে জাহেরী ও বাতেনীতে কামাল হাসিল করেন। পনেরো বছর বয়সে তার পিতা ইন্তিকাল করেন।

খোরাসানে হিজরত

খাজা আজমীরী যখন জন্মগ্রহণ করেন সময়টি ছিল দুর্ধর্ষ তাতারীদের ফেতনার যুগ। তাদের অত্যাচারে পুরো ইসলামী বিশ্ব ছিল জর্জরিত। পুরো মুসলিম বিশ্বে তখন ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাযজ্ঞ চলছে। চারদিকে ছিল খুন-খারাবি ও হানাহানি। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল

ভয়াবহ। মুসলমানগণ তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল অন্যদলকে পর্যুদস্ত করার জন্য পশ্চাতে লেগে আছে। বিশেষত ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দানকারী ও বাতেনিয়া সম্প্রদায় দেশে দ্বীনী ফেতনার রাজত্ব কায়েম করেছে। ফলে খাজা আজমীরীর পিতা সিস্তান ত্যাগ করে খোরাসানে চলে আসেন। খাজা আজমীরী এখানেই প্রতিপালিত হন। কিন্তু এলাকাটি তাতারীদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে সেখানকার অবস্থাও হয়ে পড়ে শোচনীয়। খাজা মুঈনুদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার চোখের সামনে এই হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। এ সমস্ত পাশবিকতা দেখে দুনিয়ার প্রতি তার মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়।

তৎকালে খোরাসানের ধর্মীয় পরিবেশ

তখন সমগ্র ইসলামী বিশ্বের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ– অশান্ত ও বিশৃঙ্খল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বহু ফেরকার উদ্ভব হয়েছে। তারা পরস্পরে লিপ্ত ছিল মারামারি ও হানাহানিতে। বাবুক খোররামী খোরামী মাযহাবের প্রবর্তন করেছে। আবু মুসলিম খোরাসানীর অভ্যুদয়ও হয়েছে খোরাসান থেকে। রাওয়ান্দিয়া ফেতনা, আল মুসান্না ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ও হাসান ইবনে শব্বাহের ধ্বংসাত্মক ফেতনার উদ্ভবও হয়েছে এখান থেকে। ধর্মদ্রোহী মুলহিদগণেরও এ দেশ থেকেই উদয় হয়। মোটকথা সর্বপ্রকার বাতেল ফেরকা খোরাসান থেকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বে দ্বীনী ফেতনার রাজত্ব কায়েম করে।

খোরাসানের এই দুর্দিনে ৫৫১ হিজরিতে তার পিতা খাজা গিয়াসুদ্দীন ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক গোলযোগ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে তার কিশোর মন ছিল ব্যথিত। ইতিমধ্যে পিতার ইন্তিকালে আরো মুষড়ে পড়েন। তখন মাতা বিবি নুর-এর তত্ত্বাবধানে তিনি প্রতিপালিত হতে থাকেন। কিন্তু অল্পদিনের ব্যবধানে মাতাও ইন্তিকাল করেন। ফলে জীবন-সংগ্রামে তিনি হয়ে পড়েন সম্পূর্ণ একা।

সুলুকের সূচনা

পিতার ইন্তিকালের পর উত্তরাধিকার হিসাবে একটা বাগান পান। তিনি বাগানের দেখাশোনা ও পানি দেয়ার কাজ করতেন। একবার বাগানে কাজ করছিলেন। ইতিমধ্যে ইবরাহিম কান্দযী নামক এক মাজযুব বাগানে আসেন। তিনি দুনিয়াবিমুখ পবিত্র জীবন-যাপন করতেন। খাজা আজমীরী

www.maktabatulabrar.com

তাকে একটি গাছের ছায়ায় বসান এবং পাকা আঙ্গুরের একটি গুচ্ছ এনে তার হাতে দেন। মাজযুব ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ। ফলে প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে চিনে ফেলেন। তখন নিজের থলে থেকে একটি ফল বের করে চিবিয়ে তাকে দেন। মাজযুবের দেয়া ফল খেতেই তিনি বাগানে একটা নুর দেখতে পান। তাতে তার হালত পরিবর্তন হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বত হয়ে যায়। তিনি তখন বাগান বিক্রি করে ফকিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

প্রথম সফর

তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন। তৎকালে সমরকন্দ ও বুখারা ছিল ইলমের প্রাণকেন্দ্র। তিনি সেখানে পৌঁছে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। তারপর তাফসীর, হাদিস, ফেকাহ ও অন্যান্য ইলমে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। অতঃপর মুরশিদে কামেলের সন্ধানে নিশাপুর ও ইরাকের দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নিশাপুরের অন্তর্গত হারুন নামক এলাকা পড়ে। সেখানে বসবাস করতেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত উসমান হারুনী রহ.। তিনি তার খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি কামেল শায়েখের সন্ধানে ছিলেন। পথিমধ্যে খাজা উসমান হারুনীকে পেয়ে মনে হলো তারচে' অধিক কামেল শায়েখ পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তার খেদমতে তিনি অবস্থান করতে থাকেন। শায়েখের প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাজা উসমান হারুনীও তার কলবী হালত উপলব্ধি করে তাকে অত্যধিক মহব্বত করতেন। অবশেষে খাজা আজমীরীর আবেদনে তাকে বয়াত করেন এবং নিজের হালকায় শামিল করে নেন।

খেলাফত প্রদানের বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী নিজের বয়াতের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন– মজলিসে বরেণ্য শায়েখ ও বিখ্যাত মুরশিদগণ উপস্থিত ছিলেন, আমি আদবের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলাম এবং নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলাম। হযরত মুরশিদ আমাকে আদেশ করেন, দুই রাকাত নামাজ পড়। আমি তৎক্ষণাৎ তার আদেশ পালন করলাম। অতঃপর বলেন, কেবলামুখী হয়ে বস। আমি আদবের সঙ্গে কেবলামুখী হয়ে বসে পড়লাম। তিনি তখন

বলেন, সুরায়ে বাকারা পড়। আমি অত্যন্ত ভক্তিভরে সুরাটি পড়লাম। তিনি পুনরায় আদেশ করেন, ষাট বার সুবহানাল্লাহ পড়। আমি এ আদেশও পালন করলাম। অবশেষে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং আমার হাত ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌছে দিলাম! অতঃপর শায়েখ নিজের তুর্কী টুপি আমার মাথায় পরিয়ে দেন এবং নিজের কম্বলখানি আমার গায়ে জড়িয়ে দেন। তারপর বলেন, বস। আদেশ পাওয়ামাত্র আমি বসে পড়লাম। অতঃপর বলেন, হাজার বার সুরায়ে এখলাস পড়। আমি পড়ে শেষ করলে বলেন, আমাদের শায়েখদের কাছে এটি একদিন ও একরাতের মুজাহাদা। সুতরাং যাও, পূর্ণ একদিন ও একরাত এ মুজাহাদা করতে থাক। আমি শায়েখের নির্দেশমত পূর্ণ একদিন ও একরাত আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও মুজাহাদায় কাটিয়ে দিলাম।

দ্বিতীয় দিন পুনরায় তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি বসতে বললে বসলাম। পরে বলেন, ওপরের দিকে তাকাও। আমি ওপরের দিকে তাকালে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, আরশে মুআল্লা পর্যন্ত। এবার বলেন, নীচের দিকে তাকাও। আমি নীচের দিকে তাকালে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, পাতালপুরী পর্যন্ত। তখন আদেশ করলেন, হাজার বার সুরায়ে এখলাস পাঠ করো। আমি নির্দেশ যথাযথ পালন করলাম। তিনি আবার আদেশ করলেন, ওপরের দিকে তাকিয়ে বলো, কোন্ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ? আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে বললাম, আল্লাহ তাআলার আযমতের পর্দা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। তিন পুনরায় নির্দেশ দিলেন, চক্ষুদ্বয় বন্ধ করো। আমি চক্ষু বন্ধ করলে বলেন, এবার চক্ষু খোল। আমি চক্ষু খুললে তিনি তার দুটি আঙ্গুল আমার চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী দেখতে পাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, আঠার হাজার আলম দেখতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি বলেন, বস, এখন তোমার কাজ সমাধা হয়ে গেছে। অতঃপর সম্মুখস্থ একটি ইটের দিকে ইশারা করে বলেন, এটি উঠাও। আমি উঠাতেই তার নিচে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, এটি নাও এবং দরবেশদের মাঝে বিলিয়ে দাও। আমি তার আদেশ যথাযথভাবে পালন করলাম।

www.maktabatulabrar.com

খাজা উসমান হারুনীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ

হযরত খাজা উসমান হারুনীর দরবারে আড়াই বছর থেকে তিনি বাতেনী কামালাত হাসিল করেন এবং হাকিকতের জ্ঞান অর্জন করেন। এ সময়ে তিনি পীরের নির্দেশে কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদা করেন। এ সম্পর্কে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী বলেন, আমার শায়েখ খাজা আজমীরী প্রথমদিকে কঠিন রিয়াযত ও মুজাহাদা করতেন, যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতো। তিনি একাধারে সাত দিন পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মেসকাল রুটি দ্বারা ইফতার করতেন এবং একটামাত্র চাদর পরিধান করতেন। কখনো ছিঁড়ে গেলে অন্য কাপড় দিয়ে তালি লাগাতেন।

পীর ও মুরশিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি হজের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় পৌছেন। তারপর মদিনা শরিফে গমন করে রসূল সা.-এর রওজায়ে আতহার যিয়ারত করেন। অতঃপর বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে বহু আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শেখ নাজমুদ্দীন কুবরা রহ.। বাগদাদ থেকে সাত মাইল দূরে সানজার নামক স্থানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার কাছে কিছুদিন থেকে বাগদাদে এসে বসবাস শুরু করেন। তখন বাগদাদের খলিফা ছিলেন আল মুস্তানজিদ বিল্লাহ আব্বাসী। আব্বাসী খেলাফত তখন বড়ই সঙ্কটময় অবস্থানে ছিল।

খাজা আজমীরীর যুগে সমগ্র মুসলিম বিশ্বই ছিল সঙ্কটময় অবস্থায়। তা সত্ত্বেও বহু মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ তখন বিদ্যমান ছিলেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন খাজা শামসুদ্দীন তাবরেযী, খাজা শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার, খাজা বাহাউদ্দীন মুলতানী, খাজা যিয়াউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, খাজা ওয়াজিহুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, হযরত আহমদ কবির রেফয়ী, শেখ ইয়াসের, আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী, খাজা মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী, খাজা নেযামুদ্দীন গযনবী, শেখ সা'দী সিরাজী প্রমুখ।

খাজা আজমীরীর মজলিস

বাগদাদে অবস্থানকালে খাজা আজমীরী বাগদাদ জামে মসজিদে প্রতিদিন দরস দিতেন। তাতে ইলম ও মারেফতের ঝর্ণাধারা বইয়ে দিতেন। তাতে অংশগ্রহণ করতেন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বহু আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন শেখ আওহাদুদ্দীন

কেরমানী, শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, শেখ দাউদ কেরমানী, মাওলানা বাহাউদ্দীন বুখারী, শেখ বোরহানুদ্দীন মুহাম্মাদ চিশতী, খাজা আজাল শিরাজী, শেখ জালালুদ্দীন তাবরেযী, শেখ তাজুদ্দীন মুহাম্মাদ ইস্পাহানী, শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ বাগদাদী, মাওলানা এমাদুদ্দীন বুখারী, শেখ আলী সানজারী, শেখ সাইফুদ্দীন নাখরায়ী, শেখ ওয়াহেদ বোরহান গযনবী ও খাজা সুলাইমান আব্দুর রহমান প্রমুখ। এরা অধিকাংশ সময় খাজা আজমীরীর মজলিসে হাজির থাকতেন।

বড় পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ

কোনো কোনো কিতাবে পাওয়া যায়, খাজা আজমীরী শেখ নাজমুদ্দীন কুবরার সঙ্গে সাক্ষাতের পর জিয়াল নামক স্থানে এসে সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎকার হয়েছে কোনো একটি পর্বতের পাদদেশে। সেখানে উভয় বুযুর্গ একাধারে ৫৭ দিন ছিলেন। অতঃপর খাজা আজমীরী বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, পীরের কাছ থেকে খেলাফত লাভ করে তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং পথিমধ্যে সানজার নামক গ্রামে খাজা নাজমুদ্দীন কুবরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর উভয়ে জুদী পর্বতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন হযরত মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানীর সঙ্গে। সেখান থেকে তিনজন একসঙ্গে যান জিলানে। পরে খাজা আজমীরী বাগদাদ এসে বসবাস শুরু করেন।

সোহবতের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ

খাজা আজমীরী বাগদাদ থেকে তাবরিযের দিকে গমন করেন। তৎকালে সেখানে বসবাস করতেন খাজা আবু সাঈদ তাবরিযী। তিনি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত বুযুর্গ ও অলীয়ে কামেল। অল্পদিনেই তিনি তার কাছ থেকে পুরোপুরি ফয়েয হাসিল করেন। তার মাঝে ভ্রমণের আগ্রহ ছিল প্রবল; তাই এখানে অধিক সময় অবস্থান না করে ইস্পাহানের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে শায়েখ মাহমুদ নামে একজন বিখ্যাত অলীয়ে কামেল বসবাস করতেন। তিনি তার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয় বুযুর্গ দীর্ঘক্ষণ মারেফতের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের কাশফ কারামত সম্পর্কেও অবহিত

www.maktabatulabrar.com

হন। তিনি কতদিন শায়েখ মাহমুদের সোহবতে ছিলেন জানা যায় না। পরে তিনি ইস্পাহান থেকে খোরাসানের দিকে যাত্রা করেন।

খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীও তখন ইস্পাহানে অবস্থান করছিলেন। তিনি শায়েখ মাহমুদের হালকায় প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করেন। এমন সময় খাজা আজমীরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ফলে খাজা আজমীরীর গভীর প্রভাব পড়ে খাজা বখতিয়ারের ওপর। যে কারণে তিনি শায়েখ মাহমুদ ইস্পাহানীর হালকায় প্রবেশের ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং খাজা আজমীরীর প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কিছুদিন খাজা আজমীরীর সোহবতে থেকে তালীম ও ফয়েয লাভ করেন। অতঃপর খাজা আজমীরী তাকে নিজের চাদর মোবারক প্রদান করেন এবং মানুষকে হাকিকত ও মারেফতের তালীম দেয়ার অনুমতি দান করেন।

মুরশিদ-প্রদত্ত এ মোবারক খেরকাটি তিনি শ্রেষ্ঠ নেয়ামতরূপে গ্রহণ করেন এবং আজীবন নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক যত্নে রাখেন। ইন্তিকালের সময় এটি প্রদান করেন নিজের প্রিয় খলিফা খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশকরকে। তিনিও ইন্তিকালের সময় চাদরটি হস্তান্তর করেন নিজের প্রিয় খলিফা সুলতানুল আউলিয়া খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়াকে। তার ইন্তিকালের সময় এ মোবারক খেরকাটি হস্তগত হয় খাজা নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহলভীর।

আস্তারাবাদে খাজা আজমীরী

সেকালে শেখ নাসিরুদ্দীন নামে জনৈক অলীয়ে কামেল খোরাসানের আস্তারাবাদে[১] বসবাস করতেন। তার বয়স হয়েছিল ১২২ বছর। খাজা আজমীরী তার কামালিয়াতে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে তার থেকে ফয়েয ও বরকত হাসিল করেন। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বহু শহর নগর পরিভ্রমণ করে হেরাতে এসে পৌঁছেন। যেহেতু কোথাও অবস্থান করতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই সারাদিন ঘোরাফেরা করে রাতের বেলা অলীয়ে কামেল আব্দুল্লাহ আনসারীর মাজারে এসে ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। তখন এশার অজু দিয়ে ফজর আদায় করতেন।

তাকে একাগ্রতার সঙ্গে ইবাদত করতে দেখে দলে দলে লোক এসে তার পাশে ভিড় করে। দিনরাত কখনো তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না।

১. খোরাসানের ইরান অংশে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। বর্তমান নাম গুরগান। আরবিতে বলা হয় জুরজান (جرجان) –সম্পাদক

মানুষের সমাগমে তার ইবাদতে বিঘ্ন হতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হেরাত ত্যাগ করে সাবযাওয়ারের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

খাজা আজমীরীর নেক দৃষ্টির বরকত

সেকালে ইয়াদগার মুহাম্মাদ নামে বদদ্বীন ও বদমেজায এক শাসনকর্তা ছিল সাবযাওয়ারে। রাতদিন সে গানবাদ্য ও নৃত্যগীত নিয়ে মশগুল থাকত, আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন থাকত। সেজন্য শহরের বাইরে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। সেখানে আরো নির্মাণ করেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি হাউজ। খাজা আজমীরী সফরজনিত ক্লান্তির কারণে হাউজের পাশে একটি গাছের ছায়ায় উপবেশন করেন। ক্লান্তি কিছুটা উপশম হলে তিনি হাউজে গোসল করে নামাজ পড়েন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যান।

কিছুক্ষণ পর খবর ছড়িয়ে পড়ে, ইয়াদগার মুহাম্মাদ বাগান পরিভ্রমণে আসছেন। খাদেম দৌড়ে এসে বলল, বাগানের মালিক বেড়াতে আসছেন, সুতরাং আপনি অন্য কোথাও গিয়ে অবস্থান করুন। খাদেমের আতঙ্ক দেখে তিনি মৃদু হেসে বলেন, আমি এখান থেকে উঠব না, তোমার ইচ্ছা হলে ওই গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকো। খাদেম আদেশমত গাছের নীচে গিয়ে বসে পড়ল। ওদিকে শাহী মহলের খাদেমরা এসে খাজা সাহেবের গম্ভীর চেহারা দেখে কিছু বলার সাহস পেল না। বরং তারা খাজা সাহেবের মুসল্লার পাশে ইয়াদগার মুহাম্মাদের জন্য বিছানা পাতল।

মালিক বাগানে এসে তার বিছানার পাশে খাজাকে উপবিষ্ট দেখে যারপরনাই রাগান্বিত হলো। ক্রোধভরে খাদেমকে বলল, এ ফকিরকে এখান থেকে বের করে দাও। একথা শুনে খাজা সাহেব মাথা তুলে তাকালেন এবং তার দিকে গজবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ফলে সে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এ অবস্থা দেখে খাদেমরা খাজা সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল এবং কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমাদের মনিবকে ক্ষমা করুন, তিনি জানতেন না আপনি অলীয়ে কামেল। এদের কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি দেখে খাজা সাহেবের দয়া হলো। তিনি স্বীয় খাদেমকে বললেন, হাউজ থেকে একটু পানি নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে তার মুখে ছিটিয়ে দাও।

খাজা সাহেবের হুকুম পালন করামাত্র ইয়াদগার মুহাম্মাদের চেতনা ফিরে এলো। তখন তার মধ্যে অহংকারের চিহ্নমাত্র ছিল না। উঠেই সে

www.maktabatulabrar.com

খাজা সাহেবের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল এবং খালেস দিলে আরজ করল, হযরত! আমার অপরাধ মার্জনা করুন, আমি পূর্বকৃত সব অপকর্মের জন্য তওবা করছি। খাজা আজমীরী তাকে উঠিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহর মহব্বতের দাবী করা, অথচ তার আনুগত্য না করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে তিনি রসূল সা.-এর বংশধর ইমামগণের ফযিলত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন। ফলে ইয়াদগার মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা কাঁদতে শুরু করে এবং তার হাতে তওবা করে।

উপদেশ শুনে ইয়াদগার মুহাম্মাদ অজু করে দু'রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে। পরে বয়াতের জন্য খাজা সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। খাজা সাহেব তাকে নিজের মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এসব কিছু খাজা সাহেবের নেক দৃষ্টির ফল।

ইয়াদগার মুহাম্মাদ মুরিদ হয়ে তার সমুদয় সম্পদ খাজা সাহেবের খেদমতে নযরানা স্বরূপ পেশ করে। তিনি নিতে অস্বীকার করে বলেন, যে সমস্ত সম্পদ তুমি জোরপূর্বক নিয়েছ সেগুলো মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দাও। পীরের নির্দেশে তিনি সমস্ত জবরদস্তি করে নেয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেন। অবশিষ্ট সম্পদও ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ দুনিয়া-বিমুখ হয়ে পড়েন। এমনকি নিজের স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে খাজা সাহেবের সঙ্গী হয়ে যান। একসময় খাজা সাহেব উপলব্ধি করেন, ইয়াদগার মুহাম্মাদ কামালাতের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন, তুমি এ অঞ্চলে অবস্থান করে মানুষকে হেদায়েত করতে থাক এবং তাদেরকে বাতেনী তালীম দিতে থাক। পীরের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সেখানে থেকে যান। আর খাজা সাহেব অভ্যাসমত সম্মুখে অগ্রসর হন।

বলখে খাজা আজমীরী

সাবযাওয়ার থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি বলখে পৌছেন। সেখানে শেখ আহমদ খাযরেওয়ার বিখ্যাত খানকায় উপস্থিত হন। তৎকালে বলখে হাকিম যিয়াউদ্দীন কালকাসী নামে একজন দার্শনিক ছিলেন। জাহেরী ইলমে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও তাসাওউফে তার বিশ্বাস ছিল না। তিনি সূফী দরবেশদের ঘৃণা করতেন এবং ছাত্রদেরকে নিজের আকিদা অনুযায়ী তালীম দিতেন। কিন্তু খাজা আজমীরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তার ধারণা পাল্টে যায়। তিনি তওবা করে তার মুরিদ হয়ে যান। খাজা সাহেব

তাকে কিছুদিন তালীম তরবিয়ত করে খেলাফত প্রদান করে বিদায় হয়ে যান। অতঃপর ৫৫৮ হিজরিতে তিনি গজনী গমন করেন। তখন গজনী ও বলখের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাতারীদেরকে তখন অপরাজেয় শক্তি মনে করা হতো। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদের সমকক্ষ ছিল না। খাজা আজমীরী গজনীর বিখ্যাত পীর ও অলীয়ে কামেল শেখ আব্দুল ওয়াহেদ গজনবীর সোহবতে থাকেন। পরে গজনী ত্যাগ করে হিন্দুস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন।

হিন্দুস্তানে প্রথম চিশতী শায়েখ

হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য আল্লাহ পাক চিশতী সিলসিলাকে নির্বাচন করেছেন। চিশতী শায়েখদের গায়েবীভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে হিন্দুস্তানের দিকে মনোনিবেশ করার। সর্বপ্রথম যে চিশতী শায়েখ হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন তিনি হলেন খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতী। তার হৃদয় নিঃসৃত দোয়া-মোনাজাত ও বরকতপূর্ণ সোহবত ছিল সুলতান মাহমুদ গজনবীর বিজয়াভিজানের অন্যতম ভরসা। মাওলানা জামী নাফহাতুল উনুস গ্রন্থে লেখেন, সুলতান মাহমুদ যখন সোমনাথের পথে যাত্রা করেন, খাজা আবু মুহাম্মাদকে গায়েবী নির্দেশ দেয় হয়–সুলতানের সাহায্যার্থে যাও! তিনি সত্তর বছর বয়সে কয়েকজন দরবেশকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি নিজেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

হিন্দুস্তানের বিজয়

যেমনিভাবে সুলতান মাহমুদের বিজয়ের পূর্ণতা এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের সংহতি সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর তাকদীরে লেখা ছিল। তেমনিভাবে খাজা আবু মুহাম্মাদের কাজের পূর্ণতা, ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার এবং মজবুত মারকায প্রতিষ্ঠা চিশতী সিলসিলার শায়খুল মাশায়েখ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর তাকদীরে লেখা ছিল।

তবাকাতে নাসিরীর লেখক কাজী মিনহাজুদ্দীন উসমান জূযাজানীসহ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ লিখেন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন যারা আজমীরের গভর্ণর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেছেন এবং হিন্দুস্তানের বিজয় চূড়ান্ত করেছেন। সেই অভিযানে তার দোয়া-মোনাজাত ও রুহানী তাওয়াজ্জুহের ছিল বিরাট

www.maktabatulabrar.com

অবদান। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর হামলার সময় সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ৫৭৬ হিজরী থেকে ৬০২ হিজরী পর্যন্ত সুলতান একের পর এক হামলা করেন। আজমীর ছিল তখন হিন্দু রাজপুত ও হিন্দুধর্মের প্রাণকেন্দ্র। তখন পর্যন্ত ঘোরীর আক্রমণ হিন্দুস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করেনি। তার আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যেটা হিন্দুস্তানের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়।

ভাগ্যনির্ধারণী ঘটনা

পৃথ্বীরাজ কোনো মুসলমানকে (সম্ভবত দরবারের কাউকে কোনো কারণে) শাস্তি দেয়। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ অপমানজনক জবাব দেয় এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, এই লোকটি এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আর বড় বড় কথা বলছে, যা কেউ কখনো দেখেনি, শোনেওনি। পৃথ্বীরাজের একথা শুনে খাজা সাহেব বলেন, আমি তাকে জীবিত গ্রেফতার করে (মুহাম্মাদ ঘোরীকে) দিয়ে দিলাম। এর পরই মুহাম্মাদ ঘোরী হিন্দুস্তানে আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ প্রতিরোধ করেন, কিন্তু হেরে যান।

ঘটনা যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরীর আক্রমণের সময় এবং ইসলামী সাম্রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে হিন্দুস্তানে আসেন এবং হিন্দুস্তানের প্রাণকেন্দ্র, প্রাচীন হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আজমীরকে নির্বাচন করেছেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল তার উঁচু হিম্মত ও ঈমানী শক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ, যা শুধু ধর্মগুরু ও বিশ্ব-বিজেতাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তার ইখলাস, তাওয়াক্কুল, ত্যাগ-কুরবানী ও দরদ-মহব্বত হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলামে পরিণত করে। হাজার বছর ধরে যে জমিন ছিল সহিহ আকিদা-বিশ্বাস, আল্লাহর মারেফত ও একত্ববাদের ব্যাপারে অপরিচিত, সেই জমিন আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিণত হয় ইসলামী উলুম ও দ্বীনী কার্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্ররূপে। তার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয় আজানের সুমধুর সুর, তার পাহাড়-পর্বতে গুঞ্জরিত হয় আল্লাহু আকবার ধ্বনি। তার শহর-নগর মুখরিত হয় কালাল্লাহ ও কালার রসূল আওয়াজে।[১]

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ২৭।

তৎকালে হিন্দুস্তানের অবস্থা

সিয়ারুল আউলিয়ার লেখক অত্যন্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন, তখন পুরো হিন্দুস্তানে ছিল কুফ্‌র শিরকের জয়জয়কার। দুরাত্মারা 'আমিই মহান প্রভু বলে' স্লোগান দিত। আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বে অন্যদের শরিক করত। ইট-পাথর, গাছপালা ও গাভী-গোবরকে সেজদা করত। কুফ্‌রির অন্ধকারে ছিল তাদের অন্তর আচ্ছন্ন। দ্বীন ও শরিয়ত সম্পর্কে সবাই ছিল গাফেল। আল্লাহ ও নবী-রসূল সম্পর্কে ছিল বেখবর। কেউ কেবলার দিক পর্যন্ত চিনত না। আল্লাহু আকবরের আওয়াজও কেউ কখনো শোনেনি। এমন একটি দেশে হেদায়েতের সূর্য খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর পা রাখতেই কুফ্‌রের অন্ধকার ঈমানের নুরে পরিবর্তন হয়ে যায়। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যেখানে ছিল কুফ্‌র শিরকের নিদর্শন সেখানে মসজিদ ও মিম্বর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। যে আকাশ বাতাস শিরকের ধ্বনিতে ছিল মুখরিত তা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। এ দেশে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, কেয়ামত পর্যন্ত যারা এ নেয়ামত লাভ করবে, শুধু তারাই নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মের ছওয়াব খাজা সাহেবের আমলনামায় পৌঁছতে থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পরিধি যত প্রসারিত হবে, সকলের ছওয়াব পৌঁছতে থাকবে শায়খুল ইসলাম মুঈনুদ্দীন হাসান সাজ্‌যীর রুহ মোবারকে।

হিন্দুস্তানে যারাই আল্লাহর নাম নেবে এবং ইসলামের খেদমত করবে, তাদের নেকীর অংশ পাবেন চিশতী সিলসিলার মাশায়েখে কেরাম এবং এর প্রতিষ্ঠাতা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.। মাওলানা গোলাম আলী আযাদ যথার্থই লিখেছেন– এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, চিশতী সিলসিলার বুযুর্গানে দ্বীনের অধিকার রয়েছে হিন্দুস্তানের ওপর। সিয়ারুল আকতাবের লেখক লিখেছেন, হিন্দুস্তানে চিশতী শায়েখদের পদচারণার বরকতে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে এবং কুফ্‌রের অন্ধকার মিটে গেছে।[১]

রাজধানী আজমীর থেকে দিল্লিতে

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর জীবদ্দশায় হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক প্রভাববলয় ও নেতৃত্ব আজমীর থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। আজমীর নিজের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি হারায়। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী দিল্লিতে নিজের জানেশীন ও প্রধান খলিফা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ২৮।

www.maktabatulabrar.com

কাকীকে নিয়োগ করেন। আর নিজের অবশিষ্ট জীবন আজমীরে কাটিয়ে দেন তালীম-তরবিয়ত ও ইবাদত-বন্দেগিতে। তার দাওয়াত-তাবলীগ ও তালীম-তরবিয়তের বিস্তারিত বিবরণ প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তেমন পাওয়া যায় না। শুধু এতটুকু পাওয়া যায়, বহু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এহসানের দৌলত লাভ করেছে।

আবুল ফজল আইনে আকবরীতে লেখেন, তিনি আজমীরে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ইসলামের চেরাগ অত্যন্ত জোশ-জযবার সঙ্গে প্রজ্বলিত করেন। তার আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জুহে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালব্যাপী দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সালেকদের তালীম-তরবিয়তে মশগুল থাকেন। পরে নব্বই বছর বয়সে ৬২৭ হিজরিতে এমন সময় ইন্তিকাল করেন যখন হিন্দুস্তানে তার রোপিত চারা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। এমনকি রাজধানী দিল্লিতে তারই জানেশীন ও তরবিয়তপ্রাপ্ত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী দাওয়াত-তাবলীগ ও তালীম-তরবিয়তে মশগুল ছিলেন। ওদিকে তার ভক্ত মুরিদ সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাস মশগুল ছিলেন ইসলামী হুকুমতের সম্প্রসারণ ও সংহতিকরণে এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও প্রজাপালনে।[১]

ইত্তিবায়ে সুন্নতের প্রেরণা

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. নিজের মালফুজাতে লেখেন– আমি প্রাচীন বুযুর্গদের বহু আলোচনা পড়েছি। সেখান থেকে বুঝতে পেরেছি, তাদের হালাত এমন ছিল না আজ অধিকাংশ শায়েখের হালত যেমন। আজকাল শায়েখদের অবস্থা হলো, তারা ইত্তিবায়ে সুন্নতকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য জরুরী মনে করেন না। তাদের বিশ্বাস হলো, শরিয়ত এক জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অথচ প্রাচীন বুযুর্গদের অবস্থা ছিল, তাকওয়া-তাহারত ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতে তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের জীবন্ত নমুনা। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর ঘটনা পাওয়া যায়। একবার তিনি অজু করার সময় আঙ্গুল খিলাল করা ভুলে গেছেন। তখন গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, নবীর মহব্বতের দাবী করো অথচ সুন্নাত ছেড়ে দাও! তিনি তৎক্ষণাৎ তওবা করেন এবং

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৩০।

ভবিষ্যতে এমনটা করবেন না বলে ওয়াদা করেন। আরো পাওয়া যায়, তার অবস্থা ছিল এমন যে, কোথাও আগুন দেখলে কেঁপে উঠতেন, না জানি কেয়ামতের দিন আগুনের শাস্তি পোহাতে হয়! ইত্তিবায়ে সুন্নাতের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল অবিকল সাহাবায়ে কেরামের মত।

কাশ্‌ফ ও কারামত

এক সফরে তার বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে। সেই সফরে তিনি বহু পীর-মাশায়েখ থেকে ফুয়ুয ও বারাকাত হাসিল করেন। অবশেষে ১০ই মহররম ৫৬১ হিজরিতে আজমীর এসে উপস্থিত হন। সেখানে সর্বপ্রথম মুরিদ হন মীর সাইয়েদ হোসাইন, যিনি প্রথমত শিয়া ছিলেন। তওবা করে তার হাতে বয়াত হন এবং কামাল হাসিল করেন। এরপর অসংখ্য মানুষ তার সিলসিলায় দাখেল হয়। হুজুর সা.-এর নির্দেশে তিনি হিন্দুস্থান আগমন করেন। সম্ভবত আজমীরকে নির্বাচন করেন তারই নির্দেশে। তার আজমীর যাওয়া ও অবস্থানের ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ।

সংক্ষেপে ঘটনাটা হলো–তিনি আজমীর এসে শহরের বাইরে এক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করেন। হঠাৎ প্রহরী এসে আরজ করল, এটা শাহী উটের জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গা, এখান থেকে সরুন। তিনি সেখান থেকে রানাসাগের পুকুরের কাছে চলে যান। সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিকে বাদশার উটগুলো অবশ হয়ে পড়ল, উঠতে পারছিল না। প্রহরী রাজা পৃথ্বীরাজকে গিয়ে পুরো বৃত্তান্ত শোনাল। সঙ্গে একথাও বলল, এখন দরবেশের পা ধরে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজা নিজেও অপমানবোধ করছেন। ফলে জাদুকর দিয়ে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু যে জাদুকর দিয়েই প্রতিরোধ করতে চান সেই খাজা সাহেবের একান্ত ভক্ত হয়ে যায়।

তিনি রানাসাগের পুকুরের পাশে একটা গাভী জবাই করেন। কিন্তু হিন্দুরা তার উপর হামলা করে, পরে পরাজিত হয়ে সবাই ভেগে যায়। এরপর তারা নিজেদের ঋষির কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। ঋষিও কয়েক বার চেষ্টা করে, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। ফলে ঋষিও ইসলাম গ্রহণ করে। অবশেষে অপারগ হয়ে রাজা তার বিরোধিতা ছেড়ে দেন। এদিকে শায়েখও বনজঙ্গল ছেড়ে বসতিতে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর মুজাহাদায় অভ্যস্ত ছিলেন। সত্তর বছর পর্যন্ত রাতে শোননি। তার কামালত বলে শেষ করা যাবে না। এমনকি তার শায়েখও তাকে নিয়ে গর্ব করতেন।

www.maktabatulabrar.com

দানশীলতা

খাজা কুতুবুদ্দীন থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি বিশ বছর যাবত শায়েখের খেদমতে ছিলাম, তিনি কখনো কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। কেউ কিছু চাইলে মুসল্লার নিচে হাত দিয়ে যা পেতেন দিয়ে দিতেন। কোনো পরোয়া করতেন না। তিনি আরো বলেন, আমি বিশ বছরে একবারও তাকে রাগ করতে দেখিনি।

অমিয় বাণী

খাজা আজমীরী বলেন, আল্লাহ পাকের মারেফতপ্রাপ্তির আলামত হলো সে মানুষ থেকে ভোগে যাবে। তিনি আরো বলেন, আহ্‌লে মারেফতের ইবাদত হলো পাস-আনফাস।[১]

আর দুর্ভাগ্যের আলামত হলো, গোনাহে লিপ্ত থেকেও নিজেকে মকবুল মনে করা।

তিনি বলেন, আমি বিশ বছর অক্লান্তভাবে শায়েখের খেদমত করেছি, আমার রাতদিনের কোনো খবর ছিল না। শায়েখ যখন আমার দিকে দৃষ্টি দিতেন, খুশিতে বহু বাতেনী নেয়ামত দান করতেন, যা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, শায়েখের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি খেদমতের বদৌলতে পেয়েছি।

কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, মুরিদ সাবেত কদম (দৃঢ় অবস্থানের অধিকারী) কখন হয়? জবাবে বলেন, ফেরেশতা যদি বিশ বছর তার আমলনামায় কোনো গোনাহ লিখতে না পারে।

কতিপয় মালফুজ

● আশেকের অন্তর মহব্বতের আগুনে জ্বলতে থাকে। তাতে যে খেয়াল আসে সবই ভস্ম হয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায়। কেননা মহব্বতের আগুনের চেয়ে তীব্র কোনো আগুন নেই। স্রোতস্বীনী নদীর আওয়াজ তো শুনেছ, কিন্তু নদী যখন সাগরে মিশে যায় তখন শান্ত হয়ে যায়।

● আমি খাজা উসমান হারুনীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর দোস্ত যদি সামান্য সময়ের জন্য দুনিয়ার পিছনে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায়, তবুও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি খাজা উসমান হারুনীকে আরো বলতে শুনেছি, যার

১. পাস-আনফাস যিকিরের একটি খাস পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মুখ বন্ধ রেখে প্রতিটি শ্বাস টানার আল্লাহু শব্দের 'আল্লা' পর্যন্ত বলা এবং শ্বাস ছাড়ার সময় 'হু' বলা। –সম্পাদক।

মঝে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকবে, নিশ্চিত জানবে সে আল্লাহর দোস্ত। সমুদ্রের মত দানশীলতা, সূর্যের মত দয়ামায়া ও উদারতা এবং জমিনের মত বিনয় ও আনুগত্য।

● ভালো মানুষের সোহবত ভালো কাজ অপেক্ষা উত্তম। আর মন্দ মানুষের সোহবত মন্দ কাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মুরিদ নিজের তওবায় তখনই অবিচল হতে পারে যখন বিশ বছর পর্যন্ত ফেরেশতা কোনো গোনাহ লেখার সুযোগ না পায়।[১]

● তিনি আরো বলেন, আমি খাজা উসমান হারুনীকে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি প্রকৃত ফকির এই নশ্বর পৃথিবীতে যার কিছুই থাকে না। মহব্বতের আলামত হলো, তুমি অনুগত হবে আর ভয় করতে থাকবে, যেন মাহবুব তোমাকে সরিয়ে না দেন।

● আরেফের মর্যাদা বহু উঁচু। সে স্তরে কেউ পৌঁছে গেলে দুনিয়া তার দুই আঙ্গুলের মাঝে চলে আসে অর্থাৎ দুনিয়া তার অধীন হয়ে যায়।

● আরেফ হলেন তিনি যিনি যা চান তৎক্ষণাৎ পেয়ে যান। যার সঙ্গে কথা বলেন জবাব শুনতে পান। মহব্বতের ক্ষেত্রে আরেফের সর্বনিম্ন স্তর হলো, সত্য ও সততার গুণ তার মাঝে পয়দা হবে। আর মহব্বতের ক্ষেত্রে আরেফের সর্বোচ্চ স্তর হলো, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু দাবী করলে নিজের কারামতের শক্তিতে তাকে গ্রেফতার করে নেন। আমরা বছরের পর বছর সাধনা করেছি, কিন্তু আল্লাহভীতি ছাড়া কিছুই পাইনি।

● গোনাহ তোমার ততটা ক্ষতি করবে না মুসলমান ভাইয়ের সম্মানহানির কর্ম তোমার যতটা ক্ষতি করবে।

● নফসের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা আহলে মারেফতের আসল কাজ। হক শেনাসির আলামত হলো, সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং মারেফতের বিষয়ে চুপ থাকা।

● যতক্ষণ পর্যন্ত মারেফত অনুভব না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মারেফতের আরেফ হতে পারে না।

১. পূর্বেকার বুযুর্গানে দ্বীনও এমন কথা বলেছেন। পরবর্তী সূফীগণ অবশ্য এর মতলব বয়ান করেন এভাবে, মুরিদের জন্য আবশ্যক হলো সর্বদা তওবা-ইস্তিগফার করতে থাকা। কেননা তওবা-ইস্তিগফার করতে থাকলে গোনাহ লেখা হয় না। এতে এটা আবশ্যক হয় না যে, তার দ্বারা কোনো গোনাহ হতে পারবে না। এজন্যই অসিয়্যত করা হয়েছে, শোয়ার সময় সর্বদা তওবা-ইস্তিগফার করবে, যাতে আল্লাহর অনুগ্রহে সারা দিনের গোনাহ লিপিবদ্ধ না হয়।–লেখক

www.maktabatulabrar.com

● আরেফ হলেন যিনি দিল থেকে গাইরুল্লাহকে বের করে একাকী হয়ে যান। কেননা প্রকৃত বন্ধু একজনই হন।

● বদবখতির আলামত হলো, গোনাহ করতে থাকা আবার আল্লাহর দরবারে মাকবুল হওয়ার আশা করতে থাকা। আরেফের আলামত হলো, চিন্তিত থাকা এবং চুপ থাকা।

● মানুষ যে নেয়ামত পায় দানশীলতার জন্য পায়।

● দরবেশ হলো যার কাছে মানুষ নিজের প্রয়োজন পেশ করলে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। আরেফ মূলত আল্লাহর মহব্বতে বিভোর থাকেন।

● পৃথিবীতে সবচে' উত্তম বিষয় হলো, দরবেশগণের পরস্পর মেলামেশা। আর সবচে' মন্দ বিষয় হলো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ থাকবে।

● প্রকৃত তাওয়াক্কুল হলো, মানুষের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট পেলে কারো কাছে না বলা, কষ্টের অভিযোগ না করা।

● প্রকৃত আরেফের আলামত হলো, যিনি সর্বদা পেরেশান থাকেন, মৃত্যুর প্রতি আগ্রহী থাকেন, আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করেন এবং আল্লাহ পাকের জিকিরে বিভোর থাকেন।

● বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক নিজের দোস্তদেরকে নিজের নুর দ্বারা জিন্দা রাখেন। সবচে' ভালো মুহূর্ত হলো, অন্তর যখন ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত থাকে।

● ইলম এক অথৈ সমুদ্র, মারেফত তারই একটি নদী। ইলম আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য আর মারেফত বান্দার বৈশিষ্ট্য।

● আরেফ সূর্যের মত সমস্ত দুনিয়াকে আলোকিত করেন। তার আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য তখন লাভ করে যখন পরিপূর্ণ নিবেদিত হয়ে নামাজ পড়ে। কারণ নামাজ মুমিনের মেরাজ। (আখবারুল আখয়ার, পৃ. ৪৪)[১]

১. অনেকে 'নামায মুমিনের মেরাজ'– এ কথাটিকে হাদীছ মনে করে, অথচ এটি হাদীছ নয়। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. এ কথাটি হয়তো এ অর্থে বলেছেন যে, মেরাজে যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছেছিলেন, তদ্রূপ মুমিনও নামাযের সময় আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে থাকে। যদিও মেরাজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আল্লাহর নৈকট্য লাভ আর নামাযে মুমিনের আল্লাহর নৈকট্য লাভের ধরন ও কাইফিয়াতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।–সম্পাদক

ইন্তিকাল

সুলতান আলতামাশের যুগে তিনি ইন্তিকাল করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন, ৬ই রজব সোমবারে তিনি ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ৩০শে জিলহজ, তবে প্রথম মতটি সঠিক। তার মৃত্যুসন নিয়ে কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৬, ৬৩৭ হিজরী ইত্যাদি বহু অভিমত পাওয়া যায়। তার হায়াত নিয়েও আছে কঠিন মতবিরোধ। কেউ বলেন, তিনি ৯৬ বছর হায়াত পেয়েছেন। কেউ বলেন ১০৪ বছর, কেউ বলেন ১০৭ বছর। জনশ্রুতি আছে, তার ইন্তিকালের পর কপালে এই লেখা ফুটে ওঠে حبيب الله مات في حب الله 'আল্লাহর হাবিব আল্লাহর মহব্বতে চলে গেছেন।'

তাকে আজমীরে সমাধিস্থ করা হয়। তার কবর ছিল ইটের তৈরী। পরে তার ওপর পাথরের বাক্সের মত বানানো হয়। ফলে তার মাজার দেখতে কিছুটা উঁচু মনে হয়। তার কবরে সর্বপ্রথম ইমারত বানান খাজা হোসাইন নাগুরী। পরে মন্দুর শাসকরা খানকার দরজা তৈরী করেন। তার মালফুজাত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী 'দলিলুল আরেফীন' নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[১]

(১৭) হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার উপাধী কুতুবুদ্দীন। নাম বখতিয়ার। আফগানী ভাষায় কাকী বলা হয় রুটিকে। তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত বুযুর্গ। তার বংশক্রম কয়েক সূত্রে ইমাম জাফর সাদেক পর্যন্ত পৌছে। মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের আউশ নামক এলাকায় ৫৮২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও মধ্যরাতে জন্ম হয়েছে, কিন্তু নুরের এমন বর্ষণ হয়েছে যে, দিন বলে ভ্রম হচ্ছিল। দেড় বছর বয়সে পিতার স্নেহছায়া মাথার ওপর থেকে উঠে যায়। পরে মা-ই তাকে লালন-পালন করেন। পাঁচ বছর বয়সে মক্তবে ভর্তি হন। মাওলানা আবু হাফস আউশীর কাছে ইলম অর্জন করেন। পরে বাগদাদে সফর করেন। সেখানে খিজিরে তরিকত খাজা আজমীরীর সোহবত লাভ করেন এবং তার তত্ত্বাবধানে সুলুকের পথে কামাল অর্জন করেন।[২]

১. আখবারুল আখইয়ার ও তারিখে মাশায়েখে চিশত অবলম্বনে।
২. নুযহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৪।

www.maktabatulabrar.com

তালীম-তরবিয়ত

দেড় বছর বয়সে পিতা সাইয়েদ কামালুদ্দীন আহমদ ইবনে সাইয়েদ মুসা ইন্তিকাল করেন। ফলে মায়ের কাছে তিনি প্রতিপালিত হন। পাঁচ বছর বয়সে মা তাকে একসাথীর সঙ্গে শিক্ষকের কাছে পাঠান। রাস্তায় এক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সাথী বলল, মক্তবে নিয়ে যাচ্ছি। বুযুর্গ বলল, ওকে আমার হাতে দিয়ে দাও, আমি শিক্ষকের কাছে বসিয়ে দেবো। সাথী তাকে বুযুর্গের হাতে সোর্পদ করে দিল। তিনি তাকে খাজা আবু হাফস আউশীর খেদমতে নিয়ে যান। গিয়ে বলেন, মহান আল্লাহর নির্দেশে ছেলেটিকে যত্নের সঙ্গে পড়াও! একথা বলে তিনি চলে যান। উস্তাদ তাকে অত্যন্ত স্নেহভরে বলেন, তোমার বড় সৌভাগ্য, হযরত খিজির আ. তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করে গেছেন!

কেউ কেউ লিখেছেন, খাজা কুতুবুদ্দীন যখন আউশে পৌছেন তখন তার বয়স ছিল চার বছর চার মাস। তিনি জাহেরী ইলম অর্জনের জন্য উস্তাদের খেদমতে হাজির হন। উস্তাদ শ্লেটে কিছু লেখার ইচ্ছা করলে গায়েবী আওয়াজ এলো, তাকে ইলম শেখানোর দায়িত্ব কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরীর। ফলে উস্তাদ শ্লেটখানি রেখে দেন। পরে কাজী হামিদুদ্দীন সাহেবের কাছে তিনি পবিত্র কুরআন খতম করেন। তালীমুদ্দীন কিতাবে ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়েছে। সেখানে আছে, গায়েবী আওয়াজের পর কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরী চোখের পলকে সেখানে পৌছে যান। শ্লেট নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে কুতুবুদ্দীন! কী লিখব? সে জবাব দিল, লিখুন–
سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا

কাজী সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথায় শিখেছ? সে জবাবে বলল, 'আমি পনেরো পারা আম্মাজানের কাছে পড়েছি।' পরে চার দিনে কুরআন মাজিদ খতম করে ফেলেন। তারপর অতি দ্রুত উলুমে জাহেরী থেকেও ফারেগ হয়ে যান।

খেলাফত লাভ ও দিল্লি আগমন

সিয়ারুল আউলিয়া ও সিয়ারুল আকতাবের বর্ণনামতে তিনি ৫২২ হিজরির রজব মাসে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। সে হিসাবে তার জন্ম ৫০৫ হিজরী মোতাবেক ১২২৭ খৃস্টাব্দে। সমরকন্দ, গজনী, বাগদাদ ও আজমীর হয়ে তিনি দিল্লি পৌছেন। তখন হিন্দুস্তানের

শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাস। তিনি ছিলেন খাজা আজমীরীর একনিষ্ঠ ভক্ত।

ভবিষ্যতে যার হাতে হেদায়েতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে তিনি ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দীর ঐতিহাসিক ও বরকতপূর্ণ মসজিদে খেলাফত লাভ করেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বহু আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ। পরে তিনি হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং শায়েখের নির্দেশে দিল্লিতে অবস্থান করেন। যেটা ছিল ক্রমবিকাশমান ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী। হিন্দুস্তান একদিকে উঁচু হিম্মতওয়ালা মুসলিম রাজা-বাদশাদের সমাদরের কারণে এবং অন্যদিকে তাতারীদের ক্রমাগত আক্রমণের কারণে বড় বড় আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের আশ্রয়কেন্দ্র পরিণত হয়। সমগ্র ইসলামী বিশ্বের জ্ঞানীগুণী ও মনীষীগণ সেখানে সমবেত হন।

বয়াত ও ইরশাদ

একবার খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ইস্পাহানে গমন করেন এবং শায়েখ মাহমুদের হালকায় প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করেন। ইতিমধ্যে খাজা আজমীরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ফলে খাজা আজমীরীর গভীর প্রভাব পড়ে তার ওপর। তিনি তখন শায়েখ মাহমুদ ইস্পাহানীর হালকায় প্রবেশ হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং খাজা আজমীরীর প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কিছুদিন খাজা আজমীরীর সোহবতে থেকে তালীম ও ফয়েয লাভ করেন। তখন খাজা আজমীরী তাকে নিজের চাদর মোবারক প্রদান করেন এবং লোকদেরকে হাকিকত ও মারেফতের তালীম দানের অনুমতি প্রদান করেন। মুরশিদ প্রদত্ত এ মোবারক খেরকাটি তিনি শ্রেষ্ঠ নেয়ামতরূপে গ্রহণ করেন এবং আজীবন নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক যত্নে রাখেন। ইন্তিকালের সময় এটি প্রদান করেন নিজের প্রিয় খলিফা খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশকরকে। তিনিও ইন্তিকালের সময় চাদরটি অর্পণ করেন নিজের প্রিয় খলিফা সুলতানুল আউলিয়া খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়াকে। তার ইন্তিকালের সময় এ মোবারক খেরকাটি হস্তগত হয় খাজা নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহলভীর।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন, ৫ই রজব মসজিদে আবুল লাইসে তিনি খাজা আজমীরীর হাতে বয়াত হন এবং ১৭ বছর বয়সে খেলাফত লাভে ধন্য হন। তিনি ছিলেন খাজা আজমীরীর প্রথম খলিফা।

www.maktabatulabrar.com

পরে শায়েখের নির্দেশে দিল্লিতে অবস্থান করেন। শোনা যায়, রসূল সা. আলমে আরওয়াহে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, কুতুবুদ্দীন আল্লাহর দোস্ত, তাকে খেলাফত দাও। দিল্লির বেলায়েতও আল্লাহ পাকের নির্দেশে দেয়া হয়। শায়েখের দরবারে তার প্রথম হাজিরা ৫৮৪ হিজরির রমজানের প্রথম দিকে হয়েছে। এতে বুঝা যায়, তার জন্ম হয়েছে আরো আগে।

হালত ও গুণাবলী

তিনি ছিলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর প্রধান খলিফা এবং পুরো হিন্দুস্তানে মহান বুযুর্গ হিসাবে প্রসিদ্ধ। দুনিয়া-ত্যাগ ও অভাব-অনটনে জীবন যাপন করতেন। সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে সম্বিত ফিরে পেতে কিছুক্ষণ লেগে যেতো। পরে কথাবার্তা বলতেন। আগন্তুকের কথা শুনে জবাব দিয়ে বলতেন, আমাকে ক্ষমা করুন! পরে আবারো আল্লাহর স্মরণে মশগুল হয়ে যেতেন। তার কোনো সন্তান মারা গেলেও তৎক্ষণাৎ অনুভব করতে পারতেন না। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য অনুভব করতে পারতেন।

বর্ণিত আছে, প্রথম যুগে খাজা কুতুবুদ্দীনের ঘুমের প্রাবল্য ছিল। ফলে মাঝেমধ্যে কিছু সময়ের জন্য চোখ বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু শেষ জীবনে এ অবস্থা আর থাকেনি। তখন ঘুম চলে গিয়েছিল।

শায়েখ মুহাম্মাদ নুর বখশ নিজের কিতাব সিলসিলাতুয যাহাবে লেখেন, বখতিয়ার আওশী ছিলেন একজন জবরদস্ত বুযুর্গ ও ইবাদতগুজার। খলওয়াত ও জলওয়াতে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। কম খেতেন, কম ঘুমাতেন এবং কম কথা বলতেন। তার বাতেনী হালত ও মুকাশাফা ছিল বহু উঁচু।[১]

মামুলাত ছুটে গেছে বলে

প্রতি রাতে তিনি অন্যান্য মামুলাতের সঙ্গে তিন হাজার বার দুরুদ শরিফ পড়তেন। একবার নতুন বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদকে অগ্রাধিকার দিলেন। ফলে তিন দিন দুরুদ পড়তে পারেননি। তার খাদেম আনিস আহমদ স্বপ্নে দেখে, একটা বিশাল আলীশান মহল। বাইরে বিরাট মজমা, কিন্তু ভিতরে কেউ যাচ্ছে না। একজন বেঁটে খাটো বুযুর্গ কেবল ভিতরে বাইরে আসা-যাওয়া করছেন। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, মহলে

১. আখবারুল আখইয়ার।

স্বয়ং হুজুর সা. বসে আছেন। আর এই বেঁটে লোকটা হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। তিনি বাইরের লোকদের পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছেন। আনিস আহমদ যিয়ারতের আগ্রহ প্রকাশ করে অনুমতি প্রার্থনা করেন। নির্দেশ এলো, তুমি এখনো যিয়ারতের উপযুক্ত হওনি, তবে কুতুবুদ্দীকে আমার সালাম বলো। আর বলো, তিন দিন ধরে তোমার হাদিয়া পাচ্ছি না।

খাজা কুতুবুদ্দীন দৈনিক একশ রাকাত নফল পড়তেন। প্রায়ই ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকতেন। কেউ এলে দীর্ঘক্ষণ বুঝতে পারতেন না, কে এসেছে। তার কাশফ কারামাত ছিল অনেক।

শায়েখ কাকীর জনপ্রিয়তা

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাস শায়েখকে যথাযোগ্য সমাদর করতেন। কিন্তু তিনি রাজ-দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা পছন্দ করতেন না। এমনকি সুলতানের পেশকৃত জায়গিরও কবুল করেননি। প্রথমে কিলোখ-ড়িতে পরে মালিক ইজ্জুদ্দীনের মসজিদের পাশে ফকিরানা জীবন যাপন করেন। সুলতান প্রায় ভক্তিভরে তার দরবারে উপস্থিত হতেন। তার ভক্তি-শ্রদ্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, এমনকি শহরবাসীও তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা তার এতই ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে, শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দীন সুগরা পর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং তার কার্যকলাপে আপত্তি তোলেন।

একবার খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী নিজের খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দিল্লি আসেন। খাজা সাহেবের পুরনো বন্ধু শায়েখ নাজমুদ্দীন সুগরা তার কাছে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর ব্যাপারে অভিযোগ করেন। খাজা সাহেব তখন নিজের প্রিয় মুরিদকে বলেন, বাবা বখতিয়ার! এত দ্রুত তুমি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছ যে, আল্লাহর বান্দারা এখন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করছে। সুতরাং তুমি আজমীর চলো এবং সেখানে অবস্থান করো। আমি তোমার সামনে খাদেমের মত দাঁড়িয়ে থাকব। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী তখন উঁচু হিম্মত ও পূর্ণ ইখলাসের সঙ্গে যথার্থ পদক্ষেপ নেন। শায়খুল ইসলামের অসন্তুষ্টি দূরে থাক আল্লাহর পথের পথিকরা

www.maktabatulabrar.com

মানুষের সামান্য অভিযোগও গোনাহ মনে করেন। তাছাড়া তিনি ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে ফেতনা-ফাসাদ পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তাকে কোমলভাবে বলেন, এখানকার আহলে ইলম তোমার অতুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানে না, তাতে কি, আমি তো জানি! এখানে তো খাদেম মাখদুম ও শায়েখ মুরিদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; তুমি চলো, সেখানে একদম মাখদুম হয়ে থাকবে আর আমি হবো খাদেম।

খাজা কুতুবুদ্দীন তখন যথার্থ জবাবই দিলেন যা একজন অনুগত মুরিদ দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, হযরত! আমি তো আপনার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নই, বসার সাধ্য কোথায়? খাজা তাকে আজমীর চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আর তিনিও আপত্তি না করে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু শহরের বাইরে যেতেই শায়েখ বুঝতে পারেন, তার এই জনপ্রিয়তা আল্লাহ প্রদত্ত, এতে অহংকারের কিছু নেই। তিনি এটাও বুঝতে পারেন, তার প্রিয় মুরিদ দিল্লিবাসীকে নিজের আশেক বানিয়ে নিয়েছে।

খাজা কুতুবুদ্দীন আপন শায়েখের সঙ্গে আজমীর রওয়ানা হন। এ কথা শুনে দিল্লি শহরে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাসসহ শহরবাসী বেরিয়ে পড়ে। তার পিছনে পিছনে চলতে শুরু করে। যেখানে খাজা সাহেবের পা পড়ে সেখানকার মাটি বরকতময় মনে করে উঠিয়ে নেয়। লোকেরা অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে এবং আহাজারি করতে থাকে। শায়েখ মুঈনুদ্দীন চিশতী ভাবলেন, এক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয়া কীভাবে জায়েয হতে পারে? সুতরাং নিজের প্রিয় মুরিদকে আজমীর নেয়ার সিদ্ধান্ত তিনি মুলতবি করেন। তিনি বলেন, বখতিয়ার! তুমি এখানেই থাকো। তুমি চলে গেলে আল্লাহর এতগুলো বান্দা কষ্ট পাবে। আমি এটা কখনো জায়েয মনে করি না। এতগুলো আত্মায় কষ্ট দিয়ে তোমাকে নেয়া ঠিক হবে না। যাও, এই শহর আমি তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাস শায়েখের শুকরিয়া আদায় করেন, যার রাজধানী এই অমূল্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। খাজা কুতুবুদ্দীন

দিল্লিতে ফিরে আসেন আর খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীর ফিরে যান। খাজা সাহেব দিল্লিতে ফিরে নিজের চাটাইয়ে বসে তালীম ও তরবিয়তের কাজ শুরু করেন জোরদারভাবে।[১]

তিনি রাজ-দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না, শুধু এতটুকু নয়, এটাকে তিনি নিজের উসুল বানিয়েছেন, বরং সিলসিলার উসুল বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার মুরিদদের বলে দিয়েছেন, দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে নির্মোহভাবে জীবন যাপন করবে, রাজ-দরবার থেকে দূরে থেকে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেবে। এতটা নির্মোহতা সত্ত্বেও আম-খাস, আমীর-ফকির সব তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যায়।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাস সপ্তাহে একবার খাজা সাহেবের দরবারে হাজিরা দিতেন এবং নিজের ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। দিল্লি শুধু হিন্দুস্তানের রাজধানী ছিল না, বরং দিল্লি ছিল ইসলামী বিশ্বের নতুন শক্তিকেন্দ্র এবং দাওয়াত ও তাজদীদের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামী বিশ্বের সুযোগ্য উলামায়ে কেরাম, বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখ ও শ্রেষ্ঠতম মেধাগুলো সেখানে সমবেত হয়েছেন। ইসলামের প্রচার-প্রসার, আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও নতুন বিকশিত ইসলামী সাম্রাজ্যের দিক-নির্দেশনা, এসব দায়িত্ব নিশ্চয় বড় নাযুক ও কঠিন। তাছাড়া নিজের নির্মোহতায় কোনো প্রভাব যেন না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হতো। সেজন্য প্রয়োজন ছিল পাহাড়ের অটলতা ও বাতাসের তীব্র গতির, যাতে পদস্খলন না হয়। খাজা সাহেব অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিপুণভাবে সেই গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। এজন্য অবশ্য তিনি দীর্ঘ সময় পাননি। শায়েখের ইন্তিকালের পর বড় জোর চার পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু তার মাধ্যমে হিন্দুস্তানে চিশতী সিলসিলা শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং যে মহান উদ্দেশ্যে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী হিন্দুস্তানকে নির্বাচন করেছেন সেটা শত বছরের জন্য নিরাপদ হয়ে গেছে।[২]

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৩৩।
২. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৩২।

www.maktabatulabrar.com

কাকী নামকরণের কারণ

তার উপাধী কাকী হওয়ার কারণ হলো, তিনি যখন দিল্লিতে থাকতেন কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। সর্বদা ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকতেন। তখন তার কাছে কোনো গোলাম বা বাঁদিও ছিল না। শরফুদ্দীন নামে এক মুসলিম দোকানদার ছিল তার সঙ্গী। তার স্ত্রী মাঝেমধ্যে শায়েখের স্ত্রীর কাছে আসত। একবার শায়েখের বাসায় খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। দু'এক ওয়াক্ত উপাসও চলেছে। শায়েখের স্ত্রী সেই মহিলা থেকে অর্ধ টেনকা বা কমবেশি ঋণ নেন। একদিন মহিলা শায়েখের স্ত্রীকে বলল, আমি যদি ঋণ না দিতাম তাহলে তো তোমরা ক্ষুধায় মরেই যেতে। কথাটা স্ত্রীর অপছন্দ হলো। তিনি অঙ্গীকার করলেন, ভবিষ্যতে কখনো ঋণ নিবেন না। একদিন স্ত্রী কথাটা স্বামীর কাছেও বলে দেন। শায়েখ কিছুক্ষণ ভেবে বলেন, তার কাছ থেকে আর কখনো ঋণ নেবে না। পরে একটা তাকের দিকে ইশারা করে বলেন, প্রয়োজন পড়লে বিসমিল্লাহ বলে সেখান থেকে রুটি বের করবে। আর যাকে ইচ্ছা দিয়ে দেবে। পরে তিনি সেখান থেকে কাক বের করতেন এবং বণ্টন করে দিয়ে দিতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, তার পাশে একজন রুটিওয়ালা বসবাস করত। প্রথম দিকে তিনি তার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চলতেন। তিনি বলে দিতেন, ঋণ ত্রিশ ধরম হওয়া পর্যন্ত দিবে, এরপর আর দিবে না। একবার কিছুটা সচ্ছলতা এলে তিনি ঋণ আদায় করে দেন। পরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, ভবিষ্যতে আর কখনো ঋণ করবেন না। আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতে এর পর থেকে জায়নামাজের নিচে একটি করে রুটি পেতেন। তাতে পরিবারের সবার খোরাক হয়ে যেতো। লোকটির মনে হলো খাজা সাহেব হয়ত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তাই ঋণ নেন না। ফলে নিজের স্ত্রীকে খাজা সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দেন প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য। এদিকে খাজা সাহেবের স্ত্রীও আসল ঘটনা বলে দেন। ফলে সেদিন থেকে রুটি আসা বন্ধ হয়ে যায়।[১]

১. আখবারুল আখইয়ার।

বখতিয়ার কাকী সম্পর্কে খাজা আজমীরী

খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী নিজের কিতাব দলিলুল আরিফীনে লেখেন, একবার জুমার দিন আজমীরের জামে মসজিদে আমার পীর ও মুরশিদ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর পদধূলি নেয়ার তৌফিক হয়। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বহু দরবেশ ও পীর-মাশায়েখ। মালাকুল মওতের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। আমার পীর ও মুরশিদ বলেন, মৃত্যু ব্যতীত দুনিয়ার রতি বরাবর মূল্য নেই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, কেন? শায়েখ বলেন, মৃত্যু একটা সেতু যা হাবিবকে হাবিবের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। পরে বলেন, বন্ধুত্ব এমন জিনিস যা জবান দিয়ে নয়, বরং অন্তর দিয়ে পূরণ করা উচিত। যেসব জিনিসের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক সেগুলো ছেড়ে দাও, দেখবে, তোমরা আরশের দিকে উঠে যাচ্ছো।

তিনি আরো বলেন, আরেফের দৃষ্টান্ত হলো জ্বলন্ত সূর্যের মত, যার আলোতে পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়। পরে বলেন, হে দরবেশগণ! আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে, আমরা তাই এখানেই সমাধিস্থ হবো। কিছুদিনের মধ্যে আমরা আখেরাতের সফর করব। পরে শায়েখ আলী সানজারীকে সম্বোধন করে বলেন, কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর নামে হুকুমনামা জারী করে দাও– সে যেন দিল্লি চলে যায়! সেখানকার দায়িত্ব আমরা তাকে অর্পণ করছি।

হুকুমনামা লেখার পরে সেটা আমাকে অর্পণ করেন। আমিও সন্তুষ্টচিত্তে শায়েখের নির্দেশ মাথা পেতে নেই। পরে শায়েখ বলেন, আমার কাছে এসো। আমি নিকটে গেলে নিজের টুপি পাগড়ি খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দেন। খাজা উসমান হারুনীর লাঠি দেন আমার হাতে। এ ছাড়াও পাগড়ি, কুরআনে কারিম, জায়নামায ও জুতো মোবারক দিয়ে বলেন, এসব রসূল সা.-এর আমানত। চিশতী খাজাদের মাধ্যমে আমার হাতে পৌছেছে। তুমি এগুলো জারী রাখবে যেন কেয়ামতের দিন শায়েখদের সম্মুখে আমাকে লজ্জিত হতে না হয়। আমি শায়েখের সব নির্দেশ অম্লান বদনে মেনে নিলাম। পরে দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। এরপর আমার পীর ও মুরশিদ আমার চেহারা আসমানের দিকে ফিরিয়ে হাত ধরে বলেন, যাও, আল্লাহর হাওয়ালা; আমি তোমাকে তোমার মাকামে পৌছে দিয়েছি!

পরে ইরশাদ করেন, মানুষের সম্মান ফুটে ওঠে চারটি বিষয়ে। প্রথমত দুঃখ-দারিদ্র সত্ত্বেও সচ্ছলতার ভান করায়। দ্বিতীয়ত ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও তৃপ্ত দেখানোয়। তৃতীয়ত দুঃখ-দুশ্চিন্তায়ও খুশি থাকায়। চতুর্থত শত্রুদের

www.maktabatulabrar.com

সঙ্গেও বন্ধুত্ব দেখানোয়। পরে বলেন, যেখানেই যাবে মনস্তাপে ভুগবে না। যেখানে থাকবে বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে থাকবে।'

খাজা কাকী বলেন, পরে আমি দিল্লি এসে বসবাস শুরু করলাম। দিল্লির সমস্ত আমীর-উমারা ও সাধারণ জনগণ আমার দিকে রুজু করল। দিল্লি আসার চল্লিশ দিনও হয়নি ইতিমধ্যে একজন দূত এসে খবর দিল–আপনি আজমীর থেকে আসার বিশ দিন পর্যন্ত শায়েখ জীবিত ছিলেন। পরে ইন্তিকাল করেন।

ইন্তিকালের কারণ

ইন্তিকালের পূর্বে ঈদের দিন তিনি ঈদগাহ থেকে ফিরছিলেন একটা এমন ময়দান দিয়ে যেখানে কোনো কবর বা আবাদি ছিল না। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। কোনো খাদেম আরজ করল, আজ ঈদের দিন, বহু মানুষ আপনার অপেক্ষায় আছে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তিনি বলেন, এখান থেকে আমি দিলের ঘ্রাণ পাচ্ছি। পরে জমিনের মালিককে ডেকে নিজস্ব অর্থে তা ক্রয় করেন এবং সেখানে দাফন করার অসিয়্যত করেন।[১]

বর্ণিত আছে, শায়েখ আলী সানজারীর খানকায় একদিন মজলিস গরম ছিল। মজলিসে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীও ছিলেন। আলী সানজারী হলেন শায়েখ মুঈনুদ্দীন চিশতীর প্রিয়পাত্র এবং খাজা বখতিয়ার কাকীর সাথী। তার মাযারও খাজা সাহেবের মাজারের পাশে। কাওয়াল মজলিসে শায়েখ আহমদ জামের গজল পড়ছিলেন। যখন এই শের পড়লেন–

گشتگان خنجر سلیم را * ز زبان ازغیب جای دیگر است

খাজা সাহেব ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। একাধারে চারদিন পর্যন্ত শেরের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকেন। অবশেষে পঞ্চম রাতে বেঘোর অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। ঘটনাটি ঘটেছে ১৪ই রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরী মোতাবেক ১২৫৬ খৃস্টাব্দে। ৫০, ৫২ অথবা ৭৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। পরে দিল্লির কসবায়ে মহর অলীতে তাকে দাফন করা হয়। সেখানে তার মাজার অবস্থিত। তার কবর দীর্ঘদিন ছিল কাঁচা। ইমারত গম্বুজ কিছুই ছিল না। ৯৪৮ হিজরিতে ইমারত ও গম্বুজ বানানো হয়। সে বছরই ১৪ই শাবান সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাসও ইন্তিকাল করেন।

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৩৬।

জানাযার অসিয়্যত

তার ইন্তিকাল হলে দিল্লির সুলতান খাজা শামসুদ্দীন আলতামাস তাকে গোসল দেন। পরে তার বিশিষ্ট খলিফা খাজা আবু সাঈদ তিবরিযী শায়েখের অসিয়্যতের কথা শোনান–আমার জানাযা পড়াবে সেই ব্যক্তি যে কখনো হারাম কাজে অগ্রসর হয়নি; যার কখনো আসরের সুন্নাত কাজা হয়নি, আবার তারবীরে উলা ছোটেনি। একথা শুনে সবাই নীরব নিস্তব্ধ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দীর্ঘক্ষণ পর সুলতান আলতামাস অগ্রসর হয়ে বলেন, আমি চাইতাম না কেউ আমার হালত জানুক, কিন্তু শায়েখ আমার হালত জাহের করে দিলেন।

হযরত থানবী রহ. নিজের এক মালফুজে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুর সময় শায়েখ অসিয়্যত করে বলেন, আমার জানাযা সেই ব্যক্তি পড়বে সারা জীবনেও যার দৃষ্টি গায়র মাহরামের ওপর পড়েনি। জানাযায় বড় বড় আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ উপস্থিত ছিলেন। সবাই পেরেশান, এমন বুযুর্গ কোথায় পাওয়া যাবে? সবাই যখন হতাশ হয়ে পড়ল তখন বাধ্য হয়ে সুলতান আলতামাস সামনে অগ্রসর হলেন। আফসোস করে বললেন, ভাইয়েরা আমার! শায়েখ যদি অসিয়্যত না করতেন তাহলে কখনো আমি নিজেকে প্রকাশ করতাম না। কিন্তু শায়েখ যখন পর্দা ফাঁস করে দিলেন, তখন বলতেই হয়, আল্লাহ পাক আমাকে এ নেয়ামত দান করেছেন। পরে তিনি শায়েখের জানাযা নামাজ পড়ান।[১]

শায়েখের খলিফা ছিল অনেক। অন্তত বাইশ জনের নাম কিতাবে পাওয়া যায়। তবে তার সিলসিলা শুধু তিনজনের মাধ্যমে জারি থাকে। খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার, শায়েখ বদরুদ্দীন গজনবী ও শাহ খিজির কলন্দর। এছাড়াও খাজা শামসুদ্দীন আলতামাশ যিনি ছিলেন দিল্লির প্রসিদ্ধ সুলতান, তিনিও ছিলেন হযরতের বিখ্যাত খলিফা।[২]

(১৮) সুলতানুল আরেফীন শেখ ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার আজুধানী রহ.

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী ছিলেন হিন্দুস্তানে চিশতী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা আর খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার ছিলেন সেই সিলসিলার মুজদ্দিদ ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তার দু'জন বিশিষ্ট খলিফা সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নেজামুদ্দীন দেহলভী ও শায়েখ আলাউদ্দীন আলী সাবেরী পীরানে

১. আল কওলুল জলীল।
২. আখবারুল আখইয়ার।

www.maktabatulabrar.com

কিল্য়ারীর মাধ্যমে চিশতী সিলসিলা হিন্দুস্তানে বিস্তার লাভ করে। আজো তাদের খলিফা ও সাথী-সঙ্গীদের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে এই সিলসিলা জারি আছে।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার নাম মাসউদ, উপাধী ফরিদুদ্দীন। পিতার নাম শায়েখ জামালুদ্দীন, যিনি ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভাগিনা। তার বংশ-পরিক্রমা দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. পর্যন্ত পৌঁছে। তার দাদা কাজী শোয়াইব হালাকু খাঁর যুগে নিজের পিতৃভূমি কাবুল ছেড়ে লাহোরে চলে আসেন। সেখানকার কাজী মানসুর যিনি কাবুলে ইলম অর্জন করেছেন তিনি দিল্লির বাদশাকে তার ব্যাপারে অবগত করেন। ফলে সেখান থেকে সরকারী চাকরির প্রস্তাব আসে, কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। পরে তিনি মুলতানে চলে যান। দিল্লির বাদশা মুলতানের শাসকের কাছে পয়গাম পাঠান। ফলে তিনি তার কাছে জায়গির গ্রহণের আবেদন করেন। তিনি আবেদন কবুল করে মুলতানের খোটোয়ালের জায়গীর গ্রহণ করেন। অতঃপর সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

পিতা শেখ জামালুদ্দীন ছিলেন ইলম ও রুহানিয়াতে কামেল বুযুর্গ। তিনি মুলতানের মাওলানা ওয়াজিহুদ্দীন খাজান্দীর কন্যা মারয়াম বানুকে বিয়ে করেন। তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিন পুত্র ও এক কন্যা যথাক্রমে–ফরিদুদ্দীন মাসউদ, আযযুদ্দীন মাহমুদ, নাজিবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল ও বিবি হাজেরা। পীরানে পীর সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানীর প্রপৌত্র শেখ আব্দুর রহিমের বিয়ে হয় বিবি হাজেরার সঙ্গে। বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন খাজা মাখদুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কিল্য়ারী।

খাজা বখতিয়ার কাকী মুলতানে ৫৮৪, ৫৮৫ বা ৫৬৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সেখানেই বেড়ে ওঠেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। জন্মের চতুর্থ কি পঞ্চম বছর মা তাকে মক্তবে পাঠিয়ে দেন। সেখানে মাওলানা সাইয়েদ নাজির আহমদ সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এগার বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। তখনই তিনি স্বীয় উস্তাদ ও মায়ের সঙ্গে হজ্জ করতে যান।

পবিত্র মক্কা থেকে ফিরে মা তাকে উচ্চশিক্ষার জন্য মুলতানে পাঠিয়ে দেন। মুলতান ছিল হিন্দুস্তানের সবচে' বড় ইলমী ও দ্বীনী মারকায। সেখানে বহু মসজিদ মাদরাসা এবং সুবিজ্ঞ আলেম-উলামা ছিল। শহরের বিশিষ্ট উস্তাদগণের নিকট তিনি দ্বীনী ইলম অর্জন করেন। পিতৃহীন বাবা ফরিদ বহু কষ্টে ইলম অর্জন করেন। সেখানে তিনি কাজিবাচ্চা নামে খ্যাত ছিলেন। তখন থেকেই তার হৃদয়ে আল্লাহ-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যায়। ফলে তিনি সর্বদা চিন্তামগ্ন ও ভাবাতুর থাকতেন। লোকেরা তাকে আল্লাহর পাগল মনে করত।

একবার শায়েখ জালালুদ্দীন তাবরিযী মুলতানে আসেন। সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করেন মুলতানের বুযুর্গদের সম্বন্ধে। লোকেরা তাকে কাজীবাচ্চার ঠিকানা বলে দেয়। তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি কাজিবাচ্চাকে একটি আনার দেন, অতঃপর সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপের পর বিদায় নেন। বাবা ফরিদ আনারটি ভেঙ্গে উপস্থিত লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেন। বণ্টনকালে একটি দানা মাটিতে পড়ে যায়। তিনি তা উঠিয়ে নেন এবং তার দ্বারা ইফতার করেন। আনারের রস পেটে পড়ামাত্রই তার অন্তরে দেখা দেয় অপূর্ব এক আলোকোদ্ভাস। তিনি এর কারণ বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন।

শায়েখের সন্ধান লাভ

কুতুবুল আকতাব খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী তখন মুলতানে অবস্থান করতেন। একদিন বাবা ফরিদ মসজিদে বসে আন-নাফে' নামক তাসাওউফের একটি জটিল কিতাব পড়ছেন। এমন সময় একজন বুযুর্গ মসজিদে উপস্থিত হন। তিনি একটি অপরিণত বালকের হাতে আন-নাফে' কিতাব দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী কিতাব পড়? বাবা ফরিদ তার দিকে তাকিয়ে বলেন, আন-নাফে'। তিনি মৃদু হেসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, এটি তোমার কী উপকারে আসবে? এবার প্রশ্নকর্তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার অন্তরে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হলো। তিনি উত্তরে বলেন, জি না, এ কিতাব আমার কোনো উপকারেই আসছে না, তবে আপনার স্নেহদৃষ্টি পেলে উপকার হতে পারে। এ কথা বলে তিনি বুযুর্গের পায়ে পড়ে যান। অতঃপর বুযুর্গ তাকে স্নেহভরে হাত ধরে উঠান।

বাবা ফরিদ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মহান নামটি কি জানতে পারি? বুযুর্গ বলেন, আমার নাম কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার। তিনি তখন আবদার

www.maktabatulabrar.com

করে বলেন, আপনি কি দয়া করে কিতাবটি আমাকে পড়িয়ে দেবেন! তিনি বলেন, আমি মাওলানা মিনহাজুদ্দীন তিরমিযীর মসজিদে অবস্থান করছি, তুমি সেখানে এসো। এরপর থেকে বাবা ফরিদ সেখানে গিয়ে আন-নাফে' কিতাবটি পড়তে থাকেন।

কিছুদিন পরে খাজা বখতিয়ার মুলতান থেকে দিল্লি যাত্রা করেন। বাবা ফরিদ তার খেদমতের জন্য সঙ্গে যাওয়ার আবদার করলে বলেন, দ্বীনী ইলম সমাপ্ত করে তুমি আমার কাছে এসো। বে-ইলম দরবেশ শয়তানের ক্রীড়নক হয়ে থাকে।

মসজিদে অবস্থানকালে একদা বাবা ফরিদ তাকে সেই আনার বীজের ক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে কুতুবুল আকতাব বলেন, প্রতিটি আনারে একটিমাত্র বীজ থাকে আল্লাহর নুরে পরিপূর্ণ। সেটি দিয়ে ইফতার করেছ বলে তোমার অন্তর আল্লাহর নুরে উদ্ভাসিত হয়েছে।

যে কাজীবাচ্চাকে শায়েখ জালালুদ্দীন তাবরিযী আনার প্রদান করেছেন, আন-নাফে' কিতাব অধ্যয়নকালে যার প্রতি কুতুবুল আকতাবের দৃষ্টি পড়েছে, আজলে শিরাজী যাকে 'লঙ্গরে আলম' উপাধি দিয়েছেন, শায়েখ সাইফুদ্দীন বাখোরযী যার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, ছেলেটি যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হবে, তার রুহানী সন্তানে দুনিয়া ভরে যাবে, শায়খুশ শুয়ুখ খাজা শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী যাকে স্বরচিত কিতাব আওয়ারেফুল মায়ারেফের কিছু অংশ পড়িয়েছেন, খাজা কুতুবুল আকতাব যাকে 'বাবা' সম্বোধন করতেন, খাজা আজমীরী যাকে 'শাহবাজ' বলতেন এবং নিজের সিলসিলার 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, সর্বশেষ সুলতানুল মাশায়েখ বাদায়ুনী যাকে 'শায়খে কাবির' উপাধিতে ভূষিত করেছেন, শায়খ সাবের কিল্য়ারী নিতান্ত আদবের সঙ্গে যাকে 'শায়েখ' বলতেন, ইনি খাজা ফরিদুল হক ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার নামে পরিচিত। তিনি নিজের সিলসিলার প্রবর্তক এবং দ্বিতীয় আদম নামে খ্যাত।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কান্দাহার গমন করেন। সেখানে মাওলানা সাইয়েদ নাজির আহমদ বুখারীর নিকট ৫৯৩ হিজরী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তবে মাঝে মধ্যে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য খোটোয়ালে আসতেন। মা তাকে সর্বদা লেখাপড়ায় উৎসাহ দিতেন। তিনি ফেকাহ ও হাদিস শাস্ত্রে পূর্ণ বুৎপত্তি লাভ করেন। সঙ্গে উত্তম গুণাবলী তার স্বভাবে পরিণত

হয়। তিনি তখন উপলব্ধি করেন, পীর ও মুরশিদের নির্দেশ যথাযথ পালিত হয়েছে।

শিক্ষা সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরলে মা খুবই খুশি হন। এমনকি শুকরিয়া-স্বরূপ তিনি বহু নামাজ পড়েন এবং দান-খয়রাত করেন। চোখের মণি পুত্রের জন্য আন্তরিক দোয়া মোনাজাত করেন। মায়ের আনন্দে পুত্রের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। তিনি দিল্লি গিয়ে মুরশিদের খেদমতে হাজির হওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু মাতা তাকে বোঝান, ইলমকে আমলে রূপান্তরিত করতে পারলেই কামেল লোকের দৃষ্টিতে তোমার ইলম গণ্য হবে প্রকৃত ইলম বলে। আর ইলম তখনই নিরাপদ হবে যখন তোমার মন থেকে সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, ইয়াকিন পয়দা হবে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার শক্তি লাভ হবে। ইলমের সারমর্ম হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কীভাবে লাভ করা যায় বুঝতে পারা। তখন সমস্ত অজুহাত ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা নিরর্থক হয়ে যাবে।

দেশ ভ্রমণ

মায়ের উপদেশ তার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সেখানকার পীর-মাশায়েখের সোহবত লাভের ইচ্ছা করেন, যেন ইলমকে আমলে রূপান্তরিত করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

প্রথমে তিনি বাগদাদে পৌঁছেন এবং শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর দরবারে হাজির হন। শায়েখ তাকে স্বরচিত আওয়ারেফুল মাআরেফের কিছু অংশ নিজে পড়ান। শায়েখের সোহবতে থেকে ভরপুর ফয়েয ও বরকত হাসিল করেন। অতঃপর পুনরায় দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন। এবার বদখশান, দামেশক, নিশাপুর, গজনী, শাম, বুখারা, বাইতুল মুকাদ্দাস ও মুলতান প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মাশায়েখে কেরামের সোহবত ও ফয়েয লাভ করেন। বিশেষত শায়েখ আওহাদুদ্দীন, খাজা মুহাম্মাদ সিস্তানী, শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ, শায়েখ শিহাবুদ্দীন যিন্দাসী, খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার, খাজা আজল শিরাজী, শায়েখ সাইফুদ্দীন বাযোরবী ও শায়েখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। অবশেষে হজ্জে বাইতুল্লাহ এবং রওজা পাকের যিয়ারত সমাপন করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

www.maktabatulabrar.com

দেশে ফিরে মায়ের কদমবুছী করেন। মা স্নেহের পুত্রকে পেয়ে আবেগে কোলে টেনে নেন। পরে ভ্রমণজনিত কষ্টে পুত্র শুকিয়ে গেছে দেখে সান্ত্বনাস্বরূপ বলেন, সফর জাহান্নামের নমুনা, তবে সফর সফলতা লাভের উপায়। সুতরাং এই কষ্ট, দুর্বলতা সে তুলনায় কিছুই নয়। আল-হামদুলিল্লাহ, এই সফরে তুমি সফলতা লাভ করেছ এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছ। কিছুদিন মায়ের খেদমতে থাকার পর একসময় মা-ই বলেন, এখন তুমি মুরশিদের খেদমতে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছ।

বয়াত ও খেলাফত লাভ

মায়ের নির্দেশে তিনি দিল্লিতে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তার মুবারক হাতে বয়াত হন। শায়েখ তার অবস্থানের জন্য গজনীনের দরজার পাশে একটা জায়গা নির্বাচন করে দেন। সেখানে তিনি যিয়ারত ও মুজাহাদায় মশগুল থাকেন। সুলুকের তাকমীলের পর খেলাফত লাভেও ধন্য হন। পরে শায়েখের অনুমতি সাপেক্ষ হাসিতে চলে যান। যেটা ছিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরে প্রধান খলিফা শায়েখ জামালুদ্দীন খতিবে হাসুবীর বাড়ি।

শায়েখের জানেশীন

শায়েখের ইন্তিকালের সময় তিনি হাসিতেই ছিলেন। ইন্তিকালের তৃতীয় দিন দিল্লিতে পৌঁছেন এবং শায়েখের মাজারে সুরা ফাতেহা পড়েন। শায়েখের অসিয়্যত মোতাবেক কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরী শায়েখের জামা ও অন্যান্য আমানত তার হাতে অর্পণ করেন। এটা কেমন যেন শায়েখের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রমাণ। তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়ে সেই জামা পরিধান করেন এবং শায়েখের জায়গায় বসেন।

শায়েখের জানেশীন হওয়ার তৃতীয় দিন। সেদিন হাসি থেকে তার এক পুরনো ভক্ত তার আকর্ষণে দিল্লি চলে আসেন। খাদেমগণ তাকে ভিতরে যেতে বাধা দেয়। ভক্তবৃন্দ ও খাদেমদের অত্যধিক ভিড়ে সেই ভক্ত সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছেন না। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। একদিন শায়েখ বাইরে আসেন। সুযোগ পেয়ে তিনি শায়েখের পায়ে পড়ে যান এবং কেঁদে কেঁদে বলেন, যতদিন আপনি হাসিতে ছিলেন কোনো রকম বাধা ছাড়াই সাক্ষাৎ করতে পারতাম। আজ এখানে আমাদের মত গরীবদের সাক্ষাতের কোনো সুযোগ নেই। একথায় শায়েখের দিলে অত্যন্ত চোট লাগল। তিনি

বুঝতে পারলেন, এটা গায়েবী সতকবার্তা। বাস্তবেই দিল্লিতে নিশ্চিন্তে বসবাস করা এবং জনগণের সাক্ষাতের সুযোগ নেই। অথচ তিনি নিজের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি তখনি ভক্তকে বলেন, ঠিক আছে, চলো, আমি হাসিতে চলে যাবো। উপস্থিত লোকেরা আরজ করল, শায়েখ কুতুবুদ্দীন তো আপনাকে এখানে বসিয়ে গেছেন? আপনি কীভাবে চলে যাবেন? তিনি বলেন, পীর সাহেব নিজের আমানত দিয়ে গেছেন, চাই আমি শহরে থাকি বা মরুভূমিতে, সেটা আমার এখতিয়ার।[১]

মানুষের ভিড় অপছন্দ করতেন

হাসিতে বসবাস এজন্য পছন্দ করতেন, কারণ সেখানে নির্বিঘ্নে গুমনাম হয়ে থাকা যায়। অবশ্য সেখানেও খাজা কুতুবুদ্দীনের এক মুরিদ মাওলানা নুর তুর্ক হাসিবাসীকে তার অতুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। ফলে সেখানেও তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে যান। মানুষ ভিড় করতে শুরু করে। ফলে তিনি খোটোয়ালে চলে যান এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন, যেটা ছিল তার প্রাচীন বসতি। খোটোয়াল মুলতানের নিকটে। সেখানেও তার অতুচ্চ মর্যাদা ও প্রসিদ্ধির কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তিনি আজুধানকে নির্বাচন করেন বসবাসের জন্য। তিনি বলেন, সেখানকার মানুষ সহজে কারো ভক্ত হয় না, আবার জায়গাও অপরিচিত। কিন্তু সেখানেও তিনি পরিচিত হয়ে যান এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ ভিড় করতে শুরু করে। তার প্রসিদ্ধি ও সম্মানের সূর্য ছিল তখন মধ্যগগণে। সেই কিরণ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর আশেকদের অন্তর উষ্ণ করে তিনি টেনে আনেন। কিছুদিনের মধ্যে আগন্তুকের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, খানকায় সর্বদা ভিড় লেগে থাকত, মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকত দরজা।[২]

দুঃখ-দারিদ্র

প্রথম দিকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র ও কৃচ্ছতার মধ্যে জীবন যাপন করেন। পিলু বৃক্ষের ফল সেদ্ধ করে তাতে লবণ ছিটিয়ে দেয়া হতো ভক্তদের মাঝে। তিনি নিজেও খাদেম ও মেহমানদের সঙ্গে তাই খেতেন। কিন্তু আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও নির্মোহতা ছিল এমন যে, একবার

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৩৮।
২. প্রাগুক্ত।

www.maktabatulabrar.com

ইফতারের সময় মুখে লোকমা উঠিয়ে বলেন, খাবারে মনে হচ্ছে অনিয়ম হয়েছে? খাদেম আরজ করল, লবণ ছিল না, তাই এক পট লবণ ধার করে এনেছি। শায়েখ বলেন, তুমি অনিয়ম করেছ, আমার জন্য এ খাবার খাওয়া ঠিক নয়। অথচ কিছুদিন পর অবস্থা এমন হলো যে, রাতদিন রান্নাবান্না চলত, অর্ধরাত পর্যন্ত চলত খাওয়া-দাওয়া। যেই আসত দস্তরখানে বসে যেত, নেয়ামতের ভাগ পেত।[১]

জাহের ও বাতেনে কোনো পার্থক্য ছিল না

সকলের সঙ্গে তিনি স্নেহ-মমতার আচরণ করতেন এবং একই রকম আচরণ করতেন। খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন, শায়েখের আধ্যাত্মিক শক্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল বড়ই অদ্ভুত। অনেকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। যিনি এই মাত্র এসেছেন, আর যিনি বহু বছরের সাথী সবার সঙ্গে একই রকম আচরণ করতেন। সবার দিকে একইভাবে মনোযোগ দিতেন।

মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক বলেন, আমি ছিলাম শায়েখের খাস খাদেম, যা বলার আমাকে বলতেন। খালওয়াত ও জালওয়াতে তার একই হালত ছিল। জাহের ও বাতেনে কোনো পার্থক্য ছিল না। বহু বছর খেদমত করা সত্ত্বেও কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি।

একবার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের সৈন্যবাহিনী–যারা তার আউচ ও মুলতানে সফরসঙ্গী ছিল– খাজা সাহেবের সাক্ষাতে আজুধানে এলো। হযরত খাজা নেজামুদ্দীন ঘটনাটা এভাবে ব্যক্ত করেন– সৈন্যদের ভিড় ছিল অত্যাধিক, যা সামলানো মুশকিল। অবশেষে খাদেমগণ এ পন্থা অবলম্বন করেন, খাজা সাহেবের জামার আস্তিন ওপর তলা থেকে ঝুলিয়ে দেন। সৈন্যরা দলে দলে আসত আর সেটা চুমো খেয়ে চলে যেতো। অবশেষে অস্তিন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি মসজিদে আসেন এবং খাদেমদের বলেন, আমার চারপাশে বেষ্টনি দিয়ে রাখো, কেউ যেন বেষ্টনির ভিতরে আসতে না পারে। লোকেরা আসত, বেষ্টনির বাইরে থেকে সালাম করে বিদায় নিত। হঠাৎ এক বৃদ্ধ ফরাস বিক্রেতা বেষ্টনি ভেদ করে ভিতরে চলে এলো এবং শায়েখের পায়ে পড়ে গেল। পায়ে চুমো খেয়ে বলল, শায়েখ ফরিদ, বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছো! আল্লাহ পাকের

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৩৯।

নেয়ামতের শুকরিয়া আরো বেশি করো! এ কথা শুনে শায়েখ তাকবীর দিয়ে ওঠেন। পরে ফরাস বিক্রেতাকে বহু আপ্যায়ন করেন এবং ওজরখাহি করেন।[১]

জায়গির গ্রহণ করেননি

সুলতান নাসিরুদ্দীন নিজে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু নায়েবে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবান বলেন, আমাদের সঙ্গে সৈন্য অনেক আর আজুধান একটা পানি ও তৃণলতাহীন এলাকা। অনুমতি হলে আমি নিজে শায়েখের দরবারে উপস্থিত হই এবং জাঁহাপনার পক্ষ থেকে ওজরখাহি করে হাদিয়া পেশ করি? সেমতে তিনি কিছু নগদ অর্থ আর চারটি গাঁয়ের জায়গির নিয়ে উপস্থিত হন। নগদ অর্থ ও জায়গির পেশ করলে শায়েখ বলেন, এটা আবার কি? গিয়াসউদ্দীন বলবান বলেন, কিছু নগদ অর্থ আর জায়গিরের ফরমান। শায়েখ মুচকি হেসে বলেন, অর্থ দিতে পারেন, কিন্তু ফরমান নিয়ে যান। সেটা নেয়ার বহু লোক আছে। একথা বলে তিনি সব অর্থ তখনি দরবেশদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন শায়েখের সঙ্গে অত্যন্ত ভক্তিমূলক সম্পর্ক রাখতেন। দিল্লির সালতানাতকে মনে করতেন শায়েখের দোয়া ও মহব্বতের ফলশ্রুতি। শায়েখের খাদেমদের খেদমতকে মনে করতেন বিরাট সৌভাগ্য।[২]

অদ্ভুত সুপারিশনামা

হযরত খাজা ফরিদ একবার এক লোকের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে একটা সুপারিশনামা লিখে দেন। পড়ে দেখুন, কী অদ্ভুত সুপারিশনামাঢ় 'আমি এই লোকের ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালা এবং তার পর আপনার নিকট পেশ করছি। আপনি যদি তাকে কিছু দেন তাহলে প্রকৃত দাতা আল্লাহ তায়ালাই হবেন আর আপনি হবেন শুকরিয়ার উপযুক্ত। আর যদি না দেন তাহলে প্রতিবন্ধক আল্লাহ তায়ালাই হবেন আর আপনি হবেন অপারগ।'[৩]

সমকালীন আলেমগণের সঙ্গে সম্পর্ক

সমকালীন বিখ্যাত আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। তিনি তাদেরকে যথাযথ সমাদর ও ভক্তিশ্রদ্ধা

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪০।
২. প্রাগুক্ত।
৩. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪১।

www.maktabatulabrar.com

করতেন। শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী ছিলেন সিলসিলায়ে সোহরাওয়ার্দীয়ার বিখ্যাত শায়েখ, রুহানী ইমাম ও মহান দায়ী। আর তিনি ছিলেন তার সমসাময়িক, বরং সমবয়সী। উভয়ের মাঝে ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। পরস্পরে ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশ করতেন এবং অকৃত্রিম ভাষায় চিঠি লিখতেন। শায়েখ ফরিদুদ্দীন শায়েখ বাহাউদ্দীনকে 'শায়খুল ইসলাম' বলে সম্বোধন করতেন। উভয়ের মুরিদগণও ছিলেন পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। একে অন্যের মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। শায়খুল ইসলামের পৌত্র শায়েখ রুকনুদ্দীন আবুল ফাতাহ এবং হযরত খাজার প্রিয়তম খলিফা সুলতানুল মাশায়েখ নেজামুদ্দীন আউলিয়ার মাঝে ছিল অত্যন্ত মহব্বত ও ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক।

হযরত খাজা ফরিদুদ্দীনের আসল পুঁজি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি নিখাঁদ প্রেম। যার মাধ্যমে তিনি খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া ও শায়েখ আলাউদ্দীন আলী সাবেরীর মত মহান আশেকে এলাহী ও মানবদরদীদের তরবিয়ত করেছেন। এরা ছিলেন আজুধানের সেই ইশকের দোকানের সেরা পণ্য।[১]

হালত ও গুণাবলী

তিনি ছিলেন খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর প্রধান খলিফা। এমনকি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর সোহবতও তিনি লাভ করেছেন। হিন্দুস্তানের শীর্ষস্থানীয় পীর ও বুযুর্গ ছিলেন। সর্বদা রিয়াজত-মুজাহাদা ও দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে জীবন যাপন করতেন। আবার কাশফ-কারামত, তাওয়াক্কুল-নির্মোহিতায় ও জওক-মহব্বতে ছিলেন অতুলনীয়। সর্বদা নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেন। এক শহর থেকে অন্য শহরে ভ্রমণ করতেন। অবশেষে আজুধানের পাকপটনে বসতি স্থাপন করেন। কারণ সেখানকার বাসিন্দারা ছিল বদমেজাজী ও বস্তুপূজারী। বিশেষত পীর-বুযুর্গদের সঙ্গে শত্রুতা করত। তিনি সেখানে গিয়ে বলেন, এই স্থান আমার বসবাসের উপযুক্ত।

তিনি সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেখানকার কেউ তাকে চিনত না। এলাকার বাইরে ছিল কারির বৃক্ষ। তারই ঘন ছায়ায় বসে আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। পাশের মসজিদে নামাজ পড়তেন এবং

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪১।

রিয়াজত-মুজাহাদা করতেন। সেখানেই তার সন্তানাদি হয়। কখনো ক্ষুধা অনাহারে থাকতেন। যেহেতু ছিলেন রুহানিয়াতের উঁচু স্তরে, তাই গোপন থাকতে পারেননি।

বর্ণিত আছে, একবার তার কাপড় পুরনো হয়ে ছিঁড়ে যায়। এক লোক তার খেদমতে একটা জামা নিয়ে আসে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা পরিধান করেন। পরে খুলে পাশে উপবিষ্ট শায়েখ নাজিবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলকে দিয়ে দেন। পরে বলেন, যে স্বাদ আমি পুরনো জামা পরে পাই, সেটা নতুন জামাতে নেই।

বর্ণিত আছে, হযরত গাঞ্জেশাকার প্রায়ই শরবত পান করে রোজা খুলতেন। এক গ্লাস শরবত তার সামনে পেশ করা হতো যাতে সামান্য মুনাক্কা থাকত। গ্লাসের অর্ধেক, বরং দুই তৃতীয়াংশ তিনি উপস্থিত লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। বাকিটা নিজে পান করতেন। কেউ চাইলে অবশ্য তাকেও দিতেন। তারপর ঘিয়ে ভাজা রুটি তার সামনে পেশ করা হতো। তিনি এক টুকরো খেয়ে বাকিটা উপস্থিত লোকদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। পরে দস্তরখানে আনা হতো বিভিন্ন রকম খাবার, যা সকলে খেতো, কিন্তু তিনি পরের দিন ইফতার পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। শোয়ার সময় সেই কম্বল বিছিয়ে নিতেন, দিনের বেলায় যার ওপর বসতেন। কম্বলটি এত ছোট ছিল যে পা বেরিয়ে থাকত।[১]

শায়েখ সম্পর্কে খাজা নেজামুদ্দীনের অভিমত

হযরত খাজা নেজামুদ্দীন একদিনের ঘটনা বর্ণনা করেন। শায়খে কাবির খাজা ফরিদুদ্দীন কামরায় ছিলেন। খালি মাথা, বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল। অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন আর এই শের আবৃত্তি করছেন–

خواہم کہ ہمیشہ دروفائے تو زیم ☆ خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم
مقصود من خستہ زکونین توئی ☆ از بہر تو میرم از برائے تو زیم

'আমার একমাত্র তামান্না আপনার হয়ে বেঁচে থাকব। মাটি হয়ে যাবো, আপনার কদমের নিচে জীবন কাটিয়ে দেব। আমি অসহায়ের উভয় জগতের তামান্না একমাত্র আপনি। আপনার জন্যই বেঁচে আছি। আপনার জন্য মরতে পারি।'

এই শের পড়ে কামরায় পায়চারি করতেন। কখনো সেজদায় চলে যেতেন আবার পড়তেন আবার সেজদায় চলে যেতেন। দীর্ঘক্ষণ তার এই অবস্থা ছিল।

১. আখবারুল আখইয়ার ৪৭।

www.maktabatulabrar.com

তার মাঝে আল্লাহ-ভীতি ছিল প্রবল। মজলিসে উপদেশমূলক কোনো কথা শুনলে বা প্রেমমূলক কোনো শের পড়া হলে অথবা কোনো বুযুর্গের মর্মস্পর্শী ঘটনা শুনলে অনিচ্ছায় কেঁদে ফেলতেন। অনেক সময় হেঁচকি তুলে কাঁদতেন। সর্বদা রোজা রাখতেন। কুরআন শরিফ হেফজ করা ও তেলাওয়াতের আকর্ষণ ছিল প্রবল। নিজের খলিফা ও মুরিদদের বিশেষভাবে তাকিদ করতেন রোজা রাখার এবং তেলাওয়াত করার। সেমা শোনারও বড় আগ্রহ ছিল। কেউ আপত্তি করে বলল, এ ব্যাপারে তো উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! একজন জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে আর অন্যজন মতানৈক্য করছে!

সিয়ারুল আউলিয়া নামক কিতাবে আছে, খাজা নেজামুদ্দীন আরো বলেন, শেষ জীবনে ইন্তিকালের আগে শায়েখে আলমের দুঃখ-দারিদ্র দেখা দেয়। একবার আমি রমজান মাসে শায়েখের কাছে ছিলাম। এত অল্প খাবার আসত যে, উপস্থিত লোকদের পক্ষে যথেষ্ট হতো না। তখন কোনো রাতেই আমি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারিনি। আর খাবারও ছিল নিতান্ত মামুলি ধরনের। আমি যখন বিদায় নিচ্ছি শায়েখ আমাকে খরচের জন্য একটা সুলতানি দেন। হঠাৎ মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান–আজ থেকে যাও, আগামীকাল যেও। ইফতারির সময় হলে শায়েখের ঘরে খাওয়ার মত কিছুই ছিলো না। জানতে পেরে আমি শায়েখের কাছে গিয়ে আরজ করলাম, হযরতের কাছ থেকে আমি একটা সুলতানি পেয়েছি, অনুমতি হলে এর মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করি। তিনি অনুমতি দেন এবং দোয়া করেন।[১]

ক্ষমতাশীনদের সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন

তার সারা জীবনের উসুল ছিল– ক্ষমতাশীনদের সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন; নিজের হালত গোপন করতেন এবং দরবেশানা জিন্দেগি যাপন করতেন। নিজের শায়েখদের রীতিনীতি ভালোভাবে জেনে তাতে অটল থাকতেন এবং তরিকার প্রচার-প্রসারের রহস্য জেনে তাতে অবিচল থাকতেন।

তার পীরভাই শায়েখ বদরুদ্দীন গজনবী ছিলেন খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর অন্যতম খলিফা। তিনি কোনো কোনো রাজকর্মচারীর

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪৩।

সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন। এমনকি তারা তার জন্য দিল্লিতে খানকা তৈরি করে দেয় এবং তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

কালের আবর্তে আমীর একবার রাজরোষের শিকার হন। ফলে শায়েখও পড়েন কঠিন মুসিবতে। তিনি তখন শায়খে কাবিরের কাছে দোয়ার আবেদন করেন। জবাবে শায়খে কাবির বলেন–'যে নিজের পছন্দমত পথে চলবে সে অবশ্যই এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে। সর্বদা অস্থির বেচাইন থাকবে। আপনি তো পীরানে পাকের খলিফা, তবুও কেন তার নীতির পরিপন্থী খানকা নির্মাণ করেছেন? কেন তাতে আসর জমিয়ে বসেছেন? খাজা কুতুবুদ্দীন ও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর তো এই নীতি ছিল না? তারা তো খানকা খুলে দোকান জমিয়ে বসেননি? তাদের নীতি ছিলো গুমনাম হয়ে থাকা।'

শায়খে কাবিরের এই স্বভাবপ্রবণতার কারণে জনগণের বিপুল আনাগোনা সত্ত্বেও এবং আমীর-উমারাদের ভক্তি-ভালোবাসা সত্ত্বেও ইন্তিকালের পূর্বে দুঃখ-দারিদ্রের জীবন শুরু হয়।[১]

মায়ের কারামত

শায়েখ নেজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন, শায়খের আম্মাজান একবার নামাজ পড়ছিলেন। ঘটনাক্রমে ঘরে চোর এলো। চোরের দৃষ্টি শায়েখের আম্মাজানের ওপর পড়তেই সে অন্ধ হয়ে গেল। সে তখন চিৎকার করে বলল, যদিও আমি চুরি করতে এসেছি, ফলে অন্ধ হয়ে গিয়েছি, কিন্তু এখন অঙ্গীকার করছি, আর কখনো চুরি করব না। শায়খের বয়স তখন ছয় বছর। তিনি দোয়া করলে সে সুস্থ হয়ে গেল। আল্লাহর ফযলে চোর সকালে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে এলো এবং মুসলমান হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ নাম ধারণ করে শেষ জীবন পর্যন্ত শায়খের খেদমতে কাটিয়ে দিল।

হযরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া আরো বলেন, শায়েখ ফরিদ্দুদ্বীন গাঞ্জেশাকার প্রায়ই বর্তনে রুটি রেখে খেতেন। ইফতারের সময় বর্তনে করে দু'এক টুকরো অবশ্যই তার সামনে আনা হতো।

শায়েখ ফরিদুদ্দীন মাহমুদ বলেন, আমি দীর্ঘদিন শায়খে কাবিরের বর্তনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। যে রাতে আমরা শায়খের দরবারে তরকারি বা গুলকারি দিয়ে পেট ভরে খেতাম সেদিন ঈদের মত মনে হতো।

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪৩।

www.maktabatulabrar.com

অবশিষ্ট খাবার আমাদের এক দোস্ত নিয়ে যেতো যা অন্যরা খেতো। আর যদি তরকারি বা গুলকারি না থাকত তাহলে আমরা সেই বর্তন নিয়ে বসতাম।[১]

গাঞ্জেশাকার নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ

তার গাঞ্জেশাকার উপাধীতে প্রসিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। একটা কারণ হলো, তিনি মুজাহাদার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শায়খ বলেন, ক্ষুর্ধাত থাক। তিনি রোজা রাখা শুরু করেন। তিনদিন পর এক লোক কয়েকটি রুটি নিয়ে এলো। তিনি গায়েবী ইশারা মনে করে সেগুলো খেয়ে নেন। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বমন উদ্রেক শুরু হয়। একসময় বমি হয়ে সব বেরিয়ে যায়। তিনি নিজের শায়খের কাছে ঘটনা বর্ণনা করেন। শায়খ বলেন, যদিও তিনদিন পরে খেয়েছ, কিন্তু এক মদ্যপের খাবার খেয়েছ। আল্লাহর শুকরিয়া যে, খাবার পেটে হজম হয়নি। এখন আরো তিন দিন উপোষ থাক। গায়েব থেকে যে খাবার আসবে তাই খাবে। এদিকে তিনদিন অতিবাহিত হলেও কোনো খাবার এলো না। ক্ষুধায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। পরে অত্যধিক ক্ষুধায় কিছু কঙ্কর মুখে পুরে ফেলেন। দেখা গেল, কঙ্কর চিনিতে পরিণত হয়ে গেছে। শায়খ ভাবলেন, হয়ত ধোঁকা খাচ্ছেন, তাই থুথু দিয়ে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ক্ষুধার জ্বালায় আবারো কিছু কঙ্কর মুখে পুরে নিলেন। সেটাও চিনি হয়ে গেল। এমনটা তিন বার হলো। সকালে শায়েখের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে শায়েখ বলেন, ভালো করেছ খেয়ে নিয়েছ। সেদিন থেকে তিনি গাঞ্জেশাকার নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

কেউ কেউ লেখেন, সপ্তম দিন তিনি শায়েখের খেদমতে উপস্থিত হন এবং ক্ষুধার জ্বালায় মাথা ঘুরে পড়ে যান। ফলে তার মুখে মাটি লেগে যায়। আর মাটি চিনিতে পরিণত হয়। কেউ কেউ লেখেন, এক সওদাগরের কাছে তিনি চিনি চাইলেন। সওদাগর বলল, আমার কাছে চিনি নেই, লবণ আছে। তিনি বললেন, তাহলে লবণেই হয়ে যাবে। পরে দেখা গেল, তার সব চিনি লবণে পরিণত হয়েছে। তারপর সওদাগর হযরত খাজার কাছে এসে ওজরখাহি করল। ফলে লবণ আবার চিনিতে পরিণত হলো।

১. আখবারুল আখইয়ার।

এই উপাধি লাভের আরো কারণ ইতিহাস থেকে জানা যায়। প্রথম দিকে তিনি অনেক মুজাহাদা করতেন। শোনা যায়, তিনি কূপের মুজাহাদা করতেন। যখন কোনো কবুতর বা কাক এসে কূপের পাড়ে বসত বা তাকে ঠোকর মারত তখন তিনি এই শের পড়তেন–

کا گاسی تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماس ☆ دو نینان مت کھائیو کہ پیا ملن کی آس

শায়েখের দাড়ির বরকত

সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন, শায়খে কাবিরের দাড়ির একটি চুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি আবেদন করলাম, অনুমতি হলে বরকতস্বরূপ চুলটি রেখে দিই। তিনি অনুমতি দিলে চুলটি আমি একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে রেখে দেই। কেউ অসুস্থ হলে চুলটি তাবিজে ভরে তাকে ব্যবহার করতে দিতাম। সুস্থ হলে আবার ফিরিয়ে নিতাম। এ ধরনের বহু বরকত আমি লাভ করেছি এবং চুলটির বহু কারামত প্রত্যক্ষ করেছি। হঠাৎ এক বন্ধুর ছেলে অসুস্থ হয়ে গেল। বন্ধু চাইলে বহু খোঁজাখোঁজি করেও তাবিজটি পাইনি। পরে ছেলেটি মারা গেল। অথচ পরে অন্যজনের জন্য খুঁজলে ঠিক সেই জায়গায় তা পেয়েছি। তখন মনে হলো, তার মৃত্যু ছিল অবধারিত, তাই তাবিজটি পাইনি।

দাদাপীরের প্রশংসা

তার দাদা পীর খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী তার ব্যাপারে বহু প্রশংসামূলক বাক্য বলেছেন। একবার বলেন, কুতুবুদ্দীন বড় শাহবাজকে বন্দি করেছে। আরেকবার বলেন, সে হলো চেরাগ; ভবিষ্যতে সে দরবেশদের ঘর আলোকিত করবে এবং যুগের গাউস কুতুব হবে। খাজা কুতুবুদ্দীন মৃত্যুশয্যায় তাকে ডেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অসিয়্যত করেন।

তিনি দরিদ্র থাকতে পছন্দ করতেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রায়ই অনাহারে থাকতেন। তিনি বলতেন, দরবেশের পোশাক যখন পরেছ মনে করবে কাফন পরেছি।

একবার খাজা কুতুবুদ্দীনের কাছে তার শায়েখ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী মেহমান হলেন। মেহমান ও মেজবানের চৌকি একই কামরায় ছিল। খাজা ফরিদুদ্দীন অভ্যাসমত নিজের শায়েখ খাজা কুতুবুদ্দীনের পা দাবাতে গেলেন। কিন্তু তিনি নিজের শায়েখ তথা খাজা মুঈনুদ্দীনের পায়ের দিকে ইশারা করলেন। তিনি কয়েক মিনিট তার পা দাবিয়ে নিজের শায়েখের কাছে

www.maktabatulabrar.com

চলে আসেন। এসে বলেন, দিল এখানে বন্ধক রেখে আমি কোথায় যাবো? তখন খাজা মুঈনুদ্দীন বলেন, মিয়া কুতুবুদ্দীন! তাকে কিছু দিয়ে দাও।

শায়খুল কাবিরের ইন্তিকাল

সিয়ারুল আউলিয়ার লেখক খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়ার সূত্রে ইন্তিকালের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন– মহররমের পাঁচ তারিখে তার অসুখ বৃদ্ধি পায়। এশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করেন। নামাজের পর বেহুঁশ হয়ে যান। মুহূর্তকাল পরে হুঁশ ফিরে আসে। জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি এশার নামাজ পড়েছি? খাদেমগণ বলেন, হ্যাঁ, পড়েছেন। আবার পড়লে ক্ষতি কি, বলে দ্বিতীয়বার নামাজ পড়েন। পরে আবারো বেহুঁশ হয়ে যান। এবার অবশ্য দীর্ঘ সময় বেহুঁশ থাকেন। হুঁশ ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি এশার নামাজ পড়েছি? খাদেমগণ বলেন, হ্যাঁ, দু'বার পড়েছেন। তিনি বলেন, আরেক বার পড়ে নেই, কে জানে কেমন হয়েছে? পরে তৃতীয়বার নামাজ পড়েন। এরপরই ইন্তিকাল করেন।

তিনি ৫ই মহররম মঙ্গলবার ৬৬৪ বা ৬৬৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তবে 'তারিখে ফেরেশতা' গ্রন্থকারের মতে ৬৬০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। পাকপটনে তার মাজার, যা লাহোর ও মুলতানের মাঝে অবস্থিত। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মাদ তোঘলক তার মাযারে গম্বুজ তৈরী করেন।

খলিফা

তার খলিফা অসংখ্য; সত্তর হাজার পর্যন্ত শোনা যায়। জাওয়াহেরে ফরিদীতে তার খলিফার সংখ্যা ৫৮৪ জন লেখা হয়েছে। তাদের মাঝে সবচে' প্রসিদ্ধ হলেন খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কিল্য়ারী ও খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া।

অমিয় বাণী

- বান্দা দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ পাক ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।
- সূফী বলা হয় যিনি যা পেলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন আর যা হাতছাড়া হয়ে গেল তার পিছনে পড়েন না।
- যদি তোমরা চাও মর্যাদার সুউচ্চ স্তরে উপনীত হতে তাহলে রাজাবাদশার ছেলেদের সংশ্রব ত্যাগ করো।
- সবচে' নগণ্য লোক হলো যে কেবল খাওয়া-পরা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।[১]

১. নুজহাতুল খাওয়াতের, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮।

শায়খুল কাবিরের সন্তানাদি

হযরত খাজার পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। ছেলেদের নাম হলো– শায়েখ নসরুদ্দীন নসরুল্লাহ, শায়েখ শিহাবুদ্দীন, শায়েখ বদরুদ্দীন সুলাইমান, খাজা নেজামউদ্দীন ও শায়েখ ইয়াকুব। মেয়েদের নাম হলো– বিবি মাসতুরা, বিবি ফাতেমা ও বিবি শরিফা। ইন্তিকালের পর তার তৃতীয় ছেলে শায়েখ বদরুদ্দীন সুলায়মান পিতার গদীনশীন হন। তার ছেলে শায়েখ আলাউদ্দীন আজুধানী হন পিতার গদীনশীন। যুহুদ ও তাকওয়ায় তিনি ছিলেন পিতার জীবন্ত নমুনা। সুলতান মুহাম্মাদ তোঘলক ছিলেন তার মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত। রুহানী সিলসিলার মত আল্লাহ পাক তার সন্তানাদির মাঝেও বরকত দিয়েছেন। এখনো হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকায় এ খান্দান বসবাস করে। তারা সাধারণত ফরিদী নামে পরিচিত।[১]

শায়খুল কাবিরের খলিফাগণ

তার খলিফাদের মাঝে পাঁচজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শায়েখ জামালুদ্দীন হাসুবী, শায়েখ বদরুদ্দীন ইসহাক, শায়েখ নেজামুউদ্দীন আউলিয়া, শায়েখ আলী আহমদ সাবের ও শায়েখ আরেফ।

শায়েখ জামালুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ খতিবে হাসুবী ছিলেন শায়েখে কাবিরের সবচে' প্রিয় ও নির্ভরযোগ্য খলিফা। তার অনুরোধে খাজা সাহেব বারো বছর হাসিতে অবস্থান করেন। তিনি কাউকে খেলাফত দিলে বলতেন, হাসিতে গিয়ে শায়েখ জামালুদ্দীনকে দেখিয়ে নেবে। শায়েখ জামালুদ্দীন স্বাক্ষর করলে তিনি সেটা গ্রহণ করতেন। অন্যথায় ফিরিয়ে দিতেন। বলতেন, জালালের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা যায় না। আরো বলতেন, জামাল আমার জামাল।

শায়েখ জামালুদ্দীন ৬৫৯ হিজরিতে শায়েখের জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। শায়েখ কুতুবুদ্দীন মুনাওয়ার ছিলেন খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রিয়তম খলিফা। তিনি ছিলেন শায়েখ জামালুদ্দীনের পৌত্র।

শায়েখ বদরুদ্দীন ইসহাক

শায়েখ বদরুদ্দীন ইসহাক ইবনে আলী ছিলেন বুখারার সরদারদের একজন। খাজা ফরিদুদ্দীনের অন্যতম খলিফা, খাদেম ও জামাতা। খাজা নেজামউদ্দীন আউলিয়া তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। ছিলেন শায়েখের

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪৫।

www.maktabatulabrar.com

সোহবত ও তরবিয়তের জীবন্ত নমুনা। তার অন্তর ছিল অত্যন্ত নরম। চোখ সর্বদা অশ্রুভেজা থাকত। ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। কেউ আবেদন করল, আপনি অশ্রু কিছুটা সংবরণ করুন, আমি আপনার জন্য সুরমা বানিয়ে দেব। তিনি বলেন, চোখের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

তার ইবাদত ও মুজাহাদা দেখে শায়েখে কাবিরের কথা মনে পড়ে যেতো। অত্যন্ত যোগ্য, দক্ষ ও বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। দিল্লির প্রসিদ্ধ দরসগাহ মাদরাসায়ে মুয়িজ্জিয়াতে দীর্ঘদিন দরস দিয়েছেন। ইলম অর্জনের জন্য বুখারা পর্যন্ত সফর করেছেন। ফারসী ও আরবীতে অবলীলায় চমৎকার শের বলতে পারতেন। ইলমী বিষয়কে কাব্যাকারে ব্যক্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সরফ শাস্ত্রে কাব্যাকারে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। খাজা মুহাম্মাদ ইমাম ও খাজা মুহাম্মাদ মুসা ছিলেন খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়ার নামাজের ইমাম। তারা শায়েখ বদরুদ্দীনেরই সন্তান। ৬৯০ হিজরীর ৬ই জুমাদাল উখরায় ইন্তিকাল করেন।

শায়েখ আরেফ ও শায়েখ সাবের কিল্য়ারী

শায়েখ আরেফকে শায়েখে কাবির খেলাফত দিয়ে সীস্তানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি এ বলে খেলাফতনামা ফিরিয়ে দেন–এ দায়িত্ব বড় নাযুক, আমি এই দায়িত্ব পালনে অপারগ। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। পরে শায়েখের অনুমতি সাপেক্ষ তিনি হজে যান, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসেননি।

শায়েখ আলাউদ্দীন আলী ইবনে আহমদ সাবের ছিলেন বংশীয় দিক থেকে ইসরাঈলী। রিয়াজত-মুজাহাদা ও দুনিয়া-বিরাগে তার তুল্য খুঁজে পাওয়া ভার। পীরানে কিল্য়ারে দীর্ঘদিন ইবাদত ও ইফাদাতে মশগুল ছিলেন। পরে ৬৮৯ বা ৬৯০ হিজরির ১৩ই রবিউল আউয়ালে ইন্তিকাল করেন। শায়েখ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী ছিলেন তার প্রধান খলিফা।[১]

(১৯) খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কিল্য়ারী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার প্রকৃত নাম আলী আহমদ। উপাধী আলাউদ্দীন, মাখদুম ও সাবের। তিনি খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকারের ভাগিনা ও বিশিষ্ট খলিফা।

১. তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমত ৪৭।

৫৯২ হিজরিতে মুলতানের খোটোয়াল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সাইয়েদ হাসানী। তার বংশধারা হলো, খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের ইবনে শাহ আব্দুর রহিম সাইয়েদ আব্দুস সালাম, ইবনে সাইয়েদ সাইফুদ্দীন সাইয়েদ আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনে সাইয়েদ গাউসুস সাকালাইন পীরানে পীর শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী। তার মাতা ছিলেন বাবা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকারের সহোদরা বোন বিবি হাজেরা।

শাহ সাইয়েদ আব্দুর রহিম রহ. ৫৫৯ হিজরির ৫ই জিলহজ্ব হেরাত শহরে এসে শেখ মুহাম্মাদ ইসহাকের আশ্রয়ে বসবাস শুরু করেন। পূর্ণ দশ বছর তার খেদমতে থেকে জাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জন করেন। অতঃপর মুলতান জেলার খোটোয়াল নামক এলাকায় আগমন করেন। সেখানে ৫৭১ হিজরির ১৭ই জুমাদাল উখরা বাবা ফরিদুদ্দীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার বোনকে বিয়ে করেন। ৫৯২ হিজরির ১৯শে রবিউল আউয়াল তাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আলী আহমদ সাবের।

বাল্যকাল ও শিক্ষা-দীক্ষা

বাল্যকালে তিনি পিতৃহারা হন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি প্রায় বছরখানিক নীরবতা অবলম্বন করেন। তখন তাদের সংসারে ছিল খুবই অভাব-অনটন। তার বয়স তখন ছয় কি সাত বছর। প্রায়ই দু'তিন দিন অনাহারে কাটাতেন। কিন্তু মাতাপুত্রের সবরের কারণে তাদের এ অভাবের কথা কেউ জানতে পারত না। তখন তারা প্রায়ই রোজা রাখতেন এবং এক চুমুক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।

একসময় মা বুঝতে পারেন পুত্রকে তালীম দেয়ার সময় হয়েছে। সুতরাং ৬০০ হিজরির ২৫শে শাবান তিনি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে খোটোয়ালে ভাই ফরিদ গাঞ্জেশাকারের বাড়িতে এলেন। ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন, আলী আহমদ পিতৃহারা হয়ে গেছে আর এখন তার তালীম-তরবিয়তের সময়। তুমিই হতে পারো তার উপযুক্ত শিক্ষক ও অভিভাবক। সুতরাং তুমি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করো। বাবা ফরিদ ভাগিনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার মধ্যে অসাধারণ যোগ্যতা দেখতে পেলেন। ফলে তিনি বোনকে বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তাকে জাহেরী ও বাতেনী উভয় শিক্ষা দান করব।

www.maktabatulabrar.com

সাবের উপাধী পাওয়ার কারণ

সুদীর্ঘ বারো বছর তিনি খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকারের লঙ্গরখানার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সুস্পষ্ট অনুমতি না থাকায় একদিনও সেখান থেকে কিছু খাননি। সর্বদা রোজা রাখতেন। শায়েখ একবার জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আমার সাধ্য কি আপনার অনুমতি ছাড়া তাতে হস্তক্ষেপ করি? এ জবাব শুনে শায়েখ তাকে 'সাবের' উপাধী দেন।

শায়েখের প্রশংসা

একবার এক খাদেম খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকারের কাছে অনুমতি চাইল, আপনার খলিফাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই! সে অনুমতি নিয়ে প্রথমে খাজা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবেরের কাছে উপস্থিত হলো। কিন্তু তিনি সর্বদা ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকেন, ফলে কারো আসা-যাওয়ার খবর রাখতে পারেন না। তার খাদেম শামসুদ্দীন তুর্ক উঁচু আওয়াজে বলল, হযরত! আপনার পীর ও মুরশিদের খাদেম এসেছে, পীর সাহেবের সালাম নিয়ে এসেছে। তিনি জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আমার শায়েখ কেমন আছেন? পরে খাদেম শামসুদ্দীনকে কঠোরভাবে বলে দেন, তাকে যথাযথ সম্মান করবে। সঙ্গে একথাও বলেন, আজ তরকারিতে লবণ দেবে। কেমন যেন এটাই মেহমানদারী। একথা বলে তিনি আবারো ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যান।

এরপর খাদেম সুলতানুল আউলিয়া নেজামুদ্দীন বাদায়ুনীর কাছে উপস্থিত হন। সেখানে ছিল শাহী ব্যবস্থাপনা। তাকে অনেক সম্মান দেখানো হয় এবং মেহমানদারী করা হয়। ভালো খাবার খাইয়ে বহু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করা হয়। খাদেম খাজা সাহেবের কাছে ফিরে এলে তিনি উভয়ের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। খাদেম সুলতানুল আউলিয়া সম্পর্কে উঁচু প্রশংসা করেন আর খাজা মাখদুম সাবের সম্পর্কে বলেন, তিনি তো কারো সঙ্গে কথাই বলেন না। শায়েখ আবারো জিজ্ঞাসা করেন, কিছু একটা তো বলেছে? খাদেম বলল, শুধু এতটুকু জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার শায়েখ কেমন আছেন? তখন খাজা ফরিদ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, আজ সে এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যেখানে কারো পৌঁছার সাধ্য নেই। এটাই তার মহব্বতের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। কারণ এমন অবস্থায়ও সে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে এবং আমাকে স্মরণ রেখেছে।

জনশ্রুতি আছে, শায়েখ সাবেরের ইন্তিকালের পর কিলয়ারে হিন্দুদের আধিপত্য হয়ে যায়। তাই কতিপয় হিন্দু তার মাজারে মন্দির বানানোর চেষ্টা করে বা এ ধরনের কোনো অসম্মানের ইচ্ছা করে। ফলে জঙ্গল থেকে একটা সিংহ এসে তাদের অনেককে মেরে চলে যায়।

তার মেজাযের জালাল ছিল প্রবল। মৃত্যুর পরেও মাজারে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চকমক করত। ফলে কেউ মাজারে যেতে সাহস পেত না। একবার শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী মাজারে উপস্থিত হয়ে দোয়া করেন। ফলে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যায়।

ইন্তেকাল

৬৯০ হিজরির ১৩ই রবিউল আউয়ালে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাহারানপুর জেলার রুড়কি-সংগল্ন পীরানে কিলয়ারে তার মাজার অবস্থিত। মাজারের ওপর গম্বুজ তৈরী করেছেন সুলতান নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর।

(২০) শায়েখ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী রহ.

জন্ম ও বংশ-ক্রম

তিনি তুর্কিস্তানের সাইয়্যেদ বংশের অন্তর্ভুক্ত। তার বংশক্রম হলো, খাজা শামসুদ্দীন ইবনে সাইয়েদ আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাইয়েদ আহমদ, ইবনে সাইয়েদ নাসেরুদ্দীন, ইবনে সাইয়েদ হামেদ, ইবনে সাইয়েদ মাহমুদ, ইবনে সাইয়েদ আব্দুল্লাহ। তিনি তুর্কিস্তানের তারায নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাকে শামসুদ্দীন তুর্ক বলা হয়। তুর্কিস্তানেই তিনি ইলম অর্জন করেন। পরে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। মাওরাউন নাহারের বহু শায়েখের সোহবতে থেকে ফয়েয হাসিল করেন।

শায়েখের সন্ধানে

৬২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সাংসারিক কাজে জড়িত ছিলেন। অতঃপর বৃদ্ধ বয়সে কতিপয় সহচরসহ শায়েখের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী হিন্দুস্তানে আগমনের পর থেকে হিন্দুস্তান পরিণত হয় সূফিয়ায়ে কেরামের প্রাণকেন্দ্রে। কুতুবুল আকতাব খাজা বখতিয়ার কাকী এ কেন্দ্রভূমিকে আরো উজ্জ্বলতা দান করেন। পরে তার প্রধান খলিফা খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার নিজের রুহানী কামালাতের দ্বারা একে বিশেষ স্তরে উন্নীত করেন। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সূফী

www.maktabatulabrar.com

সাধকগণ হিন্দুস্তানে আগমন করতেন। তাদের কেউ স্বদেশে ফিরে যেতেন, কেউ বা এখানেই আস্তানা করে নিতেন।

৬৫৮ হিজরিতে খাজা শামসুদ্দীন তুর্ক কতিপয় সহচর নিয়ে পাকপটনে বাবা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশাকারের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি আরজ করেন, আমাদেরকে আপনার সিলসিলাভুক্ত করে বাতেনী নেয়ামত দান করুন। বাবা ফরিদ বলেন, আমার নিকট এখন কিছু নেই, তোমরা কিলয়ারে চলে যাও, সেখানে মাখদুম সাবেরের দরবারে উপস্থিত হও। তোমাদের কিসমতে যা থাকে সেখানে পাবে।

তিনি কিলয়ারে মাখদুম সাবেরের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে বাবা সাহেব পাঠিয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন, হুজুর তো আমার সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, আমি আর কী বলব! তখন খাজা মাখদুম সাবের বলেন, আল্লাহর শামস (সূর্য) আসমানে আর আমার শামস জমিনে। অতঃপর তাকে বয়াত করে নেন এবং বলেন, তুমি এখন বাবা সাহেবের দরবারে চলে যাও। সেখানে জাহেরী ইলম হাসিল করতে থাক আর মনেপ্রাণে তার খেদমত করতে থাক। তিনি তোমাকে সবকিছু দান করবেন। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমার কাছে আসবে। এতটুক বলে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যান।

খাজা মাখদুম সাবেরের হাতে বয়াত হয়ে তিনি বাবা ফরিদের কাছে ফিরে যান। বাবা সাহেব বলেন, শামসুদ্দীন! তুমি কেন চলে এলে? জবাবে তিনি বলেন, আপনার খেদমতে থাকতে তিনি আদেশ করেছেন। বাবা সাহেব বলেন, ঠিক আছে, এখানে থাক, দিনের বেলা জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে আর রাতের বেলা আল্লাহ তাআলার জিকির করবে। অতঃপর একদিন বাবা সাহেব তাকে ডেকে চিশতিয়া সিলসিলার যাবতীয় আমানত ও খেলাফতনামা তার নিকট সোপর্দ করেন। পরে বলেন, এ পবিত্র আমানত আমার সাবেরের নিকট পৌঁছে দিও, আমার সময় হয়ে গেছে।

বয়াত ও খেলাফত

খাজা শামসুদ্দীন তুর্ক যথাসময়ে এসব আমানত কিলয়ারে খাজা মাখদুম সাবেরের খেদমতে পৌঁছে দেন। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে খাজা মাখদুম তাকে খেলাফত প্রদান করেন এবং নিজ হাতে খেরকা, পাগড়ি ও সনদ প্রদান করেন। এমনকি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি কলন্দরি

টুপি তার মাথায় পরিয়ে দেন। অতঃপর ইসমে আজম শিখিয়ে বলেন, তোমার ওপর পানিপথের দায়িত্ব অর্পণ করলাম। আমার ইন্তিকালের পর পানিপথ চলে যাবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। তিনদিনের বেশি এখানে অবস্থান করবে না।

তিনি ছিলেন খাজা সাবেরের প্রধান খলিফা। সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থাকারের মতে তিনি খাজা সাবের ছাড়াও নিজের দাদা পীর খাজা ফরিদুদ্দীন গাঞ্জশকর থেকেও খেলাফত লাভ করেছেন।

কারামত

তার কারামত অসংখ্য ও অগণিত। তিনি একবার সুলতান বলবানের সৈন্যবাহিনীতে চাকরি নিলেন। প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে তিনি যে পুকুরে অজু করতেন, অজুর জায়গার পানি গরম হয়ে যেতো। বাদশার পানির ব্যবস্থাপক বিষয়টা জানতে পারল। ধীরে ধীরে বাদশার কানেও পৌঁছল। ফলে তিনি তার ভক্ত হয়ে যান।

একবার সৈন্যরা একটা কেল্লায় আক্রমণ করল। কিন্তু সেটা পদানত করতে বহু দিন লেগে গেল। বাদশা তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে দোয়া চাইলেন। তিনি দোয়া করার শুধু ওয়াদা করেননি, বরং বলে দিলেন, আপনি হামলা করুন, দেখবেন, দুর্গের দরজা খুলে গেছে। পরে হামলা করতেই দুর্গের দরজা খুলে গেল। এতে বাদশার ভক্তি আরো বেড়ে গেল। কিন্তু নিজের হালত প্রকাশিত হয়ে পড়ায় তিনি সেখানে আর থাকেননি, অন্যত্র চলে যান।

ইন্তিকাল

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তার ইন্তিকাল হয়েছে ৭১৫ হিজরিতে। তবে কেউ কেউ ৭১৬ বা ৭১৮ হিজরির কথাও বলেছেন। কেউ ১৯শে শাবান, কেউ ১০ই জুমাদাল উলা, আবার কেউ জুমাদাল উখরাও লিখেছেন।

(২১) শায়েখ জালালুদ্দীন কাবিরুল আউলিয়া রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার নাম মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ অথবা খাজা মাহমুদ। শায়েখের পক্ষ থেকে উপাধী পেয়েছেন জালালুদ্দীন। তার বংশ-পরিক্রমা আমীরুল

www.maktabatulabrar.com

মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. পর্যন্ত পৌছে। ৬৯৫ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জন্মগত অলী, বাল্যকাল থেকে যা বলতেন পরিণামে তাই হয়ে যেত। শহরের বিখ্যাত ধনী পরিবারে তার জন্ম, কিন্তু সম্পদ কখনো তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। শৈশব থেকেই তার মাঝে প্রকাশ পায় ইশকে এলাহীর লক্ষণ। বাল্যকালেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হয়ে পড়েন এবং পিতৃব্যের স্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত হন।

তরিকতের সন্ধানে

বিখ্যাত বুযুর্গ বুআলী কলন্দর বাল্যকাল থেকেই তাকে খুব স্নেহ করতেন, এমনকি প্রায়ই তিনি তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। একদিন বাড়ির রাস্তায় বুআলী কলন্দর বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে খাজা জালালুদ্দীন ঘোড়ায় চেপে সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বুআলী কলন্দরের দৃষ্টি তার ওপর পড়তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, কেমন চমৎকার ঘোড়া আর কেমন চমৎকার তার আরোহী! এ কথা বলতেই শেখ জালালুদ্দীনের মাঝে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ভাবাবেগে বিভোর হয়ে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং গায়ের জামা ছিঁড়ে জঙ্গলের দিকে চলে যান। তারপর চল্লিশ বছর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান এবং নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। এ সময় তিনি কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদা করে কামালাতের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তারপর দু'বার হজ্জ করেন এবং রওজায়ে পাকের যিয়ারত সম্পন্ন করেন। উভয় স্থানে অসংখ্য আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এমনকি তাদের সোহবত ও ফয়েয হাসিল করেন।

তিনি প্রচণ্ড রিয়াযত ও মুজাহাদা করতেন। শেষ জীবনে প্রায়ই ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকতেন। নামাজের সময় হলে খাদেমগণ সর্তক করতেন। নামাজ শেষে আবার ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন।

শোনা যায়, তার খলিফার সংখ্যা চল্লিশ। এমন কি প্রত্যেক খলিফা থেকে আলাদা সিলসিলা জারি হয়েছে। শায়েখ বাহরাম তারই খলিফা যার মাজার আছে বডলিতে।

শায়েখ প্রথমে তাকে বরনাদা অঞ্চলে নিযুক্ত করেন। শায়েখ শিহাবুদ্দীন ঝাঞ্ঝানবী ছিলেন তার খলিফা, যিনি ছিলেন শায়েখ সামাউদ্দীন কিরানুবীর পীর।

যুহুদ ও নির্মোহতা

সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থে আছে, একবার তিনি নদীর কিনারে গেলেন। সেখানে এক হিন্দু যোগী চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে চোখ খুলে ফেলল এবং শায়েখের অভিমুখী হয়ে খুশিতে মোবারকবাদ দিল। পরে বলল, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। কেননা আমার কাছে একটি পরশ পাথর আছে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, চোখ খুলে সর্বপ্রথম যাকে দেখব তাকে পাথরটি দিয়ে দেবো। ঘটনাক্রমে চোখ খুলে তোমাকে দেখলাম। এ কথা বলে তিনি অত্যন্ত গর্বের সাথে পাথরটি শায়েখের হাতে দিলেন। তিনি পাথরটি নদীতে ফেলে দিলেন। এতে যোগী ভীষণ রাগ করেন। অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোসের সঙ্গে বলেন, এমন দামী পাথরটা তুমি ফেলে দিলে! আমার পাথর আমাকে ফিরিয়ে দাও! শায়েখ বলেন, তুমি তো আমাকে দিয়ে দিয়েছ, সুতরাং আমার যা ইচ্ছা তাই করব। অস্থির উৎকণ্ঠায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং পাথরটি ফিরিয়ে দিতে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। শায়েখ বলেন, তুমি নদীতে ঢুকে যাও এবং নিজের পাথর খুঁজে নিয়ে এসো। শর্ত হলো, শুধু তোমার পাথরটি আনবে, অন্য কোনো পাথর নয়। সে নদীতে ঢুকে গেল, তারপর দেখল, তার পাথরের চেয়ে দামী অসংখ্য পাথর পড়ে রয়েছে। নিজের পাথরের সঙ্গে অন্য একটি পাথরও সে চুপিসারে নিয়ে এলো। শায়েখ রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করেছ। অবশেষে সে উভয় পাথর শায়েখের সামনে রাখল এবং মুসলমান হয়ে গেল।[১]

ইন্তিকাল

৭৬৫ হিজরির ১৩ই রবিউল আউয়াল বা জিলকদ মাসে ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। পানিপথে তার মাজার আছে।

তার খলিফার সংখ্যা চল্লিশ। তার পাঁচ ছেলে– খাজা আব্দুল কাদির, খাজা ইবরাহিম, খাজা শিবলী, খাজা কারিমুদ্দীন ও খাজা আব্দুল আহাদ। হিন্দুস্তানে রুহানী সিলসিলা আছে বহুত, কিন্তু যতগুলো সিলসিলা শায়েখ আব্দুল হক রুদূলী থেকে জারি হয়েছে, এমনটা আর কারো থেকে হয়নি। চিশতীয়া সিলসিলা তার মাধ্যমে জারি রয়েছে।

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৮৯।

www.maktabatulabrar.com

(২২) শায়েখ আহমদ আব্দুল হক রুদাউলবী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

শায়েখ আহমদের বংশক্রম হলো, আহমদ ইবনে ওমর ইবনে দাউদ আদবী ওমরী। তিনি আব্দুল হক নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার যুগে যুহুদ ও ইবাদতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

তার বংশক্রম দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব পর্যন্ত পৌঁছে। তার আসল নাম আহমদ। উপাধী আব্দুল হক, যেমনটা সামনে জানা যাবে। জন্ম রুদাউলি শরিফে[১]। তার দাদা শায়েখ দাউদ শায়েখ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। হালাকু খানের যুগে বলখ থেকে আলাউদ্দীন খিলজির শাসনামলে হিন্দুস্থানে চলে আসেন। প্রথম দিকে প্রচণ্ড রিয়াযত ও মুজাহাদা করতেন। সাত বছর বয়স থেকে তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করেন।

দিল্লিতে তিনি শায়েখ জালালুদ্দীন মাহমুদ গাজরুনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার সোহবতে থেকে তরিকতের তালীম নেন। দীর্ঘদিন মশগুল থাকেন রিয়াযত ও মুজাহাদায়। একসময় আল্লাহ পাক তার সামনে হাকিকত জাহের করে দেন এবং মারেফতের দরজা খুলে দেন। শায়েখের ইন্তিকালের পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। যুহুদ ও কানায়াতের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। তার থেকে বহু মানুষ তরিকতের তালীম নিয়েছে।[২]

জাহেরী তালীম

প্রথমে জাহেরী ইলমের দিকে মনোনিবেশ করেন। সেজন্য দিল্লিতে তাশরিফ আনেন। তালীমের যমানায় একটা চমৎকার ঘটনা ঘটে। হযরত থানভী রহ. সেটা এভাবে লিখেছেন– তার বড় ভাই শায়েখ তাকীউদ্দীন দিল্লিতে থাকতেন। তিনি ছিলেন সেখানকার বিশিষ্ট আলেম। দিল্লির শাহজাদাগণ ছিলেন তার ভীষণ ভক্ত। তিনি প্রথমে নিজের ভাইয়ের কাছে নাহু সরফ পড়া শুরু করেন। একদিন ভাই তাকে নাহুর একটা নিয়ম বোঝানোর জন্য উদাহরণ পেশ করে বলেন, ضرب زيد عمروا। (যার অর্থ

১. রুদাউলি (Rudauli) ভারতের উত্তর প্রদেশের ফয়েজাবাদ জেলার একটি শহর। এদিকে সম্পৃক্ত করেই তাকে রুদাউলবী বলা হয়।–সম্পাদক।

২. নুজহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯।

যায়েদ আম্‌রকে মেরেছে।) তাতে তিনি প্রশ্ন করে বসেন, কেন মারল? সে কী অপরাধ করেছে? ভাই জবাবে বলেন, এটা বানানো দৃষ্টান্ত, আসলে মারেনি। তিনি বলে ওঠেন, যদি বিনা অপরাধে মেরে থাকে তাহলে জুলুম করেছে, আর না মেরে থাকলে এমনিতে লিখে দিয়েছে, যা নির্জলা মিথ্যা। আমি এমন কিতাব পড়ব না যা শুরু থেকে মিথ্যা ও জুলুম শিক্ষা দেয়। সেদিন থেকে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন।

এই হলো তার শৈশবের অবস্থা। ভাই ঘটনাটি এক শাহজাদাকে শোনালে শাহজাদা বলেন, সে সাহেবে হাল হবে, লেখাপড়া করবে না, তাকে কষ্ট দিও না। মূলত বাতেনী ইলম তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে ফারাগাতের পূর্বেই নির্জনতা অবলম্বন শুরু করেন।

শায়েখে সন্ধানে

কিছুদিন পর গায়েবী ইলহাম পেয়ে পানিপথে হাজির হন। এমনকি শায়েখের কাছেও তার আগমনের সংবাদ কাশফ হয়ে যায়। শায়েখ তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তার আসার পূর্বে খাদেমদের নির্দেশ দেন, আজ দস্তরখান আড়ম্বরপূর্ণ কর; বিভিন্ন ধরনের ফলমূল আন, হরেক পদের খাবার রান্না কর। এমনকি নিষিদ্ধ জিনিসও দস্তরখানের পাশে রাখা হলো। কয়েকটি উন্নত প্রজাতির ঘোড়া সাজিয়ে বেঁধে রাখা হলো খানকার দরজায়। আহমদ আব্দুল হক উপস্থিত হলেন। প্রথমে দরজায় দুনিয়াবী শান-শওকত দেখে ভীষণ দমে গেলেন। পরে দস্তরখানে নিষিদ্ধ জিনিস দেখে স্থির থাকতে পারেননি। তখনই সেখান থেকে চলে যান। বাস্তবে এটা ছিল শায়েখের পরীক্ষা। অন্যথায় প্রিয় রুহানী সন্তানকে কেন ছেড়ে দিবেন, যার মাধ্যমে সিলসিলার অভূতপূর্ব উন্নতি হবে? সেখান থেকে গিয়ে সারাদিন তিনি ঘোরাফেরা করেন। সন্ধ্যায় শহরের অপর প্রান্তে পৌঁছে জানতে পারেন, এটিই পানিপথ। তিনি অত্যন্ত পেরেশান হন। রাস্তা ভুলে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছেন না। আবার এটা ছাড়া কোনো খানকাও খুঁজে পাচ্ছেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও একই অবস্থায় কাটল। সমস্ত দিন ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যায় জানতে পারেন, এটিই পানিপথ। তিনি অস্থির পেরেশান। ঘটনাক্রমে সাদা পোশাক পরিহিত একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, পানিপথের রাস্তার কথা। সে জবাব দিল, এই রাস্তা শায়েখ জালালুদ্দীনের দরবার থেকে এসেছে। তিনি তখন আরো অস্থির হলেন। সামনে অগ্রসর হয়ে আরো দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলে একই জবাব

www.maktabatulabrar.com

পেলেন। তখন বুঝতে পারেন আসল রহস্য। পরে অত্যন্ত আবেগ ও ভক্তি নিয়ে শায়েখের খানকায় উপস্থিত হন। শায়েখকে কদমবুসি করেন। অতঃপর বয়াত হন। কিছুদিন রিয়াযত-মুজাহাদার পর খেলাফত-লাভেও ধন্য হন।

বিভিন্ন ঘটনা

তার স্বভাব ছিল অকৃত্রিম ও আলাভোলা। ভাইয়েরা আদুলী থেকে তার জন্য সম্বন্ধ আনে। প্রথমে তিনি ভাইদের কাছে জোর অনুরোধ করেন, আমাকে বিপদে ফেলবেন না। কিন্তু তারা মানেনি। ফলে একদিন নিজেই শ্বশুর বাড়ি চলে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমি অক্ষম পুরুষ, আপনাদের মেয়ের জীবন নষ্ট হবে। সুতরাং আমার কাছে বিয়ে দেবেন না। তার কথায় বিয়ে মুলতবি হয়ে যায়।

একসময় তিনি বিয়ে করেন, সন্তানও হয়, কিন্তু সন্তান জীবিত থাকত না। যেই সন্তান জন্মগ্রহণ করত তিনবার হক হক বলে মারা যেত। সন্তান বাঁচে না বলে একদিন স্ত্রী তার সামনে কেঁদে পড়েন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আচ্ছা, এখন থেকে বাঁচবে। পরে যে সন্তান হয়, সেটা হক বলেনি, তবে বেঁচে থাকে।

একবার তিনি এক ডেগ খাবার পাকিয়ে রাস্তায় রেখে দেন এবং বলেন, ইনশাআল্লাহ, পথচারীরা যতই খাবে খাবার কমবে না। তিনদিন পর্যন্ত এমনি ছিল। পথচারীরা খাবার খেত, কিন্তু কমত না। অবশেষে তার মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হলো, এতে প্রসিদ্ধি হবে আর প্রসিদ্ধ হওয়া ক্ষতিকর। আল্লাহ পাক রিজিকদাতা, তিনি জানেন বান্দাদের কীভাবে রিজিক দেবেন। এ কথা ভেবে তিনি ডেগ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।

শায়খুল মাশায়েখ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী নিজের আনওয়ারুল উয়ুন গ্রন্থে শায়েখের বহু কারামত উল্লেখ করেছেন। প্রথম অধ্যায় প্রায় সবটা তার কামালাত বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত জানতে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

তার অভ্যাস ছিল প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। শোনা যায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর তিনি মসজিদ ঝাড়ু দিয়েছেন। কিন্তু ভাবের ঘোরে এতই আচ্ছন্ন থাকতেন যে, অধিকাংশ সময় খাদেমগণ হক হক বলে রাস্তা দেখিয়ে দিতেন। এ কারণে তার উপাধী হয়ে যায়, আব্দুল হক। এজন্যই তার খাদেমদের মাঝে হক শব্দের উচ্চারণ

বেশি দেখা যায়। এমনকি কোনো কোনো সিলসিলায় সালাম-জবাবে, চিঠিপত্রের শুরুতে 'হক' লেখা চালু হয়ে যায়। পরবর্তী শায়েখগণ অবশ্য খেলাফে সুন্নাত হওয়ার কারণে এটা ছেড়ে দেন।

ইন্তিকাল

৮৩৬ বা ৮৩৭ হিজরির পনেরই জুমাদাল উখরা তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। রুদাউলী শহরের রাবাবাঙ্গীতে তার মাজার আছে। তার কয়েকজন সন্তান ছিল। প্রত্যেকেই জন্মের সময় কারামত দেখিয়ে মারা যায়। শুধু শায়েখ মুহাম্মাদ আরেফ জীবিত থাকেন। তার থেকে রুহানী সিলসিলা জারি হয়। তাকে ছাড়াও মিয়া ফরিদ, শায়েখ বখতিয়ার প্রমুখ তার বিশিষ্ট খলিফা।

(২৩) হযরত খাজা আরেফ ইবনে আহমদ আব্দুল হক রহ.

তিনি হলেন শায়েখ আহমদ আব্দুল হকের ঔরসজাত ও রুহানী সন্তান। সর্বোপরি তার প্রধান খলিফা। পিতার অবর্তমানে তার মুসনাদে হেদায়েতে উপবিষ্ট হন এবং বহু সংখ্যক মানুষকে আল্লাহর মহব্বতের শরাব পান করান। তিনি ছিলেন শরিয়ত ও তরিকতের সমন্বিত ব্যক্তি। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল, যেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত সেই মনে করত হযরত আমাকে বেশি মহব্বত করেন। কাউকে আমার মত মহব্বত করেন না, সহানুভূতি দেখান না।

শায়েখ আব্দুল হকের প্রতিটি সন্তান ছিল সাহেবে কামালাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কারামত প্রকাশ পেতো। শোনা যায়, একারণে তারা জীবিত থাকেনি। সুতরাং শায়েখ আরেফের কারামতের কথা বলাই বাহুল্য। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাকের হয়ে যান, যেমনটা তার পিতার জীবনীতে চলে গেছে। প্রত্যেক সন্তান জন্মের সময় হক হক বলে মারা যেত। স্ত্রী অভিযোগ করলে বলেন, এখন থেকে তোমার সন্তান হলে বেঁচে থাকবে। সে হিসাবে শায়েখ আরেফ বেঁচে থাকেন।

অনেকে তার নাম লেখেন, শায়েখ আহমদ আর পিতার নাম লেখেন শায়েখ আব্দুল হক। তিনি ৮৫৯ হিজরিতে চল্লিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সে হিসাবে পিতার ইন্তিকালের সময় তার বয়স ছিল সতের বছর। অথচ ইতিমধ্যে তিনি শায়েখে কামেল হয়ে গেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লেখেন, তার ইন্তিকাল হয়েছে ৮৮২ হিজরিতে। শোনা যায়, পিতার মসনদে বসে তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর মানুষকে হেদায়েত করেছেন। পরে

www.maktabatulabrar.com

পিতার রেখে যাওয়া আমানত নিজের ছেলে শায়েখ মুহাম্মাদের হাতে অর্পণ করেন। এতে বুঝা যায়, তার বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশি ছিল।

ইন্তিকাল

তার ইন্তিকালের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে শোনা যায়, রুদাউলী শরিফে তার উরস ১৭ই সফর অনুষ্ঠিত হয়। সেটা নিশ্চয় মৃত্যুর তারিখ। কোনো কোনো শাজারায় তার মৃত্যুর তারিখ এটাই লেখা আছে। তার খলিফাদের মাঝে তার ছেলে শায়েখ মুহাম্মাদের কথাই শুধু পাওয়া যায়। হতে পারে আরো খলিফা ছিলেন।

(২৪) শায়েখ মুহাম্মাদ বিন শায়েখ আরেফ

তিনি ছিলেন পিতার সত্যিকার উত্তরাধিকারী। শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী– যিনি ছিলেন খ্যাতনামা বুযুর্গ–তিনি তার হাতেই বয়াত হয়েছেন। হযরত গাঙ্গুহীর ইচ্ছা ছিল অন্য কোথাও বয়াত হবেন। কিন্তু শায়েখ আহমদ আব্দুল হক তার ঔরসজাত ও রুহানী সন্তান শায়েখ মুহাম্মাদের হাতে বয়াত হওয়ার জন্য তাকে তালকীন করেন।

মুশাহাদায়ে মুতলকের মাধ্যমে তিনি কামাল হাসিল করেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তার ছেলে শায়েখ বুদ্দাহ শাহআবাদে শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর কাছে ছিলেন। বাতেনী তাসাররুফের মাধ্যমে তিনি গাঙ্গুহীসহ নিজের ছেলেকে ডেকে পাঠান। তারা এমন সময় উপস্থিত হন যখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায়। এমনকি তার মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে, বার বার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছেন। হুঁশ ফিরে এলেই বলছেন, আল-হামদু লিল্লাহ, বুঝে গেছি! হযরত গাঙ্গুহী জিজ্ঞাসা করেন, কী বুঝে গেছেন? তিনি বলেন, তাওহীদে মুতলক বুঝে গেছি। পরে নিজের শায়েখের কাছ থেকে যেসব আমানত পেয়েছেন–উলুম, মায়ারেফ ও ইসমে আজম–সবই কুতুবে আলম শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীকে দিয়ে দেন। হযরত গাঙ্গুহী আরজ করেন, আমি এখানে আপনার বিচ্ছেদ বেদনা সইতে পারব না। আমাকে অন্য কোথাও যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দেন, সঙ্গে একথাও বলেন, আমার ছেলে বুদ্দাহকে তোমার হাতে অর্পণ করলাম। তাকে সুলুকের পথে পরিপূর্ণ করে এখানে রেখে দেবে। শায়েখের ইন্তিকালের পর তিনি তেমনই করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, শায়েখ বুদ্দাহ এজাযত ও খেলাফত নিজের পিতা থেকেই লাভ করেছেন।[১]

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস ১৯৭।

ইন্তিকাল

তার ইন্তিকালের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে শাজারাতে ৮৯৮ হিজরির কথা লেখা আছে। কোনো কোনো শাজারায় তার ইন্তিকাল ১৭ই সফর লেখা। তার খলিফাদের মধ্যে শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী ছাড়া কারো কথা জানা যায় না।

(২৫) হযরত শায়খুল মাশায়েখ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.

সাহেবে নাজ্জাহ তার বংশ-লতিকা এভাবে লিখেছেন– শাহ আব্দুল কুদ্দুস ইবনে ইসমাঈল ইবনে সাফী ইবনে নাসির হানাফী রুদাউলী গাঙ্গুহী। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ইসমাঈল, উপাধী শাহ আব্দুল কুদ্দুস। তিনি উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৮৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। জাহেরী ও বাতেনী ইলমে কামেল ছিলেন। আবার ইত্তেবায়ে সুন্নতেও ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি যদিও শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে শায়েখ আরেফের খলিফা ছিলেন, কিন্তু তার কামালাতের পূর্ণতা লাভ হয় শায়েখ আব্দুল হকের কাছে রুহানী ফয়েযের মাধ্যমে। তিনি নিজের কিতাব আনওয়ারুল উয়ুনে লেখেন, শায়েখ আহমদ আব্দুল হকের বহু কারামত ও তাসাররুফের মধ্যে অন্যতম হলো, মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর তিনি আমাকে রুহানী ফয়েযের মাধ্যমে তরবিয়ত করেছেন।

শিক্ষাদীক্ষা

তিনি রুদাউলীতে বেড়ে ওঠেন। নাহু-সরফের কিছু কিতাব পড়েন মোল্লা ফাতহুল্লাহ সাহেবের কাছে। পরে সূফীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ইল্‌মচর্চা ছেড়ে দেন। শায়েখ আহমদ ইবনে দাউদ উমরী রুদাউলীর মাজারে পড়ে থাকেন। দীর্ঘদিন কাটান সেখানে। একবার তার মনে হলো, ইলম ব্যতীত তাসাওউফ লবণহীন খাবারের মত, ফলে তিনি পুনরায় ইল্‌মচর্চা শুরু করেন। এমনকি আল্লাহ পাক তার সামনে ইল্‌ম ও মারেফতের দরজা খুলে দেন। শায়েখ আহমদ থেকে ফুয়ুয ও বারাকাত হাসিল করেন। পরে খেলাফত লাভ করেন শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ থেকে। পরে শাহআবাদে স্থানান্তর হন। সর্বশেষ গাঙ্গুহে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।[১]

১. নুজহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৭১।

www.maktabatulabrar.com

তিনি ছিলেন অতি উঁচু স্তরের বুযুর্গ, তবে সামা শুনতেন । জনগণের সামনে তাওহীদের বিভিন্ন রহস্য প্রকাশ করতেন। সর্বদা জযবের হালতে থাকতেন। এসত্ত্বেও ইত্তিবায়ে সুন্নাতে ছিলেন অটল অবিচল। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে জীবন যাপন করতেন। কঠোর ইবাদত ও মুজাহাদা করতেন। রাতদিন মৃত্যুকে স্মরণ করে কাঁদতেন।[১]

বয়াত ও ইরাদাত

তার পুত্র লেখেন, আব্বাজানের ইচ্ছা ছিল অন্য কোথাও বয়াত হবেন। কিন্তু শায়েখ আহমদ আব্দুল হক আলমে কাশফে নির্দেশ দেন, তুমি অন্য কোথাও বয়াত হবে না, আমি তোমাকে পূর্ণতায় পৌছে দেবো। কিন্তু জাহেরী বয়াতের প্রতি যেহেতু তার গুরুত্ব ছিল তাই নিজের প্রপৌত্র শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আরেফের হাতে বয়াত হওয়ার ইঙ্গিত দেন। সুতরাং শায়েখ গাঙ্গুহী জাহেরী দুই সূত্রে এবং বাতেনী বিনাসূত্রে শায়েখ আহমদ আব্দুল হকের হাতে বয়াত হন। নিজের শায়েখ ছাড়াও শায়েখ কাসেম আওধীর হাতে বয়াত হয়ে খেলাফত লাভ করেন, যিনি ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার বিখ্যাত বুযুর্গ।

হযরত গাঙ্গুহী ছিলেন জন্মসূত্রে অলী। শৈশব থেকে ছিলেন সাহেবে কাশ্‌ফ ও কারামত। প্রথম দিকে কিছু চাষবাস করতেন। খেতের প্রথম ফসল ফকির-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। পরে নিজে ব্যবহার করতেন। সামার প্রতি তার আগ্রহ ছিল প্রবল। সামার মসলিসে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন।

সামার শর্তাবলি

সামার মজলিস কায়েম করার জন্য উলামায়ে কেরাম দশটি শর্ত লিখেছেন। সেগুলো পাওয়া গেলে তারাও তেমন প্রতিবাদ করেন না। শর্তগুলো আকাবিরের লেখায় বিস্তারিত পাওয়া যায়। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.ও 'হক্কুস সামা' নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। সেখানে ইমাম গাজালীর এহইয়াউল উলুমের সূত্রে পাঁচটি শর্ত ও পাঁচটি বাধা লিপিবদ্ধ করেছেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে হযরত থানবী রহ. লেখেন– ইমাম গাজালী এহইয়াউল উলুমে পাঁচটি শর্ত ও পাঁচটি বাধা লিপিবদ্ধ করেছেন। শর্তগুলো হলো– প্রথমত স্থান কাল ও সঙ্গীরা কেমন দেখতে হবে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী বলেন, সামার জন্য

১. নুজহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৭২।

তিনটি বিষয় জরুরী, অন্যথায় সামা শোনা যাবে না। বিষয় তিনটি হল– স্থান কাল ও পাত্র। কালের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সময়টা এমন হবে যখন কোনো শরয়ী বা তবয়ী জরুরী কাজ থাকবে না। যেমন খাওয়ার সময় বা তাকরারের সময়, নামাজের সময় বা অন্য কোনো ব্যস্ততার সময় যখন দিল বিক্ষিপ্ত থাকে এমন সময় হতে পারবে না।

স্থানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সামা শোনার জায়গাটা মানুষের চলাচলের রাস্তা বা কোনো শোরগোল পূর্ণ জায়গা হবে না, যেখানে অন্তর বিক্ষিপ্ত থাকে। সাথী-সঙ্গী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সামার মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ। এই শর্তের কারণ হলো, মজলিসে যদি এমন কেউ এসে যায় যে বাতেনী দৌলত থেকে বঞ্চিত, বরং অপরিচিত, এমন কেউ এলে সকলের মনে প্রভাব পড়ে। সবার অন্তর সেদিকে ধাবিত হয়ে যায়। এমনিভাবে কোনো দাম্ভিক দুনিয়াদার এলেও তাকে স্বাগত জানানো ও খোশামোদের প্রয়োজন দেখা দেয়। অথবা কোনো প্রদর্শনপ্রিয় সূফী এসে গেল, যে লোক দেখানোর জন্য মস্তি করে, কাপড় ছিঁড়ে। এমন লোকদের অংশগ্রহণে মজলিসের মজাই নষ্ট হয়ে যায়।

এখন দেখুন, আমাদের দেশে এসব শর্তের প্রতি কতটা লক্ষ্য রাখা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, নামাজের সময় সামা চলতে থাকে। কখনো নামাজ ছুটে যায়, জামাত ছুটে যাওয়া বা শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়া তো তাদের কাছে মামুলি ব্যাপার। নামাজ বা জামাত ছুটে গেলেও কারো ভাবান্তর হয় না। সামার বিপরীতে সুনান ও ফরায়েজের যেন কোনো গুরুত্বই নেই। অনেকে তো বলেই ফেলে, মিয়া! প্রকৃত ইবাদত তো এটাই, নামাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ! নাউযুবিল্লাহ!

অনেক সময় উন্মুক্ত জায়গায় সামার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কোনো বাধা-নিষেধ থাকে না। ফলে অনেক পাপী বাজারী লোকও তামাশা দেখার জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় নেতৃস্থানীয় ও ধনিক শ্রেণীর লোকেরা উপস্থিত হয়। ফলে মজলিসে তাদের বসার ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়। অনেক রিয়াকারও শরিক হয়, বরং অধিকাংশই থাকে রিয়াকার। অনেক সময় মজলিসে থাকে বিরোধী পক্ষের লোকেরা। তারা তাদের মস্তি দেখে হাসে, বিদ্রূপ করে। এমনকি অনেক জায়গায় তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাটি ও মামলা-মুকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। মোটকথা উল্লিখিত শর্তাবলির কোনোটা পাওয়া যায় না।

www.maktabatulabrar.com

দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে ইমাম সাহেব বলেন, উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের ব্যাপারেও সর্তক থাকতে হবে। যে সকল মুরিদের সামা শুনলে ক্ষতি হয় শায়েখের উচিত তাদের সামনে সামা না শোনা।

সামা শুনলে যাদের ক্ষতি হয় এমন লোক তিন ধরনের হয়ে থাকেঃ

প্রথমত : যিনি সুলুক ও তরিকত সম্পর্কে এখনো ভালোভাবে পরিচিত হননি, শুধু জাহেরী আমল শিখেছেন মাত্র।

দ্বিতীয়ত : যার মাঝে বাতেনী মুনাসাবাতে সামার রুচিবোধ তৈরী হয়েছে ঠিক, কিন্তু এখনো তার মাঝে শাহওয়াত গালেব, নফসের শক্তি এখনো পুরোপুরি পরাজিত হয়নি। এমন লোকেরা সামা শুনলে তাদের যৌন উত্তেজনা চাড়া দিয়ে উঠবে। ফলে তাদের সুলুকের পথই বন্ধ হয়ে যাবে। তারা কখনো পূর্ণতায় পৌছতে পারবে না।

তৃতীয়ত : যার শাহওয়াত পরাজিত হয়ে গেছে, ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই, আবার তার অন্তর্দৃষ্টিও খোলা, আল্লাহ তাআলার মহব্বতও প্রবল, কিন্তু জাহেরী ইলমে পূর্ণতা আসেনি। আল্লাহ তাআলার নাম ও তার গুণাবলীর ব্যাপারে ভালো করে অবগত হয়নি। সে বুঝতে পারে না আল্লাহর দিকে কোন বিষয় সম্পৃক্ত করা যায় আর কোন বিষয় সম্পৃক্ত করা যায় না। এমন ব্যক্তি সামা শোনা শুরু করলে সবকিছু আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে বসবে। চাই সেসব বিষয় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা সহিহ হোক বা না হোক।

এসব কুফুরী ধ্যান-ধারণায় যে ভয়ানক ক্ষতি হবে সামা শোনার দ্বারা ততটা ফায়দা হবে না। তাছাড়া এমন লোকের জন্যও সামা শোনা ঠিক নয়, যার অন্তরে মালের লোভ পদের লোভ প্রবল। এমনিভাবে এমন লোকেরাও সামা শুনবে না যারা কেবল মজা লাভের জন্য, প্রবৃত্তিকে সুখ দেয়ার জন্য শোনে। পরে ধীরে ধীরে তাতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। ফলে জরুরী ইবাদত ও মুরাকাবা থেকে হয় বঞ্চিত। এমনকি পরিণামে সুলুকের পথ কেটে যায়। মোটকথা সামা শোনা বড় সঙ্গিন বিষয়। দুর্বল হালতের লোকেদের জন্য তা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

আজকাল যারা সামা শোনে তাদের প্রতি লক্ষ করুন। দেখবেন, অধিকাংশ সামার মজলিসে এমন লোক থাকে সামা যাদের পক্ষে ক্ষতিকর। তাদের বাতেন ঠিক হবে দূরে থাক অনেকের জাহেরী আমল পর্যন্ত ঠিক নেই। অধিকাংশই বেনামাজী, মুণ্ডিত দাড়ি, ঘুষখোর, জালেম, দুর্বৃত্ত,

অশোভন বেশবাস যুবক, শাহওয়াত পূজারী, সৌন্দর্য পূজারী– এ ধরনের লোকই অংশগ্রহণ করে বেশি।

আবার তাদের মাঝে কেউ যদি আবেদ-যাহেদ ও জওক-শওকওয়ালা থাকেও, কিন্তু জরুরী ইলম না থাকে, শরিয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে হয় অজ্ঞ, ফলে কোন বিষয়ের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা যায় বুঝতে পারবে না। কখনো বাতেনী ইলমে হয় অনভিজ্ঞ, যে কারণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা বুঝতে পারে না। কখনো আরেফীনদের ভাষা পরিভাষা ও রুমুজের ব্যাপারে হয় অজ্ঞ, ফলে শ্রুত শেরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে না, শরিয়ত ও তরিকতের মাঝে করতে পারে না সমন্বয় সাধন। মোটকথা– ইলম না থাকার কারণে শত আজেবাজে খেয়াল ও ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা মাথায় আসে। আর সে এগুলো সঠিক মনে করে মজা নিতে শুরু করে, চাই বেদাতী চিন্তাধারা হোক বা কুফ্‌রী চিন্তা-চেতনা হোক। তার তো এসব ভেবে দেখার অবকাশ নেই। নিজের মজা পাওয়াই আসল কথা।[১]

রচনাবলী

হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর অন্যতম রচনা হলো আনওয়ারুল উয়ুন ওয়া আসরারুল মাকনুন যা সাতটি ফন সম্বলিত। তাতে তাসাওউফের হাকিকত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বেশির ভাগ আলোচনা শায়েখ আব্দুল হকের কামালাত নিয়ে। এ ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো, ইলমে কালামে তালীকাত আলা শরহুস সাহায়েফ, আওয়ারেফুল মায়ারেফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হাশিয়াতুন আলা ত্তায়ারুফ। আর লাতায়েফে কুদ্দুসী লিখেছেন তার নসবী ও রুহানী সন্তান শায়েখ রুকনুদ্দীন। তাতে বিস্তারিত পাওয়া যায় হযরত শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর হালত। এ ছাড়াও মিরআতুল আসরার, ইকতিবামুল আনওয়ার, আনওয়ারুল আবেদ্বীনের মাঝেও পাওয়া যায় তার হালাত।

কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনা

১. একবার হযরত গাঙ্গুহীর এক মুরিদের ওয়াসওয়াসা হলো, এখানকার শিক্ষা তো সমাপ্ত করলাম, আরো তো বহু সুযোগ্য শায়েখ আছেন তাদের কাছে গিয়েও দেখি। কারো কাছে আল্লাহর নাম জিজ্ঞাসা

১. তারিখে মাশায়েখে চিশত, শায়খুল হাদিস।

www.maktabatulabrar.com

করতে তো বাধা নেই। সেখানকার রীতিনীতি জানাও হবে, দেখাও হবে। কিন্তু শায়েখের কাছে বলতে সংকোচ হচ্ছিল। শায়েখ হয়ত কাশ্‌ফের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন বা অন্য কোনো উপায়ে অনুমান করেছেন। তাই একবার তিনি নিজেই তাকে বলেন, ভাই, আল্লাহ পাক তো বলেছেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ

তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো।'[১]

অতএব তুমি যদি কিছুদিন এদিক সেদিকে ঘুরে আস তাতে ভ্রমণও হবে, আবার বিভিন্ন শায়েখের বরকতও হাসিল হবে। তখন যদি কারো কাছে আল্লাহর নাম শিখতে চাও, তাতেও বাধা নেই। মুরিদ খুবই খুশি হলো, যাক, শায়েখের সঙ্গে সংকোচও বাধা হলো না আবার উদ্দেশ্যও হাসিল হলো। বিদায় নিয়ে তিনি রওয়ানা হন। পরে যে শায়েখের কাছেই যান প্রথমে তিনি পাঁচ আনফাসের জিকির দেন। সুলুকের পথে যেটা প্রথম সবক। তিনি ঘাবড়ে গেলেন, যার কাছেই যাই আলিফ বা তা থেকে শুরু করেন। পিছনের সব সাধনা-মুজাহাদা বেকার মনে করেন। অবশেষে লজ্জিত হয়ে তিনি শায়েখের কাছে ফিরে আসেন এবং তওবা করেন। শায়েখ বলেন, ভাই, এখন তো মন প্রশান্ত হয়েছে। আসলে দূরের ঢোলের আওয়াজ সানাইয়ের আওয়াজ বলে মনে হয়। এখন এক কোণায় বসে আল্লাহ নামের জিকির করতে থাক আর মনকে প্রশান্ত রাখো।

২.জাওয়াহেরে খামসার লেখক মুহাম্মাদ গাউস গোয়ালিয়ারী ছিলেন একজন বিখ্যাত আমেল। সম্ভবত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর সমকালীন ছিলেন। একবার হযরত গাঙ্গুহীকে আনার জন্য তিনি নিজের অনুগত জিনদের পাঠালেন। শায়েখ তখন মসজিদে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। জিন তো এলো, কিন্তু কাছে যাওয়ার সাহস করল না। শায়েখ নিজেই মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা? জিনেরা জবাব দিল, মুহাম্মাদ গাউস আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। অনুমতি হলে আমরা আপনাকে এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, আপনার কোনো কষ্ট হবে না। শায়েখ বলেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা গিয়ে মুহাম্মাদ গাউসকে নিয়ে আসো। নির্দেশ মোতাবেক জিনেরা গিয়ে তাকে নিয়ে এলো। তিনি জিনদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার, তোমরা আমার অনুগত হয়ে কেন আমাকে এভাবে নিয়ে যাচ্ছ? কেন আমার অবাধ্যতা

১. সুরা রোম ৪২।

করছ? জিনেরা জবাব দিল, সবার বিরুদ্ধে আমরা আপনার আনুগত্য করি, কিন্তু শায়েখের বিরুদ্ধে আপনার আনুগত্য করব না। শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে শায়েখের দরবারে উপস্থিত করল। দেখে শায়েখ তিরস্কার করে বলেন, তোমার লজ্জা হয় না! আরো অনেক ধমক দিলেন। অবশেষে তিনি শায়েখের হাতে বয়াত হন এবং সাহেবে নিসবত বুযুর্গ হয়ে যান। পরে গোয়ালিয়রে তার মাযার হয়।

৩. শায়েখের এক খাদেম ছিল বড় আমীর। ছেলের অলিমাতে শহরের গণ্যমান্য লোকদের যেমন দাওয়াত করল, তেমন গরীব-দুঃখীদেরও দাওয়াত করল। সবাইকে অত্যন্ত আদর আপ্যায়নে খাওয়াল। খাদেমকে পরীক্ষা করার জন্য শায়েখ অলিমায় গেলেন। এমনভাবে গেলেন যেন কেউ চিনতে না পারে। কাপড় পরিবর্তন করে রাতের আঁধারে গেলেন। সেখানে গিয়ে গরীবদের সঙ্গে বসে যান। তিনি দেখেন খাদেম সেখানে উপস্থিত। ধনীদের যেমন আপ্যায়ন করছে গরীবদেরও সমাদর করে খাওয়াচ্ছে।

মোটকথা, শায়েখ অংশগ্রহণ করেন। খাদেম ভাবতেও পারেনি, শায়েখ আসতে পারেন। তাছাড়া তিনি কাপড় পরিবর্তন করে রাতের আঁধারে গেছেন। এজন্য খাদেম শায়েখকে একদম চিনতে পারেনি। খাওয়া শেষে সবাই চলে গেলে শায়েখও চলে আসেন। পরে খাদেম যখন দরবারে উপস্থিত হন শায়েখ অসন্তুষ্ট হন। অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আমি তোমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারনি। খাদেম ওজরখাহি করে বলল, আপনি তো পোশাক পরিবর্তন করে রাতের অন্ধকারে গিয়েছেন, আমি কীভাবে চিনব? শায়েখ বলেন, তুমি আমার ঘ্রাণ পাওনি কেন? আমার ঘ্রাণ পেলে তো কাপড় পরিবর্তন সত্ত্বেও চিনতে পারতে? ঘ্রাণ যখন পাওনি, বুঝা গেল আমার প্রতি তোমার পূর্ণ মহব্বত নেই।

হযরত থানবী রহ. তার কিতাব আস সুন্নাতুল জালিলাহতে অনেক ঘটনা লিখেছেন। সেখান থেকে দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. একবার শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী দিল্লিতে তাশরীফ আনেন। তখন সাইয়েদ জালালুদ্দীন বুখারীর ছেলে শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব বুখারী––যিনি ছিলেন বিশিষ্ট আলেম এবং সাহেবে হাল বুযুর্গ–তিনি নিজের লিখিত তাফসিরের কিতাব হযরত গাঙ্গুহীর কাছে পাঠান। তিনি কিতাবটি খুললে

www.maktabatulabrar.com

প্রথমেই সেই আয়াতের ওপর দৃষ্টি পড়ে যেখানে রসূল সা.-এর আহলে বাইতের পবিত্রতার আলোচনা ছিল। সেখানে শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব লিখেছেন, রসূল সা.-এর সকল সন্তানাদি মৃত্যুর ব্যাপারে ছিলেন নির্ভয়। কারণ তাদের মৃত্যু ঈমানের সঙ্গে হওয়া ছিল সুনিশ্চিত। শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী কিতাবের হাশিয়ায় লিখে দেন, কথাটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাসলাকের পরিপন্থী। পরে তিনি কিতাবটি ফিরিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে বহু দিন পর্যন্ত আহলে ইলমের মাঝে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। অবশেষে শায়েখ যা বলেছেন, সেটা চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়।

২. একবার মসজিদের ইমাম সাহেব সময়মত আসেননি। ফলে তার ভাতিজা শায়েখ আব্দুল গনী অগ্রসর হয়ে ইমামতি করেন। ঘটনাক্রমে اَلَّذِيْنَ ও اَنْعَمْتَ এর মাঝে কিছুটা ওয়াকফ হয়ে যায়। শায়েখ পুনরায় নামাজ পড়েন এবং রাগত স্বরে বলেন, তরুণদের উচিত নয় ইমামতি করা, মানুষের নামাজ নষ্ট করা। এটাও কি জান না মওসুল ও সেলা মিলে এক কালিমা হয়; এর মাঝে ওয়াকফ করা ঠিক নয়।

ঔরসজাত সন্তান

রুহানী সন্তানের মত তার কামেল ঔরসজাত সন্তানও ছিল। তার সাত ছেলে সবাই ছিল যোগ্য দক্ষ আলেম। সবাই দিল্লিতে লেখাপড়া করত। পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ হলে আসার অনুমতি চাইত। তখন তিনি নিজেই দিল্লি চলে যেতেন সন্তানদের সাক্ষাৎ দিতে। যেন তাদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন না ঘটে।

ইন্তিকাল

শায়েখ রুকনুদ্দীন লাতায়েফে কুদ্দুসীর মাঝে লেখেন, ৯৪৪ হিজরির ১১ই জুমাদাল উখরা সোমবার তার কেঁপে জ্বর আসে। জুমার দিন জ্বর কিছুটা কমে। ফলে প্রশান্ত চিত্তে নামাজ পড়েন। পরে আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর শুরু হয়। মৃত্যুশয্যায়ও ইবাদত-বন্দেগিতে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ প্রায়ই অচেতন থাকতেন। একরাতে সত্তর বার নতুন অজু করে তাহিয়্যাতুল অজু পড়েছেন। অবশেষে অজু করিয়ে দেয়ার জন্য ইশারা করেন এবং নামাজের নিয়্যত বাঁধেন। রুকু সেজদা আদায় করেন ইশারায়। নবম দিন মঙ্গলবার নামাজ অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

তার ইন্তিকালের সন তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, ৯৪৪ হিজরির ২৩ শে জুমাদাস সানী। কেউ বলেন, ৯৪০ বা ৯৪৫ বা

৯২৫ হিজরী, কিন্তু হলো প্রসিদ্ধ ৯৪৪ হিজরী। তখন তার বয়স ছিল ৮৪ বছর।

৩৫ বছর ছিলেন রুদাউলী শরিফে। ৮৯৬ হিজরিতে বাদশা সিকান্দার লোধীর আমীর ওমর খান কাশীর পীড়াপীড়িতে শাহআবাদ আসেন এবং ৩৫ বছর সেখানে অবস্থান করেন। ৯৩৩ হিজরিতে বাদশা জহিরুদ্দীন বাবরের যুগে গাঙ্গুহে আসেন এবং ১৪ বছর সেখানে অবস্থান করেন।

তখন গাঙ্গুহ ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ ছিল শহর নামে প্রসিদ্ধ, অন্য অংশ তথা পশ্চিম অংশ সরায়ে নামে প্রসিদ্ধ। সেটা ছিল একদম জঙ্গলাকীর্ণ। শায়েখ সেখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। ৯৩০ হিজরী থেকে সেই সরায়ে আবাদ হওয়া শুরু হয়। সেখানেই চিশতীয়া সিলসিলার তিনজন মহামনীষীর মাজার। কুতুবে আলম শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী, শাহ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী ও ইমামে রাব্বানী মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী।

খলিফাবৃন্দ

তার অনেক খলিফার কথা শোনা যায়। তন্মেধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন–শায়েখ ভুরু, শায়েখ ওমর, শায়েখ আব্দুল গাফুর আজমপুরী, শায়েখ রুকনুদ্দীন, শায়েখ আব্দুল কবির, তিনি বালাপীর নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এরা দু'জন ছিলেন শায়েখের ঔরসজাত সন্তান আবার রুহানী সন্তান। এমনিভাবে হযরত জালালুদ্দীন থানেশ্বরীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২৬) শায়েখ জালালুদ্দীন ইবনে মাহমুদ ওমরী থানেশ্বরী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তিনি ছিলেন বলখের অধিবাসী, আবার শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর বিশিষ্ট খলিফা। বংশগত দিক থেকে ছিলেন ফারুকী। তার পিতা কাজী মাহমুদ ছিলেন বিশিষ্ট আলেম। নুজহাতুল খাওয়াতিরের লেখক তার পিতার নাম লেখেন মুহাম্মাদ। ৮৯৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হেফজ করেন। সতেরো বছর বয়সে উলুমে জাহেরা সমাপ্ত করে তাদরীস ও ইফতায় মশগুল হয়ে যান। সঙ্গে তালীফ ও তাসনীফের কাজও শুরু করেন। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজকার ও সময়ের পাবন্দি ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক্তেবায়ে

www.maktabatulabrar.com

সুন্নাতের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন চিশতী মাশায়েখের জীবন্ত নমুনা। কেমন যেন তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

একবার অসুস্থ হয়ে গেলে ঔষধ পেশ করা হলো। তিনি ছিলেন তখন শয্যাশায়ী, উঠে বসা ছিল কষ্টকর। কিন্তু যেমন করে হোক বসানোর জন্য খাদেমদের নির্দেশ দেন। বহু কষ্টে বসে ঔষধ সেবন করেন। পরে বলেন, রসূল সা. থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে, তিনি খাটে শুয়ে কিছু খেয়েছেন। রিয়াজত মুজাহাদার আধিক্যে একদম দুর্বল হয়ে যান। প্রায়ই শুয়ে থাকতেন, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, নামাজের সময় দেহে শক্তি ফিরে পেতেন এবং অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে নামাজ পড়তেন।

বয়াত ও ইবাদাত

তার বয়াত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যেহেতু জাহেরী ইলমের ইমাম ছিলেন, তাই এক মাদ্রাসায় খেদমত করতেন। সর্বদা তালিবে ইলমদের ভিড় লেগে থাকত। সেখানকার কিছু লোক শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর হাতে বয়াত ছিল। শায়েখ একবার সেখানে আগমন করেন। তিনি জানতে পেরে শায়েখের মুরিদদের বলেন, শুনতে পেলাম, তোমাদের পীর সাহেব এসেছেন, তিনি নাকি নাচেনও? (মূলত ভাবের ঘোরে আচ্ছন্নতাকে তিনি নাচ বলে ব্যক্ত করেছেন।) তাকে আমার সালাম বলো আর বলো সুযোগ পেলে আমি নিজেও আসব। খাদেমগণ সালাম পৌঁছে দিলেন। শায়েখ জবাব দিলেন, সঙ্গে একথাও বললেন, পীর নিজে নাচেন, অন্যদেরও নাচান।

ঘটনাক্রমে একদিন শায়েখ গায়েবী সুসংবাদ পান–মাওলানা জালালকে তোমাকে দান করলাম, তাকে নিজের হালকায় নিয়ে এসো। নির্দেশ পেয়ে তিনি মাদ্রাসায় যান। সেখানে ছাত্ররা তাকে ঘিরে রেখেছিল। দরস থেকে ফারেগ হয়ে শায়েখের অভিমুখী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন পীর? শায়েখ বলেন, আমি সেই নাচনেওয়ালা পীর। একথা বলে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে তাওয়াজ্জুহ দেন। ফলে তার সমস্ত উলুম অপসৃত হয়ে যায়। এতে তিনি ঘাবড়ে যান এবং অনুনয়-বিনয় শুরু করেন। তিনি তখন তাকে সান্ত্বনা দেন এবং উলুমে হাকিকীর প্রকাশ ঘটান। এভাবে কয়েক বার তাওয়াজ্জুহ দেয়ার পর তাকে জিকির-শোগলের তালীম দেন এবং খালওয়াত ও মুজাহাদার নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর তার মাঝে এক ধরনের আত্মবিলোপ দেখা দেয়। তিনি নিজের হালত শায়েখকে অবগত

করতে থাকেন আর শায়েখও এসলাহ করতে থাকেন। তার মাঝে আত্মবিলোপ ও ভাবতন্ময়তা ছিল প্রবল।

কারামাত

তিনি ছিলেন সাহেবে কারামাত বুযুর্গ। একবার তার এক মুরিদের মনে সন্দেহ দেখা দিল, আগের যুগে এমন বুযুর্গ হতেন যার দিকে দৃষ্টি দিতেন সাহেবে কামাল হয়ে যেত। শায়েখ কীভাবে যেন তার সন্দেহের ব্যাপারে অবগত হলেন। একদিন বলেন, এখনো তেমন বুযুর্গ আছেন। একথা বলে তিনি তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান, ফলে তিন দিন সে পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে থাকে। কয়েক দিন পর তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তার ইন্তিকালের খবর শুনে শায়েখ বলেন, এমন দৃষ্টির ভার সবাই সইতে পারে না। বেচারাও সইতে পারেনি।

থানেশ্বরে একটা মেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু সমবেত হতো। শায়েখ একবার খাদেমদের জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার, এখানে এত হিন্দু সমবেত হলো কেন? তারা জবাব দিল, এখানে তাদের ধর্মীয় মেলা বসে, তবে এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়, সে কারণে এত ভিড় হয়। সেটা হলো এক যোগী আসেন, যিনি বহু জনপ্রিয়। তার মাঝে অলৌকিক ক্ষমত আছে। তিনি জমিনে ডুব দিয়ে চলাচল করতে পারেন। এখানে ডুব দিয়ে ওখান দিয়ে ওঠেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, চলো, আমরাও এ তামাশা দেখে আসি। লোকেরা অবাক হলো, শায়েখও এমন তামাশা দেখবেন! কিন্তু কে আপত্তি করবে? শায়েখ বলেন, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো যেখানে তেলেসমাতি দেখায়। খাদেমরা তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিল যেখানে যোগী ডুব দেয়। যথাসময়ে যোগী ডুব দিল। ডুব দিতেই জমিন ফেটে গেল এবং সে অদৃশ্য হয়ে গেল। শায়েখ ঝট করে সেখানে নিজের পা ঠুকে দিলেন। ফলে যোগী আর বের হতে পারল না। সেখানেই ঢুকে রইল এবং মারা গেল। তিনি নিজের কাজ সেরে চলে আসেন।

এরশাদুল লাতায়েফ তার লিখিত কিতাব। সেখানে এক জায়গায় লিখেন, আশেক লোকেরা কাশ্‌ফ কারামতের পিছনে পড়ে না। তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকে ইবাদত-বন্দেগী ও যুহুদ-তাকওয়ার দিকে। তারা এসব কাজ কোনো অবস্থায় ছাড়েন না, বরং নিজেদের নফসকে হালাক করে দেন এবং মৃত্যুর আগেই মরে যান। এটি হল সেই কথা যা বলা হয়,

موتوا قبل ان تموتوا

www.maktabatulabrar.com

'তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করো।'

তিনি আরো লেখেন, জাহেল সূফীরা রাস্তা ভুলে মানুষকে গোমরাহ করে। পূর্ববর্তী শায়েখদের কথায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। শায়েখগণ বলেন, জাহেল সূফীরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, কারণ তারা শরীয়তের উসুল ছেড়ে দেয়। উসুল হলো, শরীয়তের পাবন্দি করা।[১]

ইন্তিকাল

তিনি চৌদ্দ বা বাইশ বা পঁচিশে জিলহজ ৯৮০ হিজরী বা ৯৮৯ হিজরিতে জুমার দিন ৯৫ বা ৯৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। নুজহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থের লেখকের মতে তিনি ৯৬৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

(২৭) শায়েখ নেজামুদ্দীন ইবনে আব্দুশ শাকুর থানেশ্বরী রহ.

শায়েখ নেজামুদ্দীন ইবনে আব্দুশ শাকুর ওমরী বলখী থানেশ্বরী ছিলেন চিশতী শায়েখদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ইলম-আমল ও রিয়াযত-মুজাহাদায় ছিলেন প্রসিদ্ধ। ১০০৭ হিজরিতে হেজায সফর করেন। ১০২০ হিজরিতে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। বিজপুর হয়ে যাওয়ার পথে ইবরাহিম আদেল শাহ তাকে খুবই সম্মান করেন। পরে থানেশ্বর গিয়ে দরস-তাদরীসে মশগুল হয়ে যান।[২]

তিনি ছিলেন উলুমে জাহেরী ও বাতেনীর জামে (সমন্বিত ব্যক্তি)। উলুমে মারেফত ছাড়াও পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য ইলমেও তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। হিংসুকরা তাকে হিংসা করত এবং অনেক জ্বালাতন করত। তার ব্যাপারে বাদশা আকবরের কাছে বার বার অভিযোগ করত। ফলে বাদশা তাকে দু'বার হিন্দুস্তান থেকে বের করে দেন। প্রথমবার তিনি হারামাইন শরিফাইনে চলে যান। সেখানে যিয়ারত সেরে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। পরে আবারো তাকে মাওয়ারাউন নাহার-এর দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সেখানেও হিংসুকরা তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে এবং বলখের গভর্নরের কাছে অভিযোগ করে। গভর্নর তাকে তাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু স্বপ্নযোগে রসূল সা. তাকে নিষেধ করেন। এই স্বপ্ন দেখে গভর্নর তার ভক্ত ও মুরিদ হয়ে যান।

১. নুজহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৪।
২. নুজহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৫৫।

বয়াত ও খেলাফত লাভ

তরিকতের তালীম নেন শায়েখ জালালুদ্দীন ওমরী থানেশ্বরীর কাছ থেকে। পরে তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন শায়েখের ভাতিজা ও জামাতা। তার পিতা শাহ আব্দুশ শাকুরও ছিলেন শায়েখ থানেশ্বরীর মুজায (এজাযতপ্রাপ্ত)। প্রায়ই উলুম ও আসরার বর্ণনা করতেন। অনেক খাদেম তার মালফুজাত লিখে রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, জাহেরী ইলম তিনি অর্জন করেননি, বরং ইলম ছাড়াই কামাল অর্জন করেছেন। নফি ইছবাত[1] ও জোরে জিকির ছিল তার রাতদিনের মামুল। একমাস পর্যন্ত কঠিন মুজাহাদা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি একমাস ছিলেন।

তার কারামত ছিল এমন, নামাজের সময় হলে ফেরেশতা আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হত এবং তার সঙ্গে জামাতের সাথে নামাজ পড়ত। তিনি নিজের শায়েখের কাছ থেকে ছয় মাসের অনুমতি নিয়েছেন, হয় ইতিমধ্যে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছবেন, নয় মরে যাবেন। তিনি বলেন, এক শ্বাসে ইসমে জাত নব্বই বার বলে শুরু করো। পরে সাধ্যানুযায়ী দৈনন্দিন উন্নতি করতে থাক। তিনি এক শ্বাসে তিনশ বার, কেউ বলেন, চারশ বার পর্যন্ত বলতে পারতেন। এক মাস যেতে না যেতেই খাস তাজাল্লি প্রকাশ পায়। তাকে বেশি তাখলিয়া (নির্জনতা অবলম্বন) করতে হয়নি, কারণ শায়েখ নিষেধ করেছেন। মানুষকে এরশাদ ও তালকীনের আদেশ করেছেন।

বর্ণিত আছে, শায়েখ জালালুদ্দীন সমস্ত খলিফা ও মুরিদদের নিজের জীবদ্দশায় শায়েখ নেজামুদ্দীনের হাওলা করে দেন। শায়েখ নেজামুদ্দীন তাদের তালীম ও তালকীন করেন। হিন্দুস্তানে নিজের স্থলাভিষিক্তের জন্য শায়েখ আবু সাঈদ গাঙ্গুহীকে পূর্ণতায় পৌঁছান। যার দিকে দৃষ্টি দিতেন এক মুহূর্তে মাকামে শুহুদে পৌঁছে যেত। এজন্য কেউ কেউ তাকে অলি তরাশ তথা অলিগড় (অলি বানানেওয়ালা) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তার সন্তানাদি ছিল অনেক। বড় ছেলে শায়েখ মুহাম্মাদ সাঈদ বলখ থেকে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন এবং স্বদেশ থানেশ্বরে বসতি স্থাপন করেন। তার ছোট ভাই শায়েখ আব্দুল হক কিরনালে বসতি স্থাপন করেন। অবশিষ্ট ছেলেরা থেকে যান বলখে।

১. লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর যিকিরকে নফী ইছবাত-এর যিকির বলা হয়। – সম্পাদক

www.maktabatulabrar.com

লিখিত কিতাবাদি

তিনি বহু কিতাব লিখেছেন। শরহে সাওয়ানেহে গাজালী, লুমআতের দুটি শরাহ মক্কী ও মাদানী, রিয়াজে কুদসী, তাফসীরে নেজামী, রেসালায়ে হাকিকত ও রেসালায়ে বলখিয়া ইত্যাদি তার প্রসিদ্ধ কিতাব।

ইন্তিকাল ও মাজার

তিনি ৮ই রজব ১০২৪ বা ১০৩৫ হিজরী অথবা ১০৩৬ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তার মাজার বলখে অবস্থিত। তার খলিফাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন– সাহেবজাদা শায়েখ আব্দুল করিম, সাইয়েদ আলী গাওয়াস, যিনি বলখে বসবাস করতেন; শাহ আবু সাঈদ, যিনি গাঙ্গুহে অবস্থান করতেন; শায়েখ আল্লাহদাদা কাজী সালেম।

(২৮) শাহ আবু সাঈদ নোমানী নওশেরওয়ানী গাঙ্গুহী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন নোমানী। ইমাম আজম আবু হানিফা পর্যন্ত পৌঁছে তার পবিত্র বংশধারা। পিতার নাম শায়েখ নুরুদ্দীন ইবনে শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী। মাতা ছিলেন শায়েখ জালালুদ্দীন থানেশ্বরীর মেয়ে। জন্ম ও বেড়ে ওঠেন গাঙ্গুহে। প্রথম দিকে কিছুদিন সৈনিক বিভাগে চাকরি করেছেন। শুরু থেকেই তার মাঝে ছিল এশকে এলাহীর প্রাবল্য। কিছুদিনের জন্য আত্মগোপনে ছিলেন। পরে শায়েখ জালালুদ্দীনের খেদমতে উপস্থিত হন। একসময় শায়েখ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে নিজের সব মুরিদকে শায়েখ নেজামুদ্দীনের হাওলা করে দেন। সে হিসাবে শায়েখ আবু সাঈদকেও হাওলা করে দেন। একসময় শায়েখ নেজামুদ্দীন বলখে চলে যান। ফলে তিনি শায়েখের বিচ্ছেদে খুবই বিমর্ষ থাকতেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদ-বেদনায় তার সাধনা-মুজাহাদা সবই ছুটে যায়।

বলখে রওয়ানা

ঘটনাক্রমে একবার নিজের পূর্বপুরুষ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর মাজারে উপস্থিত হন। শায়েখের কাছ থেকে বলখে হাজির হওয়ার গায়েবী নির্দেশ পান। একাধারে তিন দিন পর্যন্ত নির্দেশ পেতে থাকেন। অবশেষে শায়খুল মাশায়েখের নির্দেশনায় পায়ে হেঁটে বলখে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছলে শায়েখ নেজামুদ্দীন কাশফের মাধ্যমে তার উপস্থিতির কথা

জানতে পারেন। এমনকি নিজের দাদা পীর শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর পক্ষ থেকে তার সম্পর্কে কতিপয় হেদায়েত লাভ করেন। শায়েখের নির্দেশে তিনি তাকে এস্তেকবালের জন্য যান, সঙ্গে বলখের সুলতানও যান। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন শায়েখের একনিষ্ঠ ভক্ত।

শায়েখ নেজামুদ্দীন তাকে অনেক আদব এহতেরাম করেন। সঙ্গে একথাও বলেন, এই খাতির-যত্ন সবই হচ্ছে তোমার দাদা পীরের নির্দেশে। গায়েবী নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তিনদিন অত্যন্ত খাতির-যত্ন করেন এবং ভরপুর মেহমানদারী করেন।

কয়েক দিন অতিবাহিত হলে শাহ আবু সাঈদ আরজ করেন, হযরত! আমি গাঙ্গুহ থেকে পায়ে হেঁটে দাওয়াত খাওয়ার জন্য আসিনি। শায়েখ নেজামুদ্দীন জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি বলেন, আমি সেই দৌলত নেয়ার জন্য এসেছি, যা আপনি আমাদের ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন। একথা শুনতেই শায়েখের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। বললেন, সাহেবজাদা! যদি সেই দৌলত নিতে চাও, তাহলে এই শান-শওকত ত্যাগ করো। আজ থেকে বাথরুমের দায়িত্ব অর্পণ করলাম তোমার ওপর, এখন গিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করো। খানকার পরিচালককে বলে দিলেন, তাকে সকাল সন্ধ্যায় লঙ্গরখানা থেকে রুটি দেবে। পরে বলেন, যতক্ষণ না আমি অনুমতি দিচ্ছি আমার সামনে আসবে না। না জিকির অজিফা দিলেন, না অন্য কোনো আমল। শুধু নামাজ রোজা করতেন আর বাথরুম পরিষ্কার করতেন। এভাবে এক যুগ কেটে গেল।

একদিন শায়েখ মেথরকে বলে দিলেন, আজ ময়লার টুকরি আবু সাঈদের মাথায় ঢেলে দেবে। মেথর তেমনই করল। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আজ গাঙ্গুহ হলে দেখতে মজা! মেথর শায়েখের কাছে বলে দিলেন আবু সাঈদ এমন কথা বলেছে। শায়েখ বলেন, এখনো দেমাগে খান্নাস বাসা বেঁধে আছে। গাঙ্গুহের নবাবী এখনো যায়নি। তখন আরো কয়েকটি বাথরুমের দায়িত্ব দেন। এভাবে কেটে গেল বহু দিন। আরেকদিন মেথরকে নির্দেশ দেন, তার মাথায় ময়লা ঢেলে দেবে। মেথর তেমনই করল। তখন তিনি মুখে কিছু বলেননি, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখেন। শুনে শায়েখ বলেন, এখনো কিছুটা বাকি আছে। পরে আরেক যুগ অতিবাহিত হলো। আরেকদিন শায়েখ মেথরকে একই নির্দেশ দেন। মেথর টুকরির সমস্ত ময়লা তার মাথায় ঢেলে দিল। তখন

www.maktabatulabrar.com

তার নফস বলতে কিছুই ছিল না। ময়লা যেটা নিচে পড়েছে সেটাও গায়ে মাখতে শুরু করল। মেথর গিয়ে শায়েখের কাছে অবস্থা বর্ণনা করল। তখন শায়েখ বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, প্রথম ধাপ পেরিয়েছে। বাস্তবেই সুলুকের পথে অহংকার বড় বাধা। এটা সেরে গেলে সুলুকের পথ অতি দ্রুত অতিক্রম করা যায়।

এত মুজাহাদার পর শাহ আবু সাঈদের শুধু এতটুকু অনুমতি মিলেছে, শায়েখের মজলিসে বসতেন এবং ওয়াজ শুনতেন। কিছুদিন পর জিকিরের তালীমও দিলেন। জিকির শুরু করতেই হালত দেখা দিতে লাগল। শায়েখ বুঝতে পারলেন, তার মাঝে উজ্ব (আত্মগরিমা) পয়দা হয়েছে। ফলে জিকির-শুগল বন্ধ করে দিলেন এবং শিকারী কুকুরের খেদমত অর্পণ করলেন। একদিন শাহ আবু সাঈদ কুকুরটি নিয়ে গেলেন জঙ্গলে। রাস্তায় শিকার দেখে কুকুর ছুটতে শুরু করল। তিনিও কিছুদূর কুকুরের শিকল ধরে দৌড়লেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। শিকারী কুকুর ছিল খুবই শক্তিশালী। তিনি ভাবলেন, শিকল ছুটে গেলে তো কুকুর ভেগে যাবে, ফলে শায়েখ নারাজ হবেন। তাই তিনি শিকল কোমরে বেঁধে নিলেন। কিছুদূর পর্যন্ত এভাবে দৌড়লেন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেলেন। পরে অবস্থা হলো এমন, কুকুর ছুটছে আর তিনি হেঁচড়ে যাচ্ছেন। কখনো গর্তে পড়ে যাচ্ছেন, কখনো কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। এমতাবস্থায় তার ওপর গায়েবী সাহায্য এলো। একটা বিশেষ তাজাল্লী তাকে বেষ্টন করে নিল। ফলে তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল।

এদিকে শায়েখের সামনে বিষয়টা কাশফ হয়ে গেছে। তিনি খাদেমদের বললেন, আবু সাঈদের ওপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ হয়েছে। আল্লাহ পাক এক বিশেষ তাজাল্লীতে তাকে ধন্য করেছেন। তোমরা যাও, তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করো। খাদেমগণ তো ওদিকে দৌড়াচ্ছেন, এদিকে শায়েখের ওপর শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর রুহানিয়্যত কাশ্‌ফ হয়ে গেছে। তিনি বলছেন, নেজামুদ্দীন! যদিও তুমি এরচে' বেশি পরীক্ষা করতে পারো, কিন্তু আমি তো তোমাকে এতটা পরীক্ষা করিনি! এটা ছিল তার মহব্বতপূর্ণ তিরষ্কার। ফলে শায়েখ নেজামুদ্দীনের মনে ভীষণ প্রভাব পড়ে। তিনি শাহ আবু সাঈদকে বুকে চেপে ধরেন যখন তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে আসেন। পরে তাকে জিকির-শুগলের তালীম দেন এবং যথেষ্ট খাতির যত্ন করেন।

সেদিনের মত তাজাল্লির প্রতি শাহ আবু সাঈদের খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি চাইতেন এমন তাজাল্লি যেন আবারো হয়। প্রতিদিন জিকির করে সেটার প্রতীক্ষায় থাকতেন। কয়েক দিনেও যখন হলো না তখন একদিন শ্বাস বন্ধ করে বসে থাকেন। অঙ্গীকার করেন, যতক্ষণ না তাজাল্লি হচ্ছে শ্বাস ছাড়বেন না, চাই দম বেরিয়ে যাক। এমন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি দম বন্ধ করে বসে থাকেন। অবশেষে তাজাল্লি হয়েছে। খুশিতে এত জোরে শ্বাস ফেলেন যে, মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন গায়েব থেকে একটি হাত এলো যাতে চামচে ঔষধ ছিল। সেই ঔষধ তার মুখে ঢেলে দেয়া হলো। ঔষধ খেতেই হাড় জোড়া লেগে গেল। সঙ্গে এ নির্দেশও এলো, চুজার ঝোল কয়েক দিন পান করতে থাক। এই হালত চলে গেলে তিনি শায়েখকে ঘটনাটি শোনান। শায়েখ তৎক্ষণাৎ তাকে চুজার ঝোলের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত সেটা পান করেন।

অবশেষে শায়েখ তাকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে নিজের নায়েব হিসাবে গাঙ্গুহে পাঠিয়ে দেন। ফেরার পর দীর্ঘদিন তিনি গুমনাম হয়ে থাকেন। পরে শায়েখ মুহাম্মাদ সাদেক সর্বপ্রথম তার হাতে বয়াত হন। এরপর মানুষের আগমন শুরু হয়।

ইন্তিকাল

২রা রবিউল আউয়াল বা রবিউস সানী ১০৪০ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। গাঙ্গুহে তার মাজার আছে। তার বিখ্যাত খলিফাগণ হলেন– শায়েখ মুহাম্মাদ সাদেক গাঙ্গুহী, শায়েখ ইবরাহিম রামপুরী, শায়েখ খাজা মুহিবুল্লাহ ইলাহাবাদী, শায়েখ ইবরাহিম সাহারানপুরী ও শায়েখ খাজা পানিপতী।[১]

(২৯) শায়েখ খাজা মুহিবুল্লাহ ওমরী ইলাহাবাদী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

মুহিব্বুল্লাহ ইবনে মাবারিয ইবনে পীর। তিনি ছিলেন খাজা ফরিদুদ্দীন মাসউদ ওমরীর বংশধর। ৯৯৬ হিজরির ২রা সফর সোমবার খায়রাবাদ জেলার সফরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই লেখাপড়া শুরু করেন।

১. নুজহাতুল খাওয়াতের, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬৯।

www.maktabatulabrar.com

পরে লাহোর সফর করেন। সেখানে পড়াশোনা করেন মুফতী আব্দুস সালাম লাহোরীর কাছে। তার দরসসঙ্গী ছিলেন শায়েখ মুহাম্মাদ মীর ও সাদুল্লাহ খান তামীমী, যিনি পরবর্তীতে মন্ত্রী হয়েছেন। পরে শায়েখ মুহিব্বুল্লাহ দিল্লি চলে যান। সেখানে গিয়ে নেজামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তাকে ইলাহাবাদে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

শায়েখের সন্ধানে

জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ হয়ে বাতেনী ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তখন তিনি দিল্লিতে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর মাজারে গিয়ে মোরাকাবা করেন। হযরত কাকী ইলহামের মাধ্যমে বলেন, সাবেরিয়া সিলসিলায় আজকাল শায়েখ আবু সাঈদ গাঙ্গুহীর বাজার খুব গরম। তুমি সেখানে যাও। সেমতে তিনি গাঙ্গুহে উপস্থিত হন এবং শায়েখ আবু সাঈদের হাতে বয়াত হন। দীর্ঘদিন তার সোহবতে থেকে তরিকতের সুউচ্চ স্তরে উপনীত হন। পরে সদরপুরে সববাস করতে শুরু করেন। তারপর এলাহাবাদ গিয়ে যমুনা নদীর তীরে বসবাস করতে থাকেন। দীর্ঘদিন তিনি অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে কাটান। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে রিজিকের প্রশস্ততা দান করেন।[১]

উদ্দেশ্য সাধনা

তিনি ছিলেন শায়েখের বিশিষ্ট খলিফা। কিছুদিন মাত্র হয়েছে বয়াত হয়েছেন এরই মাঝে শায়েখ একদিন বলেন, মুহিবুল্লাহ! আস, তোমাকে মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছে দেই। একথা বলে তৎক্ষণাৎ তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। শায়েখের অনেক খাদেম ছিলেন যারা দীর্ঘদিন যাবত পড়ে আছেন তারা আরজ করেন, হযরত! আমরা দীর্ঘদিন যাবত পড়ে আছি, অথচ আপনি আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না। এই নতুন আগন্তুক মাত্র কিছুদিন হয়েছে এসেছে, আপনি তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিলেন! শায়েখ বলেন,

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

'এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করেন।'[২]

১. নুজহাতুল খাওয়াতের, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬০৯।
২. সুরা মায়েদা ৫৪।

পরে তাদের নসিহত করে বলেন, সবার হালত এক রকম হয় না। কেউ আছে বহু মুজাহাদার প্রয়োজন হয়। কারো অল্প মেহনতে তাজাল্লি হাসিল হয়ে যায়। অনুমতি দিলেও তার নিজের অনুভূত হলো, আমি এর যোগ্য নই। তবে এজাযতের সঙ্গে শায়েখ তাকে তাওয়াজ্জুহও দেন। ফলে তিনি আরজ করেন, হযরত! এর অতিরিক্ত বহন করার সাধ্য আমার নেই। সুতরাং ক্ষান্ত করুন, ক্ষান্ত করুন!

খেলাফতের সাতটি পদ্ধতি

শোনা যায়, খেলাফতের সাতটি পদ্ধতি যথা–ইসালা, এজাযাহ, ইজমাআন, ওয়ারিসান, হুকমান, তাকাল্লুফান, ওয়াসিয়্যাতান। তন্মধ্যে সর্বশেষ পদ্ধতিতে শায়েখ তাকে খেলাফত প্রদান করেন। এজাযতের পর তিনি দিল্লি চলে যান। পরে নিজের আদি নিবাস সদরপুরে ফিরে আসেন। সেখানে কিছু দিন থেকে চলে যান ইলাহাবাদে। সেখানে বসবাস করা তিনি পছন্দ করতেন। সেখানেই মানুষ তার ফয়েয ও বরকত লাভে ধন্য হয়। তার সিলসিলায় আলেম-উলামার সংখ্যাই বেশি।

হাকিকত ও মারেফত সম্পর্কে তিনি অনেক কিতাবাদি লিখেছেন। তাওহীদের ব্যাখ্যা নিয়ে তার রয়েছে নিজস্ব চিন্তাধারা। আবার শায়েখ ইবনে আরাবীর কথার ব্যাখ্যায় রয়েছে তার নিজস্ব শৈলী। ফলে মানুষ তার ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কেউ বলে তিনি ছিলেন মহান অলী ও বুযুর্গ; হাকিকত ও মারেফতের বিরাট আলেম। আবার কেউ বলে, তিনি আরেফ ছিলেন ঠিক, কিন্তু উপস্থাপনায় ভুল করেছেন। এমনকি তিনি যিন্দিকের পাঁকে পড়ে গেছেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন গোমরাহ।[১]

ইলাহাবাদে বিশ বছর ফয়েয দেয়ার পর ১০৫৪ হিজরী বা ১০৫৮ হিজরির ৯ই রজব বৃহস্পতিবার সূর্য ডোবার সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। ইলাহাবাদে তার মাজার আছে।

(৩০) মাওলানা শায়েখ সাইয়েদ মুহাম্মাদী আকবরাবাদী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সাইয়েদ। ১৪ই শাওয়াল ১০২১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

১. নুজহাতুল খাওয়াতের খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬০৯।

www.maktabatulabrar.com

প্রথম জীবন কেটেছে স্বাধীন স্বেচ্ছাধীন। তার পিতা শায়েখ ঈসা হারগামী প্রায় তাকে সর্তক করতেন। একদিন খুব বেশি সর্তক করলে তার মাঝে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায়। তখনই ইলমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ হয়ে তিনি বাতেনী ইলমের প্রতি আগ্রহী হন এবং খাজা মুহিবুল্লাহর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মারেফত হাসিল করেন।

একাধারে চৌদ্দ বছর তিনি শায়েখের খেদমতে ছিলেন। শায়েখের সবরকম খেদমত করেছেন। শায়েখ তার ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন যা একজন মুরিদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দীর্ঘদিনে শুধু একবার পিতার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ি হারগামে যান।

সফরের প্রতি তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। প্রায়ই সফর করতেন। আমরুহাবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আকবরাবাদ ছেড়ে কিছুদিন সেখানে গিয়েও থাকেন। একসময় এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়–কিছুদিন আমরুহায় থাকেন তো কিছুদিন আকবরাবাদে থাকেন। শেষ জীবনে অবশ্য আমরুহায় বাড়ি বানিয়ে নেন।

যোগ্য লোকদের হিংসুক হয় বেশি। হিংসুকরা বাদশাহ আলমগীরের দরবারে তার ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং তাকে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত করে। বাদশাহ তাকে হারামাইন শরিফাইনে যিয়ারতের জন্য পাঠিয়ে দেন। ১০৯০ হিজরিতে তিনি হারমাইন চলে যান এবং পাঁচ বছর পর ১০৯৫ হিজরিতে ফিরে আসেন। সেই সফরে স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। সেখানে তার দুই পুত্র শাহ মুহাম্মাদ মক্কী ও শাহ মুহাম্মাদ মাদনী জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্তানে ফিরলেও হিংসুকরা তার ব্যাপারে নিরস্ত হয়নি। আবারো তার ব্যাপারে ভীতিজনক সংবাদ বাদশার কর্ণগোচর করে। ফলে বাদশাহ তাকে আওরঙ্গবাদ জেলখানায় বন্দি করে রাখেন। বন্দি অবস্থায় ৩রা রজব ১১০৭ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার কফিন আগ্রার আকবরবাদে পাঠানো হয়। সেখানে মতিকাটরায় তার মাজার অবস্থিত।

(৩১) শাহ মুহাম্মাদ মক্কী জাফরী ইবনে শাহ মুহাম্মাদী রহ.

বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সাইয়েদ। পিতা শাহ মুহাম্মাদী ছিলেন তার মুরশিদ। তার জন্ম যেহেতু মক্কা শরিফে হয়েছে তাই মুহাম্মাদ মক্কী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। শাজারায় শাহ আদজুদ্দীন ও শাহ মুহাম্মাদীর মাঝখানে তার সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু মাকাসিদুস সাদেকীনের লেখক শাহ আদজুদ্দীন লেখেন, অধম বান্দা ইশকে হাকিকীর শরাব পান করি আমার

পীর ও মুরশিদ শায়েখ মুহাম্মাদীর কাছ থেকে। এ ধরনের কথা অন্যান্য কিতাবেও পাওয়া যায়। যার দ্বারা বুঝে আসে শাহ আদজুদ্দীন সরাসরি শাহ মুহাম্মাদী থেকে এজাযত লাভ করেছেন।

তালীমুদ্দীনেও হযরত থানবী তাই লিখেছেন। তিনি লেখেন, এখানে এসে আমাদের সিলসিলার শাজারায় কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ কেউ শায়েখ মুহাম্মাদ হামেদ ও আদজুদ্দীনের মাঝে মুহাম্মাদ মক্কীকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কেউ শুধু শাহ হামেদের নাম নেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, শাহ আদজুদ্দীন সরাসরি খেলাফত লাভ করেছেন শাহ মুহাম্মাদী থেকে। এতে বুঝা যায়, তাদের মাঝে অন্য কেউ নেই। কেননা এতে চিরাচরিত তারতীব ফওত হয়ে যায়। বিস্তারিত তাহকীক নুখবাতুত তাওয়ারিখ আমরুহা থেকে উদঘটন করা হয়েছে। সেখানে আছে, শাহ মুহাম্মাদী ও শাহ মুহাম্মাদ হামেদ ছিলেন আপন ভাই। শাহ মুহাম্মদ হামেদ এজাযত ও খেলাফত লাভ করেছেন নিজের ভাই থেকে। হারামাইন থাকাকালে শাহ মুহাম্মাদীর দুই ছেলের জন্ম হয়। শাহ মুহাম্মাদ মক্কী যার আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য। অন্যজন হলেন রওশন মুহাম্মাদ মাদানী। তারা উভয়ে খেলাফত লাভ করেছেন পিতা শাহ মুহাম্মাদী থেকে। শাহ মুহাম্মাদ হামেদের এক ছেলে ছিল আদজুদ্দীন নামে। যার আলোচনা সামনে আসবে। তিনি খেলাফত লাভ করেছেন নিজের চাচা শাহ মুহাম্মাদী থেকে। পিতার কাছ থেকেও ফুয়ুয হাসিল করেছেন। শাহ মুহাম্মাদী ও শাহ আদজুদ্দীনের মাঝে অন্য কোনো সূত্র থাকার কথা স্পষ্ট নেই। তিনি সরাসরি শাহ মুহাম্মাদী থেকে খেলাফত লাভ করেছেন। যারা তাদের মাঝে শাহ মুহাম্মাদ মক্কীর সূত্র আনেন তাদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো, শাহ আদজুদ্দীন ফয়েয লাভ করেছেন শাহ হামেদ থেকে আর শাহ হামেদ নিজের ছোট ভাই মুহাম্মাদী থেকে। সম্ভাবনা আছে, শাহ আদজুদ্দীন বিনা সূত্রে শাহ মুহাম্মাদী থেকে এজাযত লাভ করেছেন। কিন্তু তাকমীলে ফুয়ুযের জন্য নিজের চাচাতো ভাই শায়েখ মুহাম্মদ মক্কী থেকেও এজাযত লাভ করেছেন।

তার অপর ভাই মদিনা মুনওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রওশন মুহাম্মাদ মাদানী। তার নাম কেউ কেউ লিখেছেন, সাদ মুহাম্মাদ মক্কী। তার মৃত্যু তারিখ সাধারণ কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে কোনো কোনো কিতাবে ১১ই রজব লেখা আছে। তার মাজার আমরুহে অবস্থিত।

www.maktabatulabrar.com

(৩২) শাহ আদজুদ্দীন ইবনে শায়েখ হামেদ রহ.

শাহ আদজুদ্দীন ইবনে শায়েখ হামেদ ইবনে শায়েখ ঈসা হারগামী। তার পৈত্রিক নিবাস হারগ্রাম। তবে পিতা শাহ মুহাম্মাদ হামেদ ১০৭৩ হিজরিতে আমরুহে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই বিয়েশাদি করে স্থায়ী হন। শাহ আদজুদ্দীন এখানেই জন্মগ্রহণ করেন ২৪ শে রজব ১০৭৭ হিজরিতে। এজন্য তিনি আমরুহী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

তিনি ছিলেন নিজের মুরশিদ শায়েখ মুহাম্মাদীর আপন ভাতিজা। জাহেরী ইলম ও অন্যান্য শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। প্রথম থেকেই ছিলেন তাকওয়া-তাহারাতের প্রতি আগ্রহী। শাসকদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও বেতন নিতেন না।

এক যোগীর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তার জ্ঞানগুণ ও কামালাত দেখে ভক্ত হয়ে যায়। পরে তার সামনে কিমিয়া (স্বর্ণ বানানোর উপযোগ) তৈরী করে পেশ করে। প্রথমে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বহু পীড়াপীড়ির পর অবশ্য গ্রহণ করেন। একটা পাত্রে রেখে তাকের ওপর রেখে দেন। কয়েক বছর পর যোগী এসে দেখে, সেটা তেমনি তাকের ওপর রাখা, তাতে ধূলোবালি পড়ে আছে। সে আরজ করল, হযরত! এটা কাজে লাগাননি। তিনি বলেন, প্রয়োজন হয়নি। পরে বলেন, আমাদের কাছে এরচে' দামী রসায়ন আছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, সেটা হলো কানাআত তথা অল্পেতুষ্টি।

বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সাইয়েদ। তার প্রসিদ্ধ নাম সাইয়েদ ইজ্জুদ্দীন (عز الدين)। তবে কেউ কেউ বলেন, তার আসল নাম আদজুদ্দীন (عضد الدين)। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

গুণাবলী

আরবী ফার্সি শেখার পর তার মনে সংস্কৃতি শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যদিও এ ভাষা সাবাইকে শেখানো হতো না, বিশেষত কোনো মুসলমানকে তো অবশ্যই নয়, তবুও তিনি বহু কষ্টে বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে এ ভাষা শিখেন। এজন্য অযোদ্ধা ও বেনারস সফর করেন। সংস্কৃতি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে একটা গ্রন্থও রচনা করেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তার কাশ্‌ফও হতো প্রচুর। একবার কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেখার আবেদন করলে বলেন, ইলম শেখা কঠিন। কেননা ইলমের প্রত্যেক প্রকার আয়ত্বে আনা আরো কঠিন।

কাশফের সম্পর্ক যেহেতু ঘটনার সঙ্গে, সুতরাং এটা এমনিতে হাসিল হয়ে যায়। মাকাসিদুল আরেফীন তার লিখিত বিখ্যাত কিতাব, যা ইলমে আকায়েদ ও সুলুকের বিষয়ে লিপিবদ্ধ। ১১২৪ হিজরিতে কিতাবটি লেখা সমাপ্ত হয়, কিন্তু অদ্যাবদি কিতাবটি ছাপা হয়নি।

২৭ শে রজব ১১৭০ হিজরী বা ১২৭২ হিজরিতে প্রায় একশ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। আমরুহার জামে মসজিদের পাশে তার মাজার অবস্থিত।

(৩৩) শায়েখ আব্দুল হাদি ইবনে শায়েখ মুহাম্মাদ হাফেজ রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

শায়েখ আব্দুল হাদি ইবনে শায়েখ মুহাম্মাদ হাফেজ। বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সিদ্দিকী। শাহ আদজুদ্দীনের খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরুহার কুরাইশিয়ান মহল্লায় ১৪ই রজব ১০৮৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তখন তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। ইতিমধ্যে একদিন কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাহ মুহাম্মাদী তাদের ঘরে আসেন। তিনি নামাজে দাঁড়ান কেবলার দিক থেকে কিছুটা সরে। কারণ তার দৃষ্টিশক্তি ছিল কিছুটা ক্ষীণ। চার বছরের শিশু আব্দুল হাদি তাকে কেবলার দিক ঠিক করে দেয়। নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে তিনি তার মাকে সুসংবাদ দেন, এই ছেলে একদিন জাতির ইমাম হবে, একটা বিরাট দলকে হেদায়েত করবে। তার ব্যাপারে দাদা পীরের কথা এমনই কবুল হয়েছে যে, তখন থেকে তার মাঝে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

তালীম তরবিয়ত

অল্প বয়সেই পিতা তাকে মক্তবে ভর্তি করে দেন। মক্তবে প্রাথমিক ফার্সি মুফাররাহুল কুলুব ও গুলিস্তার দুই অধ্যায় মাত্র পড়েছেন। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। একদিন হাফেজ সাহেব কোনো কাজে বাইরে গেছেন। ইতিমধ্যে এক ভিক্ষুক এলো। বাচ্চারা তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ভিক্ষুক কিছু চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে দিল। তিনি ভয়ে সেটা খেয়ে নেন। সেটা গলা দিয়ে নামতেই তার মাঝে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার হলো। মানুষের প্রতি ভীতি এবং লোকালয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেল। ফলে তিনি মরুভূমির দিকে চলে যান এবং নুরদী মরুভূমিতে থাকতে থাকেন।

www.maktabatulabrar.com

বয়াত ও খেলাফত

আমরুহার পাশে এতিম শাহ নামে এক মাজযুব থাকতেন। ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাকে সঙ্গে রাখতে। সেমতে দীর্ঘদিন তিনি তার কাছে থাকেন। পরে বলেন, আমার সিলসিলা পাঁচ স্তরে গিয়ে শায়েখ নেজামুদ্দীন বলখীর সঙ্গে মিলে। সুতরাং তুমি শাহ আদজুদ্দীনের হাতে বয়াত হয়ে কামালাত অর্জন করো। নির্দেশে মোতাবেক তিনি আমরুহায় গিয়ে শায়েখের হাতে বয়াত হন।

একবার অর্ধরাতে শায়েখের পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ আরজ করেন, হযরত! দোয়া করুন, আমি যেন আত্মম্ভরিতার কয়েদ থেকে মুক্তি পাই। হযরত এরশাদ করেন, সম্পর্ক তো লাগিয়ে রেখেছ আবার আমাদের মত হওয়ার আশাও করছ। জবাবে তিনি বলেন, হযরত! আমার তো তামান্না আপনার গলির কুকুরের মত হওয়ার। কথাটি শায়েখের খুবই পছন্দ হলো। কিছুদিন পর তিনি তাকে খেলাফত ও এজাযত দিয়ে ধন্য করেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন সাহেবে কাশফ। মানুষের বিপদাপদ আগে থেকেই টের পেতেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিকার বলে দিতেন।[১]

একাকিত্ব পছন্দ করার কারণে প্রায়ই মরুভূমিতে গিয়ে থাকতেন। একবার হুজুর সা. স্বপ্নযোগে বলেন, লোকালয়ে থেকে মানুষের উপকার করো। নির্দেশ মোতাবেক তিনি লোকালয়ে চলে আসেন এবং বরাহী নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। কখনো কখনো অন্যত্র যেতেন। ফলে বরাহীতে থাকা হতো খুব কম। তার খাদেম ও মুরিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাদের পীড়াপীড়িতে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। অনেক লোক এসে বয়াত হতো, উপকৃত হতো।শেষ জীবনে বেরেলীর কাজী ও শায়খুল ইসলাম প্রমুখের জোর আবেদনের প্রেক্ষিতে বেরেলী আসেন এবং খাইখীরা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। সেখানে থাকাকালীন অসুস্থতা দেখা দেয়।

১. অর্থাৎ কিছু কিছু বিষয়ে তার কাশ্‌ফ হতো, সব গায়েবী বিষয় তিনি জানতেন তা উদ্দেশ্য নয়। অতএব এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে, তিনি আলেমুল গায়েব ছিলেন। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত কেউ আলেমুল গায়েব নয়। কিছু কিছু বিষয় কাশফ হওয়ার দ্বারা কেউ আলেমুল গায়েব হয়ে যায় না। আলেমুল গায়েব সেই সত্তা যিনি সব গায়েবী বিষয় নিজের থেকেই অবগত। – সম্পাদক

পরে ৪ঠা রমজান ১১৯০ হিজরিতে জুমার দিন ইন্তিকাল করেন। তাকে বেরেলীতে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু রমজানের পর তার লাশ লোকেরা সেখান থেকে আমরুহায় স্থানান্তর করে। এখন আমরুহায় শায়েখ জহুরুল্লাহ সিদ্দিকীর বাগানে তার মাজার।

(৩৪) শাহ আব্দুল বারি সিদ্দিকী ইবনে শায়েখ জহুরুল্লাহ রহ.

শায়েখ আব্দুল বারী সিদ্দিকী ইবনে শায়েখ জহুরুল্লাহ ছিলেন তার সম্মানিত দাদা শাহ আব্দুল হাদীর মুজায (বায়আত করার ইজাযতপ্রাপ্ত)। তারা ছিলেন দুই ভাই। তিনি ছিলেন নাযুক মেজাযের আর অন্য ভাই ছিলেন কঠিন মেজাযের। ফলে শায়েখ আব্দুল হাদি আব্দুল বারী থেকে মুজাহাদা কম নিয়েছেন; তবে তার ভাইকে মুজাহাদা করিয়েছেন বেশি। ১২ বছর বয়সে শায়েখের খেদমতে উপস্থিত হন। শায়েখ তাকে ভালো কাপড় পরিধান করতে বলতেন। তার বাহ্যিক বেশভূষা যদিও ফকিরদের মত ছিল না, কিন্তু অন্তর ছিল আল্লাহ পাকের মহব্বতে ভরপুর। সর্বদা রোজা রাখতেন। শায়েখের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং চিশতীয় সিলসিলার ভক্তদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। দুরুদ পড়ার সময় প্রায় হাসতেন।

ইন্তিকাল

২৮শে মহররম অথবা ১১ই শাবান ১৩২৬ হিজরিতে জুমার দিন ইন্তিকাল করেন। দাদীর মাজারের পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

রহমান বখশ নামে তার এক ছেলে ছিল। তার খলিফা ছিল সাত জন। শাহ আব্দুর রহিম, সাইয়েদ হাতেম আলী, শাহ হাজী খাইরুদ্দীন, হাফেজ কোলোন, শাহ শায়েখ মুহাম্মাদ মুনির, শায়েখ আমীনুল্লাহ ও হাফেজ আব্দুল করিম। এরা ছিলেন তার রুহানী সন্তান।

(৩৫) শায়েখ আলহাজ আব্দুর রহিম রহ.

তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের নেতৃস্থানীয় লোক। মারেফতের খোঁজে হিন্দুস্থান আসেন। প্রথমে কাদিরিয়া সিলসিলায় শাহ রহম আলী সাড়ুরবীর কাছে কামালাত হাসিল করেন। যার মাজার পাঞ্জসালায় অবস্থিত। পরে চিশতীয়া সিলসিলার শাহ আব্দুল হাদীর দরবারে এসে পূর্ণতায় পৌঁছেন। শায়েখের ইন্তিকালের পর মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদের হাতে জিহাদের ওপর বয়াত হন।

www.maktabatulabrar.com

যিনি ছিলেন যমানার মুজাদ্দিদ ও রায়বেরলীর বাসিন্দা। কখনো সাইয়েদ সাহেব ও হাজী সাহেব পরস্পর মুরাকাবা করতেন। ফলে একজনের নিসবতের আসর পড়ত অন্য জনের ওপর। হাজী সাহেব ভাবের ঘোরে থাকতেন আর সাইয়েদ সাহেব থাকতেন হাসিখুশি। কেউ শাহ আব্দুর রহিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো কামেল মানুষ; বাতেনী কামালে সাইয়েদ সাহেব থেকে কম নন, বরং বেশি, তবুও কেন সাইয়েদ সাহেবের পিছনে এভাবে নিজেকে মিটিয়ে দিচ্ছেন? নিজেও মুরিদ হলেন সব মুরিদকেও বয়াত করালেন? জবাবে শাহ সাহেব বলেন, সবই ঠিক, কিন্তু আমাদের নামাজ রোজা ঠিক হচ্ছিল না, সাইয়েদ সাহেবের সোহবতে আমাদের নামাজ রোজা ঠিক হয়ে যায়।

২৭শে যিলকদ ১২৪৬ হিজরিতে সাইয়েদ আহমদ সাহেব ও মাওলানা ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে শিখদের সঙ্গে জিহাদে শাহীদ হন। পাঞ্জতারে এখনো তার মাজার আছে।

(৩৬) হযরত মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ ঝাঞ্ঝানবী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার পিতার নাম সাইয়েদ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ। ১২০১ হিজরিতে মুজাফফারনগর জেলার ঝাঞ্ঝানা নামক এলাকায় নিজের পৈত্রিক নিবাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তার আরো চার ভাই এবং এক বোন ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে–সাইয়েদ গোলাম হায়দার, সাইয়েদ কামাল মুহাম্মাদ, সাইয়েদ আলী মুহাম্মাদ, সাইয়েদ গাউস মুহাম্মাদ ও বিবি খাতিবাহ।

তিনি হযরত আলী রা.-এর বংশধর। তার ঊর্ধ্বতন নবম পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত আলেম শেখ আব্দুর রাজ্জাক রহ.। তিনি ছিলেন কাদেরিয়া সিলসিলার উঁচুস্তরের বুযুর্গ। তার আমলে ভারতবর্ষের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন শাহেনশাহ জালালুদ্দীন আকবর। বাদশাহ আকবর তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। ৯৪৯ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ সাহেব নিয়মতান্ত্রিক কোনো আলেম ছিলেন না। তবে ফারসী ও আরবী ভাষায় তার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। এ ছাড়া দীনী মাসআলা-মাসায়েল সম্বন্ধে ছিল অগাধ জ্ঞান। স্বীয় খান্দানের রীতি অনুসারে প্রথমে কুরআন হেফজ করেন। অতঃপর ঝাঞ্ঝানায় ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। পরে দিল্লি গিয়ে ফারসী ও আরবী উভয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

তখন দিল্লিস্থ বিখ্যাত মাদরাসায়ে রহীমিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী। আর শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিসে দেহলভী। তখন সাইয়েদ আহমদ শহীদও ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে একই মাদরাসায় ভর্তি হন।

আমীর খাঁ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার উস্তাদ মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ সাহেব বলেন, আমি শাহ ইসহাক সাহেবের কাছে কাফিয়া কিতাব পড়ার সময় সাইয়েদ আহমদ সাহেব এসে তার নিকট মিযান পড়া শুরু করেন। লেখাপড়ায় তিনি এতই উন্নতি করেন যে, আমি কাফিয়া কিতাবের অর্ধেক পৌঁছতেই তিনি আমার সহপাঠী হয়ে যান। আবার কিতাব শেষ হতে না হতেই শাহ আব্দুল কাদির সাহেবের কাছে মেশকাত শরীফের সবক শুরু করেন।'

সাইয়েদ সাহেব বাতেনী ইলমের আকর্ষণে জাহেরী ইলমে পূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু মিয়াজী সাহেব কি কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দেন জানা যায় নি। তবে এতটুকু জানা গেছে, লেখাপড়ায় তিনি মেধাবী ছিলেন না। সম্ভবত শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের ইঙ্গিতে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছেন, জাহেরী ইলমের চেয়ে বাতেনী ইলমের প্রতি তার ঝোঁক বেশি। যাই হোক আল্লাহ তাআলা সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও মিয়াজী সাহেবকে অন্য কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন। এ কারণেই হয়ত জাহেরী ইলম তাদেরকে শুধু প্রয়োজন পরিমাণ দান করেছেন।

বয়াত ও খেলাফত

তিনি জাহেরী ইলম হাসিল করেন শাহ সাহেবের খান্দান থেকে। সম্ভবত শাহ আব্দুর রহিম বেলায়েতী সাহেব তাকে হযরত শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। অথবা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেবের নির্দেশে তিনি শাহ আব্দুর রহিম বেলায়েতী সাহেবের দরবারে গমন করেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন কামেল বুযুর্গ এবং কাশফ-কারামাতের অধিকারী। তার হাতে বয়াত হয়ে মিয়াজী সাহেব কামালাতের সুউচ্চ স্তরে উপনীত হন এবং খেলাফতের খেরকা লাভ করেন। অতঃপর পীর সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি দাদা পীর হযরত শাহ আব্দুল হাদী আমরুহীর দরবারে যান এবং ফুয়ুয ও বারাকাত হাসিল করেন।

www.maktabatulabrar.com

মোটকথা, তিনি শাহ আব্দুর রহিম বেলায়েতী সাহেবের কাছে নিসবতে তরিকত হাসিল করেন। ইত্তিবায়ে সুন্নাতে তিনি ছিলেন কামেল বুযুর্গ। এমনকি ত্রিশ বছরে তার একবারও তাকবীরে উলা ছোটেনি। নিজেকে তিনি খুবই গোপন রাখতেন, যার ফলে কারো কাছে প্রকাশ পায়নি তার কামালাত। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেবের স্বপ্ন তার কামালাত জাহের করে দেয়।

দীনী খেদমত

লেখাপড়া সমাপ্ত করে তিনি ঝাঞ্ঝানায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর থানাভবনের পাশে লোহারী নামক এলাকায় খেদমত নেন। মাসিক দু'টাকা বেতনে একটি মসজিদে শিশুদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। ইকবাল বেগম নাম্নী জনৈকা ধনী মহিলা তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি বাড়ি যেতেন এবং শনিবারে কর্মস্থলে ফিরে আসতেন। সাংসারিক কর্তব্য পালনে তাকে প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে যেতে হতো। তার একটি ছোট ঘোড়া ছিল। তাতে করে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন।

লেখাপড়া সমাপ্ত করে দিল্লি থেকে ফিরে তিনি বিবাহ করেন। ভাগ্যক্রমে তার বিবি ছিল অন্ধ। শেষ বয়সে তার দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। ঘটনা হলো, একদিন বেগম সাহেবা মিয়াজী সাহেবকে বলেন, শুনতে পাই আপনি নাকি খুবই বড় বুযুর্গ! আমি তা তখনই বিশ্বাস করব যদি আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। মিয়াজী সাহেব তখন দোয়া করেন আর সাথে সাথে বেগম সাহেবা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

দৈহিক গঠন

হযরত মিয়াজী সাহেবের দৈহিক গঠন ছিল খর্বাকৃতি ও কৃশকায়। তার চালচলন ছিল নিতান্তই সাদাসিদা ও সূফীসুলভ। নীল রঙের লুঙ্গী, গেরুয়া বর্ণের জামা ও দু'পাটের টুপি পরতেন। চটকদার পোশাক কখনো পরতেন না। সাধারণ বেশে চলাফেরা করতেন। কেউ বুঝতেও পারত না–ইনি একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ। একবার হাফেজ যামেন শহীদ মিয়াজী সাহেবের কাছে বয়াত হওয়ার জন্য ঝাঞ্ঝানায় আসেন। সেখানে গিয়ে মিয়াজী সাহেবের কাছেই জিজ্ঞাসা করেন, বলো তো ভাই ধোপা, মিয়াজী সাহেবের বাড়ি কোনটা? মিয়াজী সাহেব বলেন, আমি কাপড় কাঁচার ধোপা নই, আমি দিলের ময়লা পরিষ্কার করার ধোপা বটে।

একটি মোবারক স্বপ্ন

একসময় হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেব কোনো কামেল শায়েখের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ছটফট করতেন। সেই অস্থির সময়ে একবার তিনি রসূল সা. কে স্বপ্নে দেখেন। কিন্তু ভয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারছেন না। ইতিমধ্যে তার পূর্বপুরুষ মোল্লা বেলাকী এসে তার হাত ধরে রসূল সা.-এর সামনে পৌঁছে দেন। রসূল সা. তার হাত ধরে তাকে শায়খুল মাশায়েখ মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ ঝাঞ্ঝানবীর হাতে সোর্পদ করেন। হাজী সাহেব তখন পর্যন্ত মিয়াজী সাহেবকে চিনতেন না। তাই স্বপ্ন দেখার পর অস্থির হয়ে পড়েন–কে এই বুযুর্গ, তাকে কোথায় পাবেন? এমন অস্থিরতা ও পেরেশানিতে কয়েক বছর কেটে গেল। তার অস্থিরতা দেখে তার উস্তাদ কলন্দর সাহেব একদিন বলেন, তুমি লোহার যাও, মিয়াজী সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হও, হয়ত তোমার অস্থিরতা কমবে। উস্তাদের নির্দেশে তিনি কোনো কিছুর পরোয়া না করে সোজা রওয়ানা হন এবং লোহার গিয়ে উপস্থিত হন। আগ্রহের আতিশয্যে তার পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। অবশেষে মিয়াজী সাহেবের দরবারে গিয়ে হাজির হন।

রুহানী পিতার দিকে দৃষ্টি পড়তেই স্বপ্নে দেখা চেহারার কথা তার মনে পড়ে গেল, দীর্ঘদিন যাবত যাকে খুঁজছেন। সেই পরম আরাদ্ধ স্বপ্ন পূরণ হলো যে ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছেন। শায়েখকে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেননি, বরং পায়ে পড়ে যান। শায়েখ তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেন। পরে বলেন, স্বপ্নের ওপর তোমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে তো? এটা ছিল শায়েখের প্রথম কারামত, যার ফলে তার অন্তরে শায়েখের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।

জিহাদের আকর্ষণ

তার যুগেই বালাকোট ও পেশোয়ারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী যার উন্নতি সাধন করেছেন। আর বাস্তবায়ন করেছেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ। সর্বশেষ সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়েছে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর মাধ্যমে।

এ আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সংঘটিত হয়েছে। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও

www.maktabatulabrar.com

মাওলানা নানুতবীর যমানায় এর নাম দেয়া হয় '১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব'। শায়খুল হিন্দের যুগে এর নাম ছিল 'খেলাফত আন্দোলন' এবং 'রেশমী রুমাল আন্দোলন'। সর্বশেষ শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানীর যুগে এর নাম দেয়া হয় 'স্বাধীনতা আন্দোলন'। এ আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট গোটা ভারতবর্ষ বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত হয়। পরে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নামে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

হযরত মিয়াজী সাহেব আপন মুরশিদ শাহ আব্দুর রহিম বেলায়েতী সাহেবের নির্দেশক্রমে যুদ্ধে যোগদান করেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে মুরশিদ তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

একসময় বেলায়েতী সাহেব তার বিশিষ্ট মুরিদ কাজী মুগীসুদ্দীন ও মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ সাহেবকে ডেকে এনে সাইয়েদ আহমদ শহীদের হাতে বয়াত করান। কথিত আছে, পীর সাহেবের পত্র নিয়ে বার্তাবহক যখন মিয়াজী সাহেবের বাড়িতে যান তখন তিনি ঘোড়াকে পানি পান করাচ্ছিলেন। পত্রপাঠ মাত্র তার মাঝে আজিব হালত দেখা দেয়। ঘোড়াটিও চঞ্চল হয়ে লাফাতে শুরু করে। তিনি তখনই ঘোড়ায় চড়ে সাহারানপুর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং মুরশিদের আদেশে হযরত সাইয়েদ সাহেবের হাতে বয়াত হন।

শেষ দিনগুলো

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলেন, একদিন জুমার পরে শায়েখ দুটি অসিয়্যত করেন। সবাই বুঝে গেল এটি শায়েখের জীবনের শেষ নসিহত। ফলে তারা অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করেন এবং আরজ করেন, আমরা তো মনে করতাম আমাদের ঘরে বহু সম্পদ আছে, যখন ইচ্ছা উপকৃত হবো। জবাবে শায়েখ বলেন, আমার বহু সাথী তোমাদের সামনে আছে, তাদেরকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনে করবে। হাফেজ মুহাম্মাদ যামেন শহিদকে তিনি জনসম্মুখে খেলাফত প্রদান করেন, সঙ্গে আমাদেরকেও এজাযত দেন।

একসময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বলেন, আমাকে নিজের গ্রাম ঝাঞ্ঝানায় নিয়ে চলো। লোহার থেকে তার পালকি যখন থানাভবন পৌঁছল, পালকি মসজিদের পাশে রাখা হলো। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মিয়াজী সাহেব বলেন, তুমি তো অবিবাহিত, হাফেজ

যামেন সাহেব ও শায়েখ মুহাম্মাদ সাহেব বিবাহিত, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে দিয়ে মুজাহাদা করাব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা না মেনে উপায় নেই। আমার আখেরাতের সফর এসে গেছে। একথা শুনে আমি পালকির পায়া ধরে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি মরব না, এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর হবো মাত্র।

অবশেষে ৫৮ বছর বয়সে ৪ঠা রমজান ১২৫৯ হিজরীর জুমার দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। অসিয়্যত মোতাবেক তাকে ইমাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শহীদ সবজাওয়ারীর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

একবার এক সাহেবে কাশফ বুযুর্গ এসে হযরত মিয়াজীর মাজারে উপস্থিত হন। ফেরার পথে তিনি বলেন, আফসোস! কোন্ জালেম তাকে সাইয়েদ মাহমুদ সাহেবের পাশে দাফন করেছে? এখন আদবের কারণে তিনি নিজের ফুয়ুয ও আনওয়ার বন্ধ রেখেছেন। যদি কোনো বিরান ভূমিতে তাকে দাফন করা হত তাহলে মানুষ তার আনওয়ারে অভিসিক্ত হতো। যদি ফেতনার আশঙ্কা না থাকত আমি তার হাড়গুলো অন্যত্র নিয়ে দাফন করতাম। তখন দেখা যেত তার ফুয়ুয ও আনওয়ার। মাজারের শিয়রে হযরত হাজী সাহেব কিছু কবিতা উৎকীর্ণ করে রেখেছেন।

হযরত মিয়াজী সাহেবের মাজার কাঁচা, তবে দেয়াল পাকা। কেউ কেউ ইচ্ছা করল কবর এক হাতের বেশি উঁচু করবেন। কিন্তু তিনি একজনকে স্বপ্নযোগে বলেন, এটা খেলাফে সুন্নাত; এমনটা করো না, এক হাত উঁচুই যথেষ্ট।

কাশ্‌ফ-কারামত ও বিভিন্ন ঘটনা

১. হযরত মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ সাহেব একবার কোনো কারণে লোহারীদের প্রতি অসুন্তুষ্ট হয়ে ঝাঞ্ঝানায় চলে যান। তিনি চলে গেলে লোহারীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রচুর ঘটতে লাগল। ফলে সেখানকার পাঠানদের মনে হলো, এসব অগ্নিকাণ্ড হযরত মিয়াজী সাহেবের অসন্তুষ্টির ফল। তারা তখন ঝাঞ্ঝানায় গিয়ে বহু খোশামোদ-তোষামোদ করে তাকে নিয়ে এলো। তিনি ফিরে এলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আর ঘটেনি। কিছুদিন পর পাঠানরা এসে আরজ করল, হযরত! আপনি চলে গেলে এত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমার জানা নেই, তবে কখনো কখনো লোহারের মহব্বতের কথা মনে পড়ে যেত।

২. একবার এক ক্ষেতে আগুন লাগে। ক্ষেতওয়ালা দৌড়ে এসে হযরতের কাছে দোয়ার আবেদন করে। তিনি নিজের টুপি খুলে দিয়ে বলেন, দ্রুত গিয়ে টুপিটি আগুনে ফেলে দাও। সে গিয়ে টুপি আগুনে ফেলতেই আগুন নিভে গেল।

www.maktabatulabrar.com

৩. একবার প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দিল। কয়েকজন হযরত মিয়াজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দোয়ার আবেদন করল। তিনি তখন ইক্ষু চুষছিলেন। তারা যখন অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল এবং দোয়ার আবেদন করল, তিনি তাদের একজনকে –যার সঙ্গে ছিল তার অকৃত্রিম সম্পর্ক– বললেন, তুমি যদি আমার এই চোষা ছিলকা চুষে নাও তাহলে ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি হবে। প্রথমে তিনি ছিলকা চুষতে ইতস্তত করেন, পরে অন্যদের পীড়াপীড়িতে চোষেন। এদিকে ছিলকা চুষতেই আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হল।

৪. হযরত মিয়াজী সাহেব বাজারে গেলে সকল দোকানদার তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেত এবং সালাম দিত। একবার এক অমুসলিম আপত্তি উঠিয়ে বলল, তোমরা ওনাকে দেখে দাঁড়াও কেন? সামনে থেকে আর কখনো দাঁড়াবে না। সবাই বলল, ঠিক আছে, সামনে থেকে আর দাঁড়াব না। এরপর একদিন হযরত মিয়াজী সাহেব বাজারে গেলেন। তখন সেই অমুসলিমও বাজারে ছিল। হযরতকে দেখে সে-ই প্রথমে দাঁড়ায়। তার দেখাদেখি সকলে দাঁড়িয়ে যায়। হযরত চলে গেলে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আপত্তি করলেন, অথচ আপনিই সর্বপ্রথম দাঁড়ালেন, ব্যাপার কী? জবাবে তিনি বলেন, আমি দাঁড়াতে বাধ্য ছিলাম। কেননা তিনি আসতেই কে যেন আমার কান ধরে বলল, তুমি এখনো দাঁড়াওনি, দাঁড়াও! ফলে বাধ্য হয়েই দাঁড়াই।

৫. একদিন কিরনালের একজন আলেম হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর কাছে আরজ করল, হযরত! মানুষের কাছে শোনা যায়, বুযুর্গদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাকি কখনো কখনো ছিন্নভিন্ন হতে দেখা যায়? হযরত গাঙ্গুহী বলেন, আমার মামা বলেছেন, আমি একবার হযরত মিয়াজীর খেদমতে দুপুরের দিকে গেলাম। হুজরা শরিফ বন্ধ ছিল, কিন্তু দরজা ভালোমত বন্ধ করা হয়নি। দরজা খুলতেই দেখলাম হযরত মিয়াজীর পুরো দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে। আমাকে দেখতেই সম্পূর্ণ দেহ জোড়া লেগে গেল। হযরত মিয়াজী উঠে বসেন। পরে বলেন, কাউকে বলবে না।

৬. একবার হযরত মিয়াজীর খেদমতে এক সাধু মেহমান হলেন। যাওয়ার সময় বলেন, মিয়া! আমার থলেতে অল্প পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য

আছে। এটা রাখো, তোমার টাকা-পয়সার অভাব মনে হচ্ছে। এটা থাকলে তোমার উপকার হবে। হযরত বলেন, আমার এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনার কাছেই থাক। সাধু আবারো আবেদন করলে তিনি অস্বীকার করেন। তৃতীয়বার আবেদন করলে তিনি একটা ঢিলা নিয়ে সামনের দেয়ালে নিক্ষেপ করেন। পরে বলেন, দেখো। সাধু তাকাতেই দেখল পুরো দেয়াল স্বর্ণ হয়ে গেছে। এটা দেখে সাধু বলল, তাহলে তো মিয়াজী আপনার এটার দরকার নেই।

৭. হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. বলেন, মনসুর হাল্লাজের যে অবস্থা হয়েছে অল্প সময়ের জন্য, যে কারণে তিনি انا الحق বলে ফেলেছেন, এমন অবস্থা মিয়াজী সাহেবের ছয় মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অথচ কাউকে বুঝতেও দেননি। যথারীতি শিশুদের কুরআন পড়িয়ে গেছেন।

৮. একবার কয়েকজন লোক হযরত মিয়াজী সাহেবের কাছে এসে এসলাহের আবেদন করল। তিনি তখন বাচ্চাদের পড়াচ্ছিলেন। বাচ্চাদেরকে পড়তে থাক বলে তিনি তাদেরকে নিয়ে কামরায় গেলেন। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে তাদেরকে তাওয়াজ্জুহ দেয়া শুরু করলেন। একটা বাচ্চা ছিল সবার বড়। সে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, হযরত চোখ বন্ধ করে তাদের অভিমুখী বসে আছেন। সে এসে বাচ্চাদের বলল, মিয়াজী সাহেব এমন করছেন। একথা বলে সেও সবাইকে নিয়ে মজলিস বানাল। নিজে পীর সেজে বসল আর অন্যরাও চোখ বন্ধ করে বসল তার সামনে। পরে হযরত মিয়াজী সাহেব জানতে পেরে সেই ছেলেকে চোখ বন্ধ করতে বলেন। নির্দেশমত ছেলেটি চোখ বন্ধ করল, কিন্তু অল্পক্ষণেই অস্থির হয়ে চিৎকার করে উঠল। শেষ জীবনে উপনীত হয়ে সেই ছেলে বলেছিল, আমি যখন মিয়াজী সাহেবের সামনে চোখ বন্ধ করে বসলাম, আমার মনে হচ্ছিল আমার কলবে কেউ অঙ্গার রেখে দিয়েছে। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য সেই অঙ্গার নিভে যায়। তবে এখন পর্যন্ত আমার অবস্থা হলো, প্রচণ্ড শীতের রাতে লেপের তলায় মুখ গুজে রাখা সত্ত্বেও বাইরে নিম গাছের পাতার কম্পন অনুভব করি।

৯. হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী থেকে বর্ণিত– এক লোক ছিল অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী। চমৎকার নাত গজল গাইত। কেউ মিয়াজী সাহেবকে বলল, হযরত! সে চমৎকার কণ্ঠের অধিকারী, নাত-গজল ভালো গায়, আপনিও শুনুন! তিনি

www.maktabatulabrar.com

অমত করে বলেন, লোকেরা কখনো আমাকে ইমাম বানায় আর বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও গান শোনা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাই গান গজল না শোনাই ভালো। আমি শুনতে অপারগ। এ ঘটনা নকল করে হযরত থানবী বলেন, দেখুন, কতটা আদব! ইমামদের এখতিলাফি বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করেন। এরা হলেন খাঁটি সূফীর নমুনা। এরা শরীয়তের প্রতি খুবই দৃষ্টি রাখেন।

১০. হযরত হাজী সাহেব যখন থানাভবনের মুহাম্মাদওয়ালী মসজিদে অবস্থান করতেন তখন সেখানে কোনো বারান্দা ছিল না। কিছু কবর আর গাছপালা ছিল। সেখানে হাসান আলী শাহ নামে এক বুযুর্গ থাকতেন। তিনি সামা শুনতেন। তবে খাঁটি বুযুর্গ ছিলেন, দুনিয়াদার ছিলেন না। হযরত হাজী সাহেব এলে তিনি এতটা আদব দেখাতেন যে, সেখান থেকে শাহ বেলায়েত সাহেবে চলে যেতেন। অথচ হাজী সাহেব ছিলেন যুবক আর তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। তিনি চলে গেলে হাজী সাহেব সেখানে থাকতে শুরু করেন। মিয়াজী নুর মুহাম্মাদ সাহেবও সেখানে আসতেন।

সেখানে একটা খান্দান ছিল যাদের জমি ক্রোক হয়ে গেছে। তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছিল জমি ছাড়িয়ে আনার। একবার তারা হযরত মিয়াজী সাহেবের কাছে দোয়ার আবেদন করল। মিয়াজী সাহেব বলেন, হাজী সাহেবের থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তার জন্য একটা বারান্দা বানিয়ে দাও, আমি দোয়া করব। তারা বারান্দা বানিয়ে দেয়ার ওয়াদা করল। মুকদ্দমা ইলাহাবাদে গিয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। চিঠির মাধ্যমে তারা সেটা জানতে পারল। তারা হযরত মিয়াজী সাহেবকেও জানাল মামলা নিষ্পত্তির কথা। তিনি তাদেরকে ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারা বলল, হযরত! পুরো বারান্দা বানিয়ে দেয়ার তো ক্ষমতা নেই, তবে অর্ধেক করে দিচ্ছি। হযরত বলেন, ঠিক আছে, অর্ধেক করে দাও। তখন ইলাহাবাদ থেকে নির্দেশ এলো, যতদিন জীবিত আছে ততদিন মাফ, মৃত্যুর পর সম্পদ আবার ক্রোক হবে। তারা আবার এসে হযরতের কাছে আরজ করলে হযরত বলেন, তোমরা অর্ধেক বানিয়ে দিতে চেয়েছ, আমি কী করব?

খলিফাগণ

হযরত মিয়াজী সাহেবের তরবিয়তের পদ্ধতি ছিল খুবই উঁচু। তার ফুয়ুয ও বারাকাতের ঝর্ণাধারা ছিল প্রবল। যার অনুমান এ থেকে করা যায়, তার প্রত্যেক খলিফা ছিলেন নক্ষত্রতুল্য। নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ্য করা হলো-

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, হাফেজ মুহাম্মাদ যামেন শহীদ, মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ ফারুক থানবী, শের মুহাম্মাদ খান লোহারী, সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীর ঝাঞ্ঝানবী, বরকত আলী শাহ। হযরত যামেন শহীদ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে শামেলীতে শাহাদাত বরণ করেণ। ২৪শে মহররম ১২৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সোমবার জোহরের সময় তাকে থানাভবনে দাফন করা হয়। মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানবী ১২৯৬ হিজরির ৭ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে ইন্তিকাল করেন। থানাভবনের কাছে ঈদগাহে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

(৩৭) হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

হযরত হাজী সাহেবের পিতৃপ্রদত্ত নাম এমদাদ হোসাইন। ঐতিহাসিক নাম জফর আহমদ। শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছেন, এই ছেলে একদিন সৃষ্টিজীবের জন্য এমদাদে এলাহী হবে। তাই নাম যেন কামের মত হয় তার নাম রাখেন এমদাদুল্লাহ। শাহ সাহেবের বরকতে তিনি এই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তার পিতার নাম হাফেজ মুহাম্মাদ আমীন ইবনে শায়েখ হাফেজ বুড্ডা ইবনে শায়েখ হাফেজ বেলাকী ইবনে শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে শায়েখ আব্দুল করিম।

তার বংশক্রম পঞ্চান্ন স্তরে গিয়ে হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের সঙ্গে মিলে, যিনি ছিলেন রুহানী সিলসিলায় তার পূর্বপুরুষ। এটাই প্রসিদ্ধ, তবে হযরত থানবী তারজিহুর রাজেহ গ্রন্থে প্রমাণ করেন, ফররুখ শাহ ফারুকী ছিলেন, কিন্তু তার বংশে হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম ছিলেন না। ১৩৪৩ হিজরির আন নুর পত্রিকার রমজান ও শাওয়াল সংখ্যায় তার বংশধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বংশীয় দিক থেকে তিনি ফারুকী ছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমল থেকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব পর্যন্ত তারা থানাভবনের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলে প্রধান বিচারপতিও ছিলেন এই বংশের। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি কাজি এনায়েত আলী খান ১৮৫৭ সালে শামেলীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায়, এমনকি পুরো বংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

তার সম্মানিত মাতা ছিলেন শায়েখ আলী মুহাম্মাদ সিদ্দিকী নানুতবীর মেয়ে। মাওলানা কাসেম নানুতবীর খান্দানের। তিনি নানার বাড়ি নানুতায় ২রা সফর ১২৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অঞ্চলটি সাহারানপুর থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। তার বড় দুই ভাই হলেন যুলফিকার আলী ও ফেদা হোসাইন। বাহাদুর শাহ হলেন তার ছোট ভাই। উজিরুন নেসা নামে তার এক ছোট বোন ছিল।

তিন বছর বয়সে তাকে একবার সাইয়েদ আহমদ শহিদের কোলে দেয়া হয়। তিনি বরকত-স্বরূপ তাকে বয়াত করে নেন। সাত বছর বয়সে তার আম্মাজান বিবি হোসাইনী ইন্তিকাল করেন। তার প্রতি মায়ের ভালোবাসা ছিলো সীমাহীন। তাই ছেলেকে কেউ খারাপ দৃষ্টিতে দেখুক সহ্য করতে পারতেন না। এজন্য মৃত্যুর সময় অসিয়্যত করে যান, আমার ছেলের গায়ে কেউ হাত তুলবে না। তার অসিয়্যতের ব্যাপারে এতটাই লক্ষ রাখা হয় যে, তার তা'লীম-তরবিয়্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি।

শিক্ষাদীক্ষা

একসময় যেহেতু তিনি মানুষের মধ্যমণি হবেন, ইলমে বাতেনের সরদার হবেন, তাই শুরু থেকেই তার অন্তরে হেফজে কুরআনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কোনো প্রকার চাপ ছাড়া তিনি নিজেই হেফজ শুরু করেন। যদিও বিভিন্ন কারণে হেফজ সম্পন্ন করতে পারেননি, কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি মারেফতের সরদার হবেন তিনি কীভাবে কুরআনের মত ইলম ও মারেফতের ঝর্ণাধারার ব্যাপারে গাফেল থাকতে পারেন! ফলে আগ্রহ-উদ্দীপনা কেবল বাড়ছিল। অবশেষে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে অতি অল্প সময়ে হেফজ সম্পন্ন করেন।

১২৪৯ হিজরিতে তার বয়স যখন ষোল বছর তখন মাওলানা মামলুক আলী সাহেবের সঙ্গে দিল্লি চলে যান। সেখানে তৎকালীন বিশিষ্ট আলেমদের কাছে জাহেরী ইলম হাসিল শুরু করেন। আরবী ও ফার্সির প্রাথমিক কিছু কিতাব পড়েই ইলমে বাতেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। আসলে আল্লাহ পাকের মুয়ামালা একেক জনের সঙ্গে একেক রকম হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক যে কাজ নিতে চান তার জন্য সে রকম ব্যবস্থা করে দেন। প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত কাজের তৌফিকপ্রাপ্ত হয়।

তিনি কিতাবাদি কম পড়েছেন, তবে তিনি ছিলেন ইলমে ওয়াহাবী প্রাপ্ত। একবার তিনি তার খাদেমকে কান্ধলায় মামার কাছে পাঠান হাদিসের

একটি কিতাব চেয়ে। জবাবে মামা বলেন, মিয়া এমদাদুল্লাহ কি কিতাবটি যিয়ারত করবে, না কারো কাছে পড়বে? খাদেম ফিরে এসে বলল, আপনার মামা এমন কথা বলেছেন যা আমি শোনাতে পারছি না। হাজী সাহেব পীড়াপীড়ি করে কথাটা শোনেন। পরে বলেন, এখনি কান্ধলায় যাও, মামাকে আমার চিঠি দিয়ে বলো, কোনো হাদিস বুঝে না এলে আমার কাছে এসে যেন বুঝে যান। আল্লাহর ফযলে জবাব দিয়ে দেবো।

শোনা যায়, মামা এসেছেন। কঠিন হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আল্লাহর ফযলে তিনি ঠিকমত জবাব দিয়েছেন। আসলে তার সিনায় ইলমে বাতেনী খুলে গেছে, সেখানে জাহেরী ইলম আর কি?

বয়াত ও খেলাফত

জাহেরী ইলম থেকে ফারেগ না হতেই তিনি বাতেনী ইলমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। ১৮ বছর বয়সে শায়েখ নাসিরুদ্দীন নকশবন্দীর হাতে বয়াত হন এবং জিকির-আজকার শুরু করেন। তিনি ছিলেন শায়খুল মাশায়েখ শাহ মুহাম্মাদ আফাকের খলিফা এবং শায়খুল হাদিস শাহ মুহাম্মাদ ইসহাকের শাগরেদ ও জামাতা। তাছাড়া হাফেজুল হাদিস শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভীর শিষ্যত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। হযরত হাজী সাহেব কিছুদিন শায়েখের খেদমতে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শায়েখের পক্ষ থেকে খেলাফত ও ইজাযত লাভে ধন্য হন।

তার অন্তরে ছিল পবিত্র নুরের বর্ষণ, তাই স্বভাবতই তিনি রসূল সা.-এর হাদিসের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেমতে মেশকাত শরিফ তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ কলন্দর সাহেব মুহাদ্দিসে জালালাবাদীর কাছে শুরু করেন। আর হিসনে হাসিন ও ফেকহে আকবর শুরু করেন মাওলানা আব্দুর রহিম নানুতবীর কাছে। এরা দু'জন ছিলেন মসনবী শরিফের সপ্তম দফতরের লেখক মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভীর প্রিয়তম শাগরেদ। তাছাড়া ইলমে মারেফতের খাজানা মসনবী শরিফ পড়েছেন হযরত শাহ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কাছে। তিনি পড়েছেন মাওলানা আবুল হাসান কান্ধলভীর কাছে। তিনি নিজের পিতা মুফতী এলাহী বখশ সাহেবের কাছে। আর মুফতী সাহেব স্বপ্নজগতে পড়েছেন স্বয়ং মুসান্নিফের কাছে। এমনকি ষষ্ঠ দফতর খতমের ব্যাপারে আদিষ্টও হয়েছেন। মাওলানা রুমীর মসনবী এমনিতে ইলমে মারেফতের খাযানা। একটা পবিত্র আত্মার কাছে এর গুরুত্ব কেমন হবে বলাই বাহুল্য। আবার জাহেরী শিষ্যত্বও পেয়েছেন

www.maktabatulabrar.com

যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গদের কাছে। ফলে স্বভাবতই মসনবীর ওপর হযরত হাজী সাহেবের দখল ছিল অসাধারণ।

মসনবী শরিফ মোতালায়া তিনি নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছেন। ফলে কিতাবটির প্রতি তার আগ্রহ-উদ্দীপনা কেবল বেড়েছে। ইতিমধ্যে স্বপ্নযোগে একদিন রসূল সা.-এর যিয়ারত নসিব হয়। যার আলোচনা মিয়াজী সাহেবের জীবনীতে চলে গেছে। সেই স্বপ্নের কারণে তিনি মিয়াজী সাহেবের হাতে বয়াত হন। কিছুদিন শায়েখের হালকায় ছিলেন। এরই মাঝে খেলাফত লাভে ধন্য হন। খেলাফত দিয়ে তিনি পরীক্ষা-স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেন, কী চাও, কিমিয়া না তাসবীর? এমন পরীক্ষামূলক কথা শুনে হাজী সাহেব কেঁদে ফেলেন। আরজ করেন, আমি কেবল মাহবুবে হাকিকীকে চাই, পার্থিব কিছু চাই না। রুহানী পিতা এ উত্তর শুনে খুশি হন এবং প্রিয় সন্তানকে তার উঁচু হিম্মতের জন্য প্রশংসা করেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বহু দোয়া দেন। এভাবে কিছুদিন শায়েখের সোহবতে ছিলেন। ১২৬৯ হিজরিতে রুহানী পিতার ছায়া মাথা থেকে উঠে যায়।

লোকালয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা

এরপর তার মাঝে জযবের হালত পয়দা হয়। লোকালয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। তাই লোকালয় থেকে তিনি বিরাণ ভূমিতে চলে যেতেন। মানুষ থেকে দূরে সরে যেতেন। পাঞ্জারের মরুভূমিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সুন্নাতে নববীর আকর্ষণ স্বভাবে ক্ষুধার্ত থাকার অভ্যাস তৈরী করে দিয়েছে। অনেক সময় আট দিন পর্যন্ত চলে যেত একটা দানাও মুখে দিতেন না। একবার প্রচণ্ড চাপে পড়ে এক লোকের কাছে ঋণ চান। সে থাকা সত্ত্বেও দিতে অস্বীকার করে। ফলে স্বভাবতই তার খারাপ লাগে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুভব করেন, এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হয়েছে। ফলে মনের বিরূপতা কেটে গিয়ে প্রফুল্লতা অনুভূত হয়।

এর কিছুদিন পর থেকে সুসংবাদ পাওয়া শুরু করেন। একবার স্বপ্নে হযরত জিবরাইল আ. ও হযরত মিকাঈল আ. কে দেখেন। এটা ছিল মূলত ইলম, হেদায়েত ও রিজিকের সুসংবাদ।

মদিনা মুনাওয়ারা অভিমুখে

দীর্ঘ ছয় মাস মরুভূমিতে কাটিয়ে অবশেষে ১২৬০ হিজরিতে স্বপ্নযোগে রসূল সা.-এর যিয়ারত লাভে ধন্য হন। তিনি নির্দেশ দেন যে, তুমি আমার কাছে এসো। এ নির্দেশ পেয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার

প্রচণ্ড আগ্রহ বোধ করেন। অবশেষে ৮ই যিলহজ ১২৬১ হিজরিতে জেদ্দার নিকটবর্তী বন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে সোজা আরাফার ময়দানে চলে যান। হজ থেকে ফারেগ হয়ে শাহ ইসহাক মুহাজিরে মক্কীর ফয়েয লাভে ধন্য হন। শাহ সাহেব তাকে কয়েকটি অসিয়্যত করে বলেন, নিজেকে সবসময় নিকৃষ্ট মনে করবে, হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে বেঁচে থাকবে। হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার বড় ক্ষতিকর। তাছাড়া ألم يعلم بأن الله يرى আয়াতের মোরাকাবা করবে। তিনি আরো বলেন, মদিনা শরিফ যিয়ারতের পরে অবশ্যই হিন্দুস্তানে ফিরে যাবে। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় যখন আসবে তখন অবস্থান করবে।

হযরত কুদরতুল্লাহ বেনারসী ছিলেন কাশ্‌ফ ও কারামতের অধিকারী প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, নিজের কতিপয় মুরিদকে সঙ্গে দিয়ে বলেন, তাকে নিরাপদে নিয়ে যাবে এবং সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। অবশেষে মদিনা যিয়ারতের তামান্নাও পূরণ হয়। সবুজ গম্বুজ দর্শনের পর সেখানকার ফুয়ুয ও বারাকাত দ্বারা ভরপুর উপকৃত হন।

একসময় রওজায়ে আতহার ও মিম্বরের মাঝে মুরাকাবা অবস্থায় রসূল সা.-এর যিয়ারত লাভ করেন। তখন তিনি তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন। সেখানে শাহ গোলাম মুর্তাজা ঝাঞ্ঝানবীর কাছেও মদিনার থাকার আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনিও একই পরামর্শ দেন, আরো কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করুন, পরে ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবেন। পরে কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন।

তালীম-তালকীন

১২৬২ হিজরিতে হিন্দুস্তানে ফেরার পর সালেকদের পীড়াপীড়িতে বয়াত শুরু করেন। একদিকে অত্যধিক বিনয় ও আত্মোবিলোপের কারণে অস্বীকার করতেন, অন্যদিকে গায়েবী ইশারায় বাধ্য হতেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে হাফেজ যামেন সাহেবের অনুরোধে বয়াত শুরু করেন, যিনি ছিলেন তার পীরভাই। প্রথম দিকে মাত্র কয়েকজন তার হাতে বয়াত হয়। ইতিমধ্যে হযরতের ভাবীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। তিনি রসূল সা. কে স্বপ্নে একথা বলতে শুনেন, ওঠো, এমদাদুল্লাহর মেহমানদের খাবার আমি পাকাব। তার মেহমান হবে উলামায়ে কেরাম। আলেমদের মাঝে সর্বপ্রথম বয়াত হন যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী।

www.maktabatulabrar.com

সম্ভবত ১২৬৩ হিজরিতে। এর কিছুদিন পর যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী বয়াত হন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, হযরত কাসেম নানুতবী হযরত গাঙ্গুহীর আগে থেকে হাজী সাহেবের ভক্ত ছিলেন। তখন পর্যন্ত হাজী সাহেবের সঙ্গে হযরত গাঙ্গুহীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। যেমনটা জানা যায় হযরত গাঙ্গুহীর জীবনী থেকে। মুসাল্লামুস সুবুতের একটা সবক নাগা হওয়ায় ইমামে রাব্বানী আফসোস করে বলেছেন, ভালো হাজী সাহেবই এলেন, আমাদের সবকই বন্ধ করে দিলেন! তখন হযরত কাসেম নানুতবী এ কথা বলে তাকে সতর্ক করেছেন, এমন কথা বলো না ভাই, বুযুর্গ মানুষ! বহুত বড় বুযুর্গ! তাছাড়া হাজী সাহেবের পক্ষ থেকে বয়াতের এজাযতও ইমামে রাব্বানী আগে পান। সময়টা ১২৬৬ হিজরিতে থানাভবনে অবস্থানকালীন। আর হযরত নানুতবী এজাযত পান পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে সম্ভবত ১২৮২ হিজরিতে।

খলিফাগণ

এরা দু'জন বয়াত হতেই উলামায়ে কেরামের রুজু শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিদগ্ধ অনেক আলেম তার হাতে বয়াত হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতাবী, মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন এলাহাবাদী, মৌলবী আহমদ গাজিপুরী, মৌলবী মুহিউদ্দীন মিসরী, মৌলবী হাফেজ ইউসুফ থানবী, হাকিম জিয়াউদ্দীন রামপুরী, নবাব মৌলবী মুহিউদ্দীন খান মুরাদাবাদী, মৌলবী মুহাম্মাদ শফী, মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী, মাওলানা সাইয়েদ ফিদা হোসাইন রেজবী, মাওলানা মুহাম্মাদ আফজাল বেলায়েতী, মাওলানা আব্দুস সামী রামপুরী, মাওলানা মুফতী লুতফুল্লাহ আলিগড়ী, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ।

হিজরতের তামান্না

হযরত হাজী সাহেবের অন্তরের কাইফিয়াত দিন দিন বাড়ছিল। ক্রমেই দিলে হিজরতের তামান্না বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু নিজের নকল-হরকত যেহেতু মুরুব্বীর নির্দেশের অনুগত ছিল, তাই দিলের তামান্না দিলেই চাপা দিলেন। অবশেষে ১২৭৬ হিজরিতে ঘটল গাদ্দারির সেই ভয়াবহ ঘটনা। ফেতনাবাজরা অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেরা বাঁচার চেষ্টা করল।

যাতে নিজেরা সরকারের কল্যাণকামী সাব্যস্ত হতে পারে। আর এই দলটা যেহেতু ছিল সরকারী সংস্পর্শ থেকে দূরে, মসজিদের কোণায় থেকে অভ্যস্থ, কুটকাচালি যেমন পারেন না, আবার দেশীয় আইন-কানুন সম্পর্কেও অজ্ঞ; ঘুষ দিতে পারেন না, আবার ঘুষ দেয়ার মত অর্থও নেই, যার মাধ্যমে নিজেরা নিরাপদ থেকে অন্যদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। এজন্য তিনি আত্মগোপনের ইচ্ছা করেন এবং হিন্দুস্থানকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানান।

শামেলী যুদ্ধে অংশগ্রহণ

একবার থানাভবনে একটা ঘটনা ঘটে। ইংরেজ কালেক্টর থানাভবনের প্রধান কাজি এনায়েত আলীর ভাই কাজি আব্দুর রহিমকে সন্দেহের বশে গ্রেফতার করে প্রকাশে ফাঁসি দিয়ে দেয়। এ হৃদয়বিদারক ঘটনা থানাভবনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং সবার মাঝে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে থানাভবনের বিশিষ্ট আলেম-উলামা ও দীনদার শ্রেণী এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাছাড়া জিহাদের শর্তাবলী নিয়েও আলোচনা হয়। মাওলানা শেখ মুহাম্মাদ অবশ্য পাথেয়-শূন্যতার আপত্তি উঠান। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী বিস্তারিত আলোচনা করে সকলের সন্দেহ অপনোদন করেন। অবশেষে প্রশ্ন ওঠে, জিহাদের জন্য আমীর প্রয়োজন, আমাদের তো কোনো আমীর নেই, যার পতাকাতলে আমরা জিহাদ করব? হযরত নানুতবী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, আমীর তালাশের কী প্রয়োজন? আমাদের হাজী সাহেব আছেন, তাকে আমীর নিযুক্ত করা হোক। আসুন, আমরা তার হাতে জিহাদের বয়াত গ্রহণ করি।

থানাভবনের পাশেই ছিল শামেলীর তহসীল। সেখানে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন ছিল। ১৮৫৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারা সেখানে হামলা করেন। শামেলীর ময়দানে হাফেয যামেন শহিদ, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার নানুতবী, মাওলানা মনির নানুতবী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে হাফেজ যামেন শহিদ হন। যদিও তহসীলের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে আসে, কিন্তু তারা থানাভবনে ফিরে আসেন।

হাজি সাহেবের কতিপয় কারামত

শামেলীর যুদ্ধে বহু আলেম-উলামা ও দীনদার শ্রেণী শরিক হয়। বন্দুকের মাধ্যমে যুদ্ধ হয়েছে। এই লড়াকু বাহিনী পাহাড়ের মত অটল

www.maktabatulabrar.com

থেকে যুদ্ধ করেছেন। তলোয়ার হাতে বন্ধুকধারীদের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করেছেন। হঠাৎ তাদের ওপর ফায়ার শুরু হয়। হযরত যামেন সাহেবের নাভিতে গুলি লাগে। তিনি শহিদ হয়ে যান। হযরত কাসেম নানুতবী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান। জানা গেল, তার মাথায় গুলি লেগেছে, গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। হাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ জখমে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করেন, কী হয়েছে? পাগড়ি খুলে দেখেন, কোথাও গুলির চিহ্ন নেই। অথচ সমস্ত কাপড় ছিল রক্তে ভেজা।[১]

এদিকে হাজি সাহেব, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী ও মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেছে। এমনকি গ্রেফতারের ওপর পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। হাজী সাহেব হারামাইনে হিজরতের নিয়ত করেন। মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, তার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। ফলে সবাই অস্থির পেরেশান। হাজি সাহেব এ সংবাদ শুনে একদিন বলেন, মিয়া কিছু শুনেছ, মৌলবী রশিদ আহমদের নাকি ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে! খাদেমগণ আরজ করল, আমরা তো কিছুই জানি না, এখন পর্যন্ত কোনো সঠিক সংবাদ পাইনি। হাজী সাহেব বলেন, হ্যাঁ, ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, চলো। একথা বলে তিনি উঠে গেলেন। পরে কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা উঠিয়ে বলেন, মৌলবী রশিদ আহমদকে কেউ ফাঁসি দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক তার দ্বারা অনেক কাজ নেবেন। কিছুদিন পর তিনি মুক্তি পেয়ে চলে আসেন।[২]

আল্লাহ পাকের অপার কারিশমা

একসময় হাজী সাহেব রাও আব্দুল্লাহ খানের পরিত্যক্ত আস্তাবলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন চাশতের সময় মুসল্লা বিছিয়ে ভক্তদের বলেন, তোমরা চলে যাও, আমি নফল নামাজ পড়ব।

খান সাহেব ছিলেন হাজী সাহেবের প্রাণোৎসর্গী মুরিদ ও সচ্ছল জমিদার। আবার সরকারের নিকটও ছিলেন বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন। তিনি বুঝতেন হাজী সাহেবকে আশ্রয় দেয়া কত মারাত্মক অপরাধ। একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে আশ্রয় দেয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। কিন্তু শায়েখের মহব্বতে তিনি সেসব ভেবে দেখার সুযোগ পাননি। নিজের জান-মাল সব শায়েখের জন্য কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। খান সাহেব তাকে নফল নামাজে রেখে

---

১. বিস বড়ে মুসলমান ১১৯।
২. বিস বড়ে মুসলমান ১৬৬।

কুঠুরির দরজা বন্ধ করে দেন। আস্তাবলের দরজার কাছে যেতেই আচমকা পুলিশ অফিসার দেখে হতভম্ব হয়ে যান। আল্লাহ জানেন, কোন হতভাগা চর সংবাদ দিয়েছে? এমনকি কুঠুরি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পুলিশ অফিসার মুচকি হেসে এদিক ওদিকের কথা বলছেন। কেমন যেন অসময়ে এসে পড়ায় বিব্রত বোধ করছেন। অভিজ্ঞ রাও সাহেব মুহূর্তে আঁচ করে নিলেন সবকিছু। তিনি ছিলেন সাহসী, বিচক্ষণ ও দৃঢ়চেতা রাজপুত। মুহূর্তে চেপে গেছেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, যেন চেহারায় কোনো প্রভাব না পড়ে। হাসিমুখে জবাব দিয়ে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন।

পুলিশ অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে বলেন, একটি ঘোড়ার প্রশংসা শুনে বিনা অনুমতিতে চলে এলাম। পরে নিজেই আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হন। আচ্ছা, ভালোই হলো বলে রাও সাহেবও সমর্থন করেন। অফিসার বার বার তার চেহারার দিকে তাকান। চেহারা একদম নিশ্চিন্ত দেখে উল্টো চরের ওপর রাগ করেন। ঘোড়া দেখতে দেখতে সেই কুঠুরি পর্যন্ত যান যেখানে হাজি সাহেব অবস্থান করছেন। অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, কুঠুরিতে কী ঘাস রেখেছেন দেখি তো? রাও সাহেব তখন কী যে পেরেশান ছিলেন বলার মত নয়। ভাবছেন, তাকদীরের শেষ সিদ্ধান্ত বুঝি এসে গেল! আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত মনে করে খুশিতে বলেন, দেখুন, বলে দরজা খুলে দিলেন। আর মনে মনে গ্রেফতারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

আল্লাহ পাকের কারিশমা দেখুন! কুঠুরির দরজা খুলতেই দেখেন, খাটে মুসল্লা বিছানো, নিচে লোটা রাখা, অজুর পানি গড়াচ্ছে, কিন্তু হাজি সাহেব নেই! অফিসার হতভম্ব। রাও সাহেব শায়েখের কারামত দেখে খুশি। অফিসার একবার এদিকে তাকান আরেকবার ওদিকে। অবশেষে চরকে মিথ্যাবাদী মনে করে কথা ঘুরিয়ে দেন। পরে পুরো আস্তাবলে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এর পর ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে বলেন, রাও সাহেব! ক্ষমা করবেন, আপনাকে কষ্ট দিলাম, আমার ঘোড়া পছন্দ হয়নি। পুলিশ দৃষ্টির আড়াল হতেই তিনি ফিরে আসেন এবং কুঠুরির দরজা খুলে দেখেন, হাজী সাহেব নামাজের সালাম ফিরিয়ে মুসল্লায় নিশ্চিন্তে বসে আছেন।[১]

হেজাযের উদ্দেশ্যে

এক লোক স্বপ্নে দেখল, রসূল সা.-এর জোব্বা হাজী সাহেব পরে আছেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী বলেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্পষ্ট; তিনি

১. তায়কেরাতুর রশিদ ৭৬: সংক্ষেপিত।

www.maktabatulabrar.com

শরীয়ত ও তরিকতের পোশাক পরিহিত হবেন। মোটকথা হাজী সাহেব পাঞ্জারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সফরের মাঝে হায়দারাবাদের বিভিন্ন মাজার যিয়ারত করেন। পরে করাচির পথে পবিত্র মক্কায় পৌঁছেন। কিছুদিন অবস্থান করেন সাফা পাহাড়ে ইসমাঈল শেঠের সরাইখানায়। সেখানে অধিকাংশ সময় খালওয়াতে মুরাকাবা করতেন। ফলে মক্কাবাসীর সঙ্গে বেশি মেলামেশার সুযোগ হয়নি। তবে হজের মৌসুমে হিন্দুস্তানী দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে সাক্ষাৎ দিতেন।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলো। একসময় গায়েবী ইশারায় এদিকে মুতাওয়াজ্জিহ হলেন–আরেফের জন্য রসূল সা.-এর কোনো সুন্নাত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। সুতরাং বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইবাদত-বন্দেগিতে একাগ্রতার কারণে এতদিন এদিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি। পরে গায়েবী ইশারায় ১২৮২ হিজরির ২১শে রমজান খাদিজা বিনতে হাজী শাফায়াত খান রামপুরীর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার মা-বাবা পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। ষাট রিয়াল মহর ধার্য করে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, যা একশ পঁয়ত্রিশ রুপিয়ার কিছু বেশি। ১২৯৪ হিজরিতে কতিপয় খাদেম একটা বাড়ি ক্রয় করে তার খেদমতে পেশ করে। প্রতিটি আলোকিত হৃদয় বান্দা পৃথিবীতে নিজেকে মুসাফির মনে করেন, তারা এটা পছন্দ করেন না। কিন্তু খাদেমগণ এতটা পীড়াপীড়ি শুরু করেন যে, বাধ্য হয়ে কবুল করতে হলো।

রূহানী খাবার

জনৈক মুরিদ বলেন, হযরত হাজী সাহেব অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কঠোর মুজাহাদা করতেন। এক রমজানে তার খেদমতে থাকার সৌভাগ্য হয়। দেখলাম, পুরো রাত নামাজ পড়ছেন, কুরআন শুনছেন। হাফেজ আব্দুল্লাহ পাঞ্জাবী নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। প্রতিদিন তারাবীতে হযরতকে সাত আট পারা শোনাতেন। এতে প্রায় অর্ধেক রাত চলে যেতো। পরে শায়েখ কখনো হাসান আরবের তেলাওয়াত শুনতেন। অর্ধরাতে হাফেজ আব্দুল হামিদ তাহাজ্জুদে পাঁচ ছয় পারা শোনাতেন। এভাবে রাত অতিবাহিত হতো। একদিন হযরতের শরীর ভালো ছিল না। এমনকি রাতের খাবারও খাননি। তাই হাফেজ সাহেব তেলাওয়াত কম করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার হাফেজ সাহেব! অসুস্থ না কি? আজ কম পড়েছ কেন? হাফেজ সাহেব উত্তর দিলেন, আপনার

স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করে কম পড়েছি। তিনি বলেন, আমার তো কুরআন শুনতে থাকলে কিছুই মনে থাকে না। মন চায় শুনতেই থাকি। কখনো দুর্বলতা অনুভূত হয় না।[১]

তিনি ছিলেন ইলমে ওয়াহাবীপ্রাপ্ত

হাজি সাহেব নিয়মতান্ত্রিক আলেম ছিলেন না, কিন্তু ইশকে এলাহী তার সিনা খুলে দেয়। নবীদের মত তার ইলমও ছিল ওয়াহাবী তথা আল্লাহপ্রদত্ত। উম্মতে মুহাম্মাদীর অনেকে আছেন, যাদের পড়াশোনা কম, কিন্তু আমলী যিন্দেগী তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। তাদের মাঝে দু'জন বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। একজন হলেন মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির পীর হযরত শামসে তিবরিযী। অন্যজন হলেন হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.।

তার সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ. বলেন, আলেম মানে কী? আল্লাহ পাকের জাত তাকে আলেমকুল শিরোমণি বানিয়ে দিয়েছে। তিনি আরো বলতেন, হযরত হাজী সাহেব আলেম তৈরী করেন। পরে তিনি আবে হায়াত হযরত হাজী সাহেবের সামনে পেশ করার ঘটনা শোনান। যেটা তিনি আবে হায়াতের মাঝেও লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. লেখেন, হযরত হাজী সাহেব জাহেরী ইলমে হয়ত আল্লামা ছিলেন না, কিন্তু ইলমে লাদুন্নির সুবাসে মোহিত ছিলেন। ইরফান ও ইয়াকিনের অলঙ্কারে ছিলেন সজ্জিত। তিনি আরো বলেন, হাজী সাহেব শুধু কাফিয়া পর্যন্ত পড়েছেন। আমরা এতো পড়েছি যে, আরেক কাফিয়া লিখতে পারি; কিন্তু তার ইলম ছিল এমনি সুগভীর যে, তার সামনে উলামায়ে কেরামের কোনো হাকিকত ছিল না। তবে হ্যাঁ, পরিভাষা বলতে পারতেন না।'[২]

রিয়াজত ও মুজাহাদা

হযরত হাজী সাহেব ছিলেন দুর্বল ও হালকা পাতলা গড়নের। তাছাড়া প্রচণ্ড রিয়াজত-মুজাহাদা, কম ঘুম ও কম খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্য একদম ভেঙ্গে যায়। শেষ জীবনে পার্শ্বও পরিবর্তন করতে পারতেন না। আবার ইশক মহব্বতের জ্বলন-পোড়ন তো ছিলই।

১. বিস বড়ে মুসলমান ১০৩।
২. প্রাগুক্ত।

www.maktabatulabrar.com

হযরত থানবী রহ. হাজী সাহেবের বিশিষ্ট মুরিদ হাফেজ আব্দুল কাদের সাহেবের সূত্রে হিন্দুস্তানে থাকাকালীন তার রাত্রি জাগরণের মামুল এভাবে বর্ণনা করেন, এশার পর শুয়ে পড়েতেন। সবাই ভাবত তিনি শুয়ে পড়েছেন, কিন্তু সবাই চলে গেলে মুয়াজ্জিনকে দিয়ে মসজিদের দরজা বন্ধ করতেন। নিজে ভিতরে মুসল্লা বিছিয়ে জিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। হাফেজ সাহেব বলেন, রাতে অল্প সময় আরাম করতেন। কেননা যখনই চোখ খুলত দেখতাম, তিনি মসজিদে বসে জিকির করছেন। একদিনও ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রতিদিন কাঁদতেন, অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই শের আবৃত্তি করতেনড়

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن ☆ گر بدم ہم ستر من پیدا مکن

ইন্তিকাল

অবশেষে ৮৪ বছর বয়সে ১২ বা ১৩ জুমাদাল উখরা ১৩১৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে বুধবার ফজরের আজানের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল মুয়াল্লায় মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী মক্কীর পাশে তাকে দাফন করা হয়, যিনি ছিলেন মাদরাসা সওলাতিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ পাক তার কবরকে ঠাণ্ডা রাখুন।

কিতাবাদি

হযরত হাজী সাহেবের রচিত অবিস্মরণীয় কিছু কিতাব আছে যেগুলো এখনো পাওয়া যায়, প্রাচীন শায়েখদের কিতাবাদির মত দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়নি। যার সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো–

১.হাশিয়ায়ে মাসনবীয়ে মাওলানা রুম। এটা মসনবী শরিফের ওপর ফার্সি ভাষায় লিখিত টীকা। হযরতের জীবদ্দশায় এর মাত্র দু'টি অংশ প্রকাশিত হয়েছে। বাকিটা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে।

২.গেজায়ে রুহ। এটা ১২৬৪ হিজরিতে রচিত হয়েছে। তাতে হযরত মিয়াজী নুর মুহাম্মাদের আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটি ১৬০০ শের সম্বলিত।

৩.জিহাদে আকবর। এটা ১২৬৮ হিজরিতে রচিত হয়েছে। এটা মূলত অন্য কারো ফার্সি শেরের উর্দু তরজমা। তাতে সতেরো পৃষ্ঠায় ৬৭৯ টি শের রয়েছে।

৪.মাসনবীয়ে তুহফাতুল উশশাক। ১৩২৪ টি শের সম্বলিত কিতাবটি ১২৮১ হিজরিতে রচিত হয়েছে।

৫.রেসালায়ে দরস গমনাক। পাঁচ পৃষ্ঠার কিতাবটিতে ১৭৫ টি শের স্থান পেয়েছে।

৬.ইরশাদে মুরশিদ। তাতে অজিফা, মুরাকাবা, জিকির-আজকার ও চার সিলসিলার শাজারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রচনাকাল ২০ জুমাদাল আউয়াল ১২৯৩ হিজরী।

৭. যিয়াউল কুলুব। হাফেজ যামেন শহিদের ছেলে হাফেজ ইউসুফ সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে ফার্সি ভাষায় লিখিত। ১২৮২ হিজরিতে মক্কা শরিফে তিনি কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবটির ঐতিহাসিক নাম মারগুবে দিল। হযরত থানবীর মালফুজাতে আছে, হযরত হাজী সাহেব বলতেন, যিয়াউল কুলুবের দুই তৃতীয়াংশ আমি নষ্ট করে ফেলেছি। তাতে জিকির-আজকারের বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণিত ছিল। কেননা আমার ইলহাম হয়েছে এসব জাহের করা উচিত নয়।

৮. ওয়াহদাতুল উজুদ।

৯. ফয়সালা হাফতে মাসআল।

১০. গুলজারে মারেফত।

হযরতের এসব কিতাব আজকাল 'কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া' নামে পাওয়া যায়।

কতিপয় ঘটনা

১. হযরত থানবী রহ. জনৈক সূফী সাহেবের সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাদের কাছে হাজী সাহেব-এর কামেল হওয়ার প্রমাণ হলো, তার কাছে আলেম-উলামা বেশি রুজু করেছেন। অথচ অধিকাংশ আলেমই দেখা যায় সূফিবাদের বিরোধী হয়ে থাকেন। এসত্ত্বেও আলেমগণ যখন তার ভক্ত তাহলে বিরোধিতা করবে কে?

২. হযরত হাজী সাহেবের দরবারে দৈনিক মাসনবী শরিফের দরস শেষে দোয়া হতো। একবার লোকেরা আরজ করল, হযরত কী দোয়া করব? হযরত বলেন, এই দোয়া করো যে, এখানে যা লেখা আছে আমাদের যেন তা অর্জিত হয়।

৩. একবার কিরানার এক মসজিদে একজন নেক কসাই হাজী সাহেবের খেদমতে বসা ছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো, আল্লাহ জানেন হযরত হাফেজ সাহেবের মর্যাদা বেশি, না হযরত হাজী সাহেবের! হাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, আহলুল্লাহদের ব্যাপারে এ চিন্তা করা যে, কে বড় কে ছোট মারাত্মক বেয়াদবি। আল্লাহর নিকট কে মকবুল তা তিনিই ভালো জানেন। সবার প্রতি ভালো ধারণা রাখা উচিত। তোমার কী প্রয়োজন এসব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার?

www.maktabatulabrar.com

৪. মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন বেলায়েতী ছিলেন হযরত হাজী সাহেবের মুজায ও সাহেবে কাশফ বুযুর্গ। একবার তার মনে হলো, হাদিসে এমন নামাজের বিরাট ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, যার জন্য উত্তমরূপে অজু করা হয়, পরে দু'রাকাত নামাজ এমনভাবে পড়া হয় যে, মনে কোনো ধরনের বাজে খেয়াল আসে না। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আলেম। মনে মনে আফসোস করলেন, হায়, সারা জীবনেও এমন নামাজ পড়ার তৌফিক হলো না! দেখি চেষ্টা করে, এমন দু'রাকাত নামাজ পড়তে পারি কি না! সেমতে তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়লেন এবং কামিয়াব হয়ে গেলেন। যেহেতু মনে নানা খেয়াল আসে, তাই চোখ বন্ধ করে রাখলেন, যেন মনে বাজে খেয়াল না আসে। কেননা দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে চিন্তাও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। পরে তার মনে হলো, দেখি, আলমে মেসালে নামাজ কোন্ আকার ধারণ করেছে? তিনি মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে দেখলেন, তার নামাজ চমৎকার আকার ধারণ করেছে; আপাদমস্তক সুন্দর ও সুদর্শন, চোখও অতি চমৎকার, কিন্তু গভীরভাবে তাকিয়ে দেখেন, চোখে দৃষ্টি নেই। তিনি অবাক হলেন, নামাজে আমার কী ত্রুটি হলো? মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য হাজী সাহেবের কাছে গিয়ে অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেননি যে, আমি চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়েছি। শুধু এতটুকু বলেছেন, আমি সম্পূর্ণ খেয়ালমুক্ত হয়ে নামাজ পড়েছি। শুনে হাজী সাহেব বলেন, মনে হয় তুমি চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়েছ? তিনি বলেন, জি, হ্যাঁ, নামাজে চোখ বন্ধ রেখেছি যেন মনে বাজে খেয়াল না আসে। হযরত বলেন, এটা যেহেতু সুন্নাতের খেলাফ, তাই নামাজের আকৃতিতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদি চোখ খুলে নামাজ পড়তে–চাই যত খেয়ালই আসুক–নামাজ বেশি মকবুল হতো। কারণ তখন সুন্নাত মোতাবেক হতো।

৫. একবার শরিফে মক্কার নিকট মুহাজিরদের দেয়ার জন্য কিছু অর্থ এলো। হযরত হাজী সাহেব শরিফের কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, শুনলাম, আপনার কাছে মুহাজিরদের দেয়ার জন্য অর্থ এসেছে, আমার অংশ দিয়ে দিন। সেখান থেকে তিনি তিন আনা ভাগে পেলেন। মাওলানা

মুহাম্মাদ মুনির নানুতবী ছিলেন সেখানে। হাজী সাহেব তাকে বললেন, আচ্ছা, তুমিই বলো, তিন আনা পয়সায় আমার কী হবে? কিন্তু অন্য কারণে আমি পয়সাটা চেয়ে এনেছি। এখানকার লোকদের স্বভাব হলো, যিনি সামান্য নির্মোহভাবে চলেন, তাকে হিংসা করতে শুরু করে। যেহেতু আমাকে এখানে সারা জীবন থাকতে হবে, তাই বিনীতভাবে থাকতে চাই, যেন নির্মোহতার ধারণা সৃষ্টি না হয়।

৬. হযরতের কাছে একবার এক জোলা এসে আরজ করল, আমার মেয়ের ওপর আল্লাহ বখশ জিন আসর করেছে, আপনি একটু চলুন! হযরত বলেন, আমি তো আমেল নই। বহু পীড়াপীড়ি করলে তিনি গেলেন। তিনি যেতেই জিন সালাম করল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলল, আপনি নাম লিখে পাঠালেই হতো আমি চলে যেতাম। কষ্ট করে আসার প্রয়োজন ছিল না। পরে ওয়াদা করল, আপনার সিলসিলার লোকদের কখনো কষ্ট দিব না।

৭. একবার এক লোক এসে আরজ করল, আমাকে কোনো অজিফা বলে দিন যেন স্বপ্নযোগে রসূল সা.-এর যিয়ারত নসিব হয়। হযরত বললেন, আপনার সাহস তো কম নয়? আমি তো নিজেকে এতটুকুর যোগ্য মনে করি না যে, রওজা মুবারকের সবুজ গম্বুজের দিকে তাকাই।

৮. হযরতের খাস খাদেম হাজী আব্দুর রহিম সাহেব বলেন, একবার হযরতের কাছে কালো রঙের জুতো হাদিয়া এলো। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করে অন্যদের দিয়ে দিলেন। তারা আরজ করল, হযরত! আপনার হাদিয়া তো আমাদের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের কারণ, কিন্তু লোকেরা বহু আশা করে হাদিয়া দেয় আপনি ব্যবহার করবেন। আপনি যদি কিছুটা ব্যবহার করে আমাদের দেন তাহলে আমরাও খুশি হই, তাদের মনও প্রশান্ত হয়? জবাবে তিনি বলেন, আরে তারা তো জানে না, আমি যেদিন থেকে দেখলাম খানায়ে কাবার গিলাফের রঙ কালো সেদিন থেকে আমার কালো রঙের জুতো পরার হিম্মত হয় না। এমনিভাবে রসূল সা.-এর রওজা মুবারকের পর্দা সবুজ রঙ দেখার পর থেকে কিমখাবের জুতো পরার সাহস হয় না।

৯. হযরতের দীর্ঘদিনের খাদেম হাজী আব্দুর রহিম সাহেব বলেন, আমি দিনে রাতে কখনো হযরতকে পা ছড়িয়ে শুতে দেখিনি, সবসময় পা গুটিয়ে শুতেন। বিষয়টা দীর্ঘদিন আমি লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ মনে হলো সম্ভবত ইচ্ছাকৃত তিনি এমনটা করেন। অবশেষে একদিন আরজ করলাম,

www.maktabatulabrar.com

হযরত! আপনি পা ছড়ান না কেন? এভাবে শুয়ে কি ঘুম আসে, আরাম হয়? হযরত ইরশাদ করেন, আরে, তুমি আছো আরাম নিয়ে, তুমি কি জান না মাহবুবের সামনে পা ছড়িয়ে শোয়া বেয়াদবি?

১০. এক লোক হাজী সাহেবের নামে চিঠি নকল করে এক আমীরের কাছ থেকে কিছু টাকা নিল। কেউ হযরতকে জানিয়ে আরজ করল, তাকে কিছুটা সর্তক করুন। তিনি জবাবে বলেন, ভাই, আমার দ্বারা তো কারো দীনী ফায়দা হয় না, যদি মুর্দা দুনিয়ার কোনো ফায়দা হয় আমার লজ্জা লাগে তাকে বাধা দিতে। এ ব্যাপারেও আমি বখিলি করব?

১১. একবার হাজী সাহেব তার কোনো মহিলা মুরিদকে বরকতস্বরূপ কোনো কাপড় হাদিয়া দিলেন। উপস্থিত এক মহিলা আরজ করল, হযরত, আপনার খান্দানের অমুক মহিলাকেও দিন, সেও তো আপনার সন্তান! তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, কী সব সন্তানের কথা বলছ! আমার কোনো সন্তান নেই। আমার সন্তান তারাই যারা আল্লাহর তালেব।

১২. একবার কেউ হাজী সাহেবকে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তান থেকে মক্কার এক দোকানীর কাছে কিছু রুপিয়া পাঠাল। দোকানী হযরতের কাছে খবর পাঠাল, আপনার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কিছু রুপিয়া এসেছে, কোনো খাদেম পাঠিয়ে নিয়ে নিন। হযরত অত্যন্ত নির্মোহভাবে জবাব দিলেন, আমি হিন্দুস্তান থেকে রুপিয়া চেয়ে পাঠাইনি, দোকান থেকেও আনতে পারব না। যে আল্লাহ হিন্দুস্তান থেকে মক্কায় পাঠিয়েছেন তিনি দোকান থেকেও আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এখান থেকে কেউ রুপিয়া আনতে যাবে না। একথা শুনে দোকানী অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ হযরতের কাছে রুপিয়া পাঠিয়ে দিল।

১৩. একবার হাজী সাহেব ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় একদিন নির্জনে উচ্চস্বরে হাসির শব্দ শোনা গেল। সবাই অবাক হলো একাকী হাসছেন দেখে। অন্যদিন কেউ মেজায প্রফুল্ল দেখে জিজ্ঞাসা করল, সেদিন এককী হেসেছেন কেন? জবাব দিলেন, অসুস্থ অবস্থায় হঠাৎ এমন স্বাদ অনুভূত হলো যে বেইখতিয়ার হেসে উঠেছি।

মালফুজাত

১. হযরত বলেন, প্রত্যেকে আমাকে নিজের রঙে রঙিন মনে করে, অথচ আমি কারো মত নই। আমি হলাম পানির রঙের, যে রঙের বোতলে ভরা হবে তেমনি মনে হবে।

২. হযরত বলেন, মানুষের মাঝে সব কিছুর উপাদান আছে। যখন ঠাণ্ডা লাগে তখন আগুনের গোলক কল্পনা করবে। আর যখন গরম লাগে তখন বরফরাজ্য কল্পনা করবে।

৩. হযরত বলেন, মনে যেসব ওয়াসওয়াসা আসে যদি সহজে দূর না হয় চেষ্টা করে দূর করতে যাবে না। তাতে বরং আল্লাহ পাকের কুদরত প্রত্যক্ষ করবে। মনে করবে, আল্লাহু আকবর! কেমন অনবরত ওয়াসওয়াসা আসছে, দূর করা যাচ্ছে না! সালেকের জন্য এটাই উত্তম যে, তাতে আল্লাহ পাকের কুদরত প্রত্যক্ষ করবে।

৪. الغيبة أشد من الزنا .'গিবত যিনা ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক' এ সম্পর্কে হযরত বলেন, যিনা হলো গোনাহে বাহি (অর্থাৎ খাহেশাতজনিত গোনাহ) আর গিবত হলেন গোনাহে জাহি (অর্থাৎ সম্মানের মোহজনিত গোনাহ)। যা অহংকার শাহওয়াত থেকেও মারাত্মক।

৫. একবার এক সালেক বলেন, আমাদের যে বাতেনী উন্নতি হয়েছে সেটা আপনার বরকতে হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, যা কিছু হয়েছে সেটা তোমার মাঝেই ছিল, যেমন বাবুর্চি খাবার মাথায় করে আনে, পরে সেখান থেকে একটা করে ডিস দিয়ে দেয়। পরে বলেন, তবে তুমি মনে করবে শায়েখের কাছ থেকে পেয়েছি, অন্যথায় তোমার ক্ষতি হবে।

৬. হযরত বলেন, যদি একটা লতিফা আলোকিত হয়ে যায় তাহলে এর মাধ্যমে সবগুলো লতিফা আলোকিত হয়ে যাবে।

৭. হযরত বলেন, আল্লাহ পাক তার কোনো কোনো বান্দাকে–যারা যথারীতি আলেম হয় না–একজন মুখপত্র দান করেন। সেমতে হযরত শামসে তিবরিযীর মুখপাত্র ছিলেন মাওলানা রুমী। যিনি হযরত শামসে তিবরিযীর ইলমকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে আমার মুখপত্র হলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী।

৮. হযরত বলেন, মানুষকে আমার বান্দা বানাতে চাই না, বরং আল্লাহর বান্দা বানাতে চাই। তিনি প্রকাশ্যে বলেন, আমার কাছে যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি। এখন আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে, যে যেখান থেকে কিছু হাসিল করতে চাও করতে পারো। আমার পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। আমি কাউকে আঁটকে রাখি না। আরেকবার বলেন, আমি লোকের ভক্তি-ভালোবাসায় ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখন মনে হয় মানুষ আমাকে মুলহিদ মনে করে সরে যেতো, আমি নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহর ধ্যানে

www.maktabatulabrar.com

মশগুল হতে পারতাম! তোমাদের অতিরিক্ত ভক্তি-ভালোবাসা আমার সব সময় নষ্ট করে দিচ্ছে!

৯. হযরত বলেন, যে শায়েখ নিজে কিছু করে না তার তালীমে বরকত হয় না। যদিও তার হাজত নেই। এজন্য তাকে জিকির-শুগলে মগ্ন থাকা উচিত যেন অন্যকে তালকীন করতে পারেন। নিজে কিছু না করে অন্যকে কী তালকীন করবে!

১০. হযরত বলেন, দিল মক্কায় থাকা আর দেহ হিন্দুস্তানে থাকা এটা বেশি ভালো, দেহ মক্কায় থাকা আর দিল হিন্দুস্তানে থাকার চেয়ে।

১১. এক লোক অভিযোগ করল, জিকির করি, কিন্তু উপকার অনুভূত হয় না? জবাবে হযরত বলেন, জিকির যে করতে পারছ, এটাও কি কম উপকার? তোমার যে জিকির করার তৌফিক হয়েছে, সেজন্য শুকরিয়া আদায় করো।

১২. হযরত বলেন, ঠাণ্ডা পানি পান করবে তাহলে দেহের প্রতিটি কোষ থেকে শুকরিয়া আসবে।

১৩. হযরত বলেন, আমল করতে গিয়ে রিয়া হয়ে গেলেও আমল করতে থাকবে। রিয়ার ভয়ে আমল ছেড়ে দেবে না। কারণ প্রথম দিকে রিয়া হবে, পরে আমল অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। আর অভ্যাস পরিণত হবে এবাদতে।

১৪. হযরত বলেন, আমি এ উদ্দেশ্যে মুরিদ করি যদি পীর আগে মারা যায় তাহলে মুরিদদের জান্নাতে নিয়ে যাবে আর মুরিদ আগে মারা গেলে পীরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

১৫. হযরত বলেন, আমি প্রত্যেক আগন্তুকের যিয়ারতকে নাজাতের উসিলা মনে করি।

১৬. একজন উঁচুস্তরের বুযুর্গ নামাজ সম্পর্কে হযরতকে জিজ্ঞাসা করেন, দিল যদি নামাজে না লাগে এমন ওঠাবসায় কী ফায়দা? হযরত বলেন, ওঠাবসার মূল্য আখেরাতে জানা যাবে। পৃথিবীতে যদি আল্লাহ পাক কাউকে তৌফিক দান করেন আর হুজুরে কলব ছাড়াই ওঠাবসার সুযোগ হয়ে যায়, এটাও অনেক বড় নেয়ামত।

১৭. হযরত বলেন, নিজের শায়েখ সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখতে হবে, জীবিত বুযুর্গদের মাঝে আমার জন্য আমার শায়েখের চেয়ে উপকারকারী কাউকে পাওয়া যাবে না।

১৮. যদি কোনো মুরিদ জিজ্ঞাসা করতেন, দুনিয়া কি ছেড়ে দেবো? হযরত বলতেন, দুনিয়া যদি হালাল হয় ছেড়ো না। সঙ্গে আল্লাহর নাম নিতে থাকো। যখন আল্লাহ পাকের নাম প্রবল হয়ে যাবে, তখন এমনিতে ছেড়ে দেবে।

১৯. হযরত বলেন, আমি তিন ধরনের লোকদের থেকে খেদমত নেয়া পছন্দ করি না–আলেম, সাইয়েদ ও বৃদ্ধদের থেকে।

২০. হযরত বলেন, সব মানুষের কাছেই পদের লোভ নিন্দনীয়। মুহাক্কিক আলেমদের মতে পদের লোভ আল্লাহর কাছেও নিন্দনীয়। কেননা তাতে অহংকার পাওয়া যায়, নিজেকে বড় মনে করা হয়। এটা আবদিয়্যাতের পরিপন্থী। আবদিয়্যাত হলো নিজেকে হীন মনে করা।

২১. হাফেজ আব্দুর রহিম থানবী হাজী সাহেবের কথা নকল করে বলেন, আমি এজন্য সবাইকে বয়াত করি আবার কোনো বেদাতীর খপ্পরে পড়ে যায় কি না? তখন তো আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদেহি করতে হবে, সে তোমার নিকট এসেছিল, তুমি কেন সরিয়ে দিয়েছ? তাই সে বেদাতীর খপ্পড়ে পড়ে গেছে?

২২. হযরত বলেন, যে ব্যক্তি তালেবে দুনিয়া হয় সে যেন তারেকে দুনিয়া হয়ে যায়। হযরত থানবী এ কথার ব্যাখ্যা করে বলন, দুনিয়া তলব করলেই হাসিল হয় না; বরং যার দুনিয়া তলব করার ইচ্ছা তার পদ্ধতি হলো, সে দুনিয়া তরক করে দিবে, তাহলে দুনিয়া এমনিতে অর্জন হয়ে যাবে।

২৩. হযরত বলেন, পরস্পর ঐক্য ও সংহতির মূল হলো বিনয়। যাদের মাঝে বিনয় থাকবে তারা মিলেমিশে থাকতে পারবে।

২৪. হযরত বলেন, আমার কাছে একবার দুই তালেবে ইলম আসে। একজন দাবী করে, لا صلاة الا بحضور القلب 'হুজুরে কলব ছাড়া নামাজ হয় না।' অন্যজন আপত্তি করে বলে, হাদিসে আছে, হযরত ওমর রা. বলেছেন, لاجهز جيشي وأنا في الصلاة 'আমি নামাজে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করি।' কে বলবে হযরত ওমরের নামাজ অসম্পূর্ণ ছিল? অথচ নামাজে তার হুজুরে কলব ছিল না? সুতরাং বুঝা গেল, নামাজে হুজুরে কলব জরুরী নয়। অপর তালিবে ইলম এই আপত্তির কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না। অবশেষে আমার কাছে এলো। আমি বললাম, হযরত ওমরের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা হুজুরে কলবের পরিপন্থী নয়, বরং এটাও হুজুরে

www.maktabatulabrar.com

কলবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা বাদশার পক্ষ থেকে যাকে কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, সে যখন বাদশার দরবারে উপস্থিত হয় তখন তার কামালে কুরব এটাই যে, সে নিজের অর্পিত দায়িত্ব বাদশার সামনে পেশ করে সে সম্পর্কে শাহী ফরমান জানার চেষ্টা করবে। সুতরাং হযরত ওমরকে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো আর এদিকে নামাজ হলো আল্লাহর দরবারে হাজিরির সময়, তখন হুজুরে কলব এটাই–এ ব্যাপারে আল্লাহর দিকে রুজু করে ইস্তিখারা করা। সুতরাং হযরত ওমরের সৈন্য প্রস্তুত করাটাও ইলহাম ছিল। একে নিজেদের অন্তরের ওয়াসওয়াসার সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। এ কথায় তারা উভয়ে প্রশান্ত হয়ে চলে গেল।

এ ঘটনা লেখার পর হযরত থানবী টীকা হিসাবে লেখেন, সুবহানাল্লাহ! কী চমৎকারভাবে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করে দিলেন! বাস্তবে রসমী ইলম হলো কিছু শব্দপূজা। কুরআন-হাদিসের গভীর মর্ম উপলব্ধি করা সবার কর্ম নয়।

২৫. উলামায়ে কেরামের সামনে কোনো মাসআলার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করলে সঙ্গে একথাও বলতেন, ভাই, আমি হলাম মূর্খ মানুষ, তোমরা হলে আলেম। আমার অন্তরে যা এসেছে বলে দিলাম। যদি ভুল হয়, কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয়, তাহলে লজ্জা না করে বা গোপন না করে বলে দিবে। অন্যথায় কেয়ামতের দিন আমি বলে দিবো, আমি ওদের বলেছিলাম, ওরা আমার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেয়নি।

২৬. হযরত বলেন, আমার খলিফাগণ দুই ধরনের। এক ধরনের হলো যাদেরকে আমি স্বেচ্ছায় কারো সুপারিশ ছাড়া বয়াতের এজাযত দিয়েছি এবং আমার খলিফা বানিয়েছি। এরাই আমার প্রকৃত খলিফা। অন্য দলটা হলো যাদের ব্যাপারে অন্যরা সুপারিশ করেছে এবং বলেছে, আমি তাকে আল্লাহর নাম শিখিয়ে দেবো। তাদের কথায় আমি এজাযত দিয়েছি, আমার এই এজাযত প্রথম স্তরের নয়।

(৩৮) ইমামে রব্বানী মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.

সাহারানপুর থেকে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটা এলাকার নাম গাঙ্গুহ। সেই অঞ্চলকে আল্লাহ পাক চিশতী সিলসিলার তিন মহান বুযুর্গের আনওয়ার ও বারাকাতে ধন্য করেছেন। তন্মধ্যে দু'জন হলেন শাহ আব্দুল

কুদ্দুস গাঙ্গুহী ও হযরত শাহ আবু সাঈদ গাঙ্গুহী। যাদের আলোচনা পূর্বে চলে গেছে। তৃতীয়জন হলেন ইমামে রাব্বানী মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী। যিনি একই সঙ্গে ছিলেন আলেমে দীন, জামে শরীয়ত ও তরিকত। আবার আশেকে রসূল ও মুত্তাবিয়ে সুন্নত। আল্লাহ পাক তার হাতে শরীয়ত ও তরিকত জমা করে দিয়েছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাকে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী অত্যন্ত ভক্তিভরে ইমামে রাব্বানী ডাকেন। কিন্তু পিতামাতা তার নাম রেখেছেন রশিদ আহমদ।

জন্ম ও শৈশব

ইমামে রাব্বানী ৬ই যিলকদ ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৮২৯ খৃস্টাব্দে সোমবার দিন পূর্বাহ্নে গাঙ্গুহে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা হেদায়েত আহমদ ১৩৫২ হিজরিতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি দাদার কাছে প্রতিপালিত হন। সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করা এবং শৈশবে এতিম হয়ে দাদার কাছে প্রতিপালিত হওয়া এমন দুটি অনিচ্ছাকৃত সুন্নাত যা আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন।

সম্মানিত পিতামাতা

তার সম্মানিত পিতা ছিলেন বিশিষ্ট আলেম ও মুত্তাকী বুযুর্গ। আনসারী খান্দানে মাওলানা নকি সাহেবের বোনকে বিয়ে করেন। ইলম অর্জন করেন শাহ অলিউল্লাহর খান্দান থেকে। আর রুহানী দীক্ষা নেন মাওলানা শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদীর কাছ থেকে। তিনি ছিলেন দক্ষ লিপিকার ও দানশীল। আমালিয়াত ও তাবিজের কাজ করতেন। তার পূণ্যময় বংশধারা হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী পর্যন্ত পৌঁছে।

হযরত গাঙ্গুহীর সম্মানিত মাতা ছিলেন খুবই মুত্তাকী, আবেদা ও যাহেদা মহিলা। স্বামীর আমালিয়াতের কাজ ঘৃণা করতেন, আবার ভয়ও করতেন। একবার তিনি বলেন, রশিদ আহমদ! তোমার শৈশবে আমি আল্লাহ বখশ জিনকে দেখেছি। একদিন দেখি সে তোমার চৌকির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলল, তুমি অমুক মাজারে আতর-জল ছিটাও, অন্যথায় তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব। আমি বললাম, আচ্ছা, পারলে মেরে ফেল, তোমার সামনেই তো আছে! জিন যতই ভয় দেখায়, হুমকি-ধমকি দেয় আমার একই উত্তর, আমি কখনো মাজারে জল ছিটাব না; তোমার ইচ্ছা হয় মেরে ফেল। ফলে সে নিরাশ হয়ে চলে গেল।

www.maktabatulabrar.com

জাহেরী বাতেনী তরবিয়ত

তার প্রথম উস্তাদ হলেন মিয়াজী কুতুব বখশ গাঙ্গুহী, যার কাছে তিনি প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েছেন। শৈশবেই তিনি উস্তাদের কাছে মেধা-প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার উচ্চ প্রশংসা শুনতেন। মিয়াজী কুতুব বখশের অভ্যাস ছিল, ছেলেদের মুখ শুকে জিজ্ঞাসা করতেন, কী খেয়ে এসেছ? শাগরেদদের জবাবে বলতেন, একাকী খেয়ে এসেছ? আমার জন্য আননি কেন? উস্তাদের এমন কথায় তিনি নিজের খাবার না খেয়ে উস্তাদের জন্য নিয়ে আসতেন। কয়েক দিন পর্যন্ত বাড়ির কেউ জানতে পারেনি এ কথা। একদিন তারা কাপড়ে দাগ দেখে এবং বিষয়টা গোপন করতে দেখে ধমক দিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন জানা গেল তার এই ত্যাগের আখ্যান। এই ছিল সৌভাগ্য ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শৈশবেই আল্লাহ পাক তার থেকে যার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

তিনি বলতেন, চার পাঁচ বছর বয়সের সময় আম্মাজান একবার আমাকে ও বড় ভাই মৌলবী এনায়েত আহমদ সাহেবকে পান করার জন্য দুধ দিলেন। আমি আরো বেশি দেয়ার জন্য জিদ ধরলাম। ফলে ভাই রাগ করে নিজের ভাগের সঙ্গে আমার ভাগও পান করে ফেলেন। তখন থেকে আমার অভিজ্ঞতা হলো, জিদ করলে নিজের আসল পাওনা থেকেও বঞ্চিত হতে হয়।

শিক্ষাদীক্ষা

পবিত্র কুরআন তিনি কোথায় কার কাছে পড়ছেন জানা যায়নি। সম্ভবত ঘরে মায়ের কাছেই পড়েছেন। কেননা তখনকার যুগে উঁচু বংশের মেয়েরা ঘরেই পবিত্র কুরআন ও ইলমে শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করত। তারপর ফার্সি পড়েন নিজের মামা মাওলানা তাকী সাহেব ও মৌলবী মুহাম্মাদ গাউস সাহেবের কাছে। আর নাহু-সরফের প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন মৌলবী মুহাম্মাদ বখশ রামপুরীর কাছে।

পরে তার উৎসাহে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১২৬১ হিজরিতে দিল্লি চলে যান। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। দিল্লি পৌঁছে বহু আলেমের দরসে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু তার তবিয়ত কোনোটাই গ্রহণ করেনি। এদিকে সৌভাগ্যক্রমে উস্তাযুল কুল মাওলানা মামলুক আলী সাহেব হজ থেকে ফিরে নানুতায় আসেন। ছুটি শেষে মাওলানা কাসেম সাহেবকে নিজের সঙ্গে দিল্লি নিয়ে যান। এটা ১২৬০ হিজরির ঘটনা। ওদিকে ইমামে

রব্বানী কারো দরস মনঃপুত না হওয়ায় একগ্রচিত্তে লেখাপড়া শুরু করতে পারেননি। ফলে তিনিও মাওলানা মামলুক আলীর খেদমতে চলে আসেন। এভাবে ইলম ও তাকওয়ার চন্দ্র সূর্য একই উস্তাদের তত্ত্বাবধানে ইলম হাসিলে মশগুল হয়ে গেলেন। হযরত ইমামে রব্বানী সদরা ও শামসে বাজেগা মাওলানা মামলুক আলীর সামনে এমনভাবে পড়েছেন যেমন হাফেজ সাহেব কুরআন পড়েন।

মোটকথা– কয়েক বছর তিনি দিল্লিতে থেকে দরসী ইলম সম্পন্ন করেন। যুক্তিবিদ্যায় তার আরেক প্রসিদ্ধ উস্তাদ হলেন মুফতী সফরুদ্দীন আজুরদা। কাজী আহমদুদ্দীন সাহেবের কাছেও পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার হাদিসের উস্তাদ ছিলেন মাওলানা শাহ আব্দুল গণী মুহাজিরে মাদানী মুজাদ্দেদী নকশবন্দী। তিনি এমন নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন খাওয়া ও ঘুমের জন্য মাত্র সাত ঘণ্টা ব্যয় করতেন। বাকি সময় লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকতেন। শিক্ষা সমাপন করে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তখন তার বয়স ছিল একুশ বছর। দিল্লিতে যতদিন ছিলেন নিজের ব্যয় নিজেই নির্বাহ করতেন। নিজের দায়িত্ব অন্য কারো ওপর দিতেন না। তার পিতা প্রতি মাসে তিন রুপিয়া পাঠাতেন। সেটা দিয়ে কোনোমতে সব প্রয়োজন মিটাতেন।

ইমামে রাব্বানীর জ্ঞানসাধনা

ইমামে রব্বানী হযরত গাঙ্গুহীর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল প্রবল। রাতদিন একই তৃষ্ণায় কাতর থাকতেন। কোনো দিকে তাকিয়ে দেখার অবসর পেতেন না। তিনি বলেন, আমি তখন শাহ আব্দুল গনী সাহেবের নিকট পড়ি, বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতাম। আসা-যাওয়ার পথে এক মাজযুবকে দেখতাম। পড়ালেখার প্রতি আমার এমনই আকর্ষণ ছিলো যে, আশপাশে তাকিয়ে দেখতাম না।

একদিন মাজযুব সাহেব আমাকে বলেন, মৌলবী! প্রতিদিন তুমি কোথায় যাও? আমি বললাম, খাবার আনতে যাই। মাজযুব বলেন, এ পথে কেন আসা-যাওয়া কর, অন্য কোনো পথ নেই? আমি বললাম, আছে, তবে তা বাজার হয়ে যেতে হয়। সেদিক দিয়ে গেলে নানা জিনিস চোখে পড়ে, ফলে আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়। মাজযুব সাহেব বলেন, মনে হয় তুমি গরীব, একসময় এসো, আমি তোমাকে স্বর্ণ বানানো শিখিয়ে দেবো।

www.maktabatulabrar.com

আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা দিয়ে চলে এলাম। এসেই লেখাপড়ায় মগ্ন হয়ে গেলাম। দেখা করার কথা একদম ভুলে গেলাম। দ্বিতীয় দিন আবারো তার সঙ্গে দেখা। তিনি অনুযোগ করে বলেন, মৌলবী সাহেব! এলে না তো? আমি ওজর দেখিয়ে বললাম, লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকি তাই সুযোগ হয়নি। শুক্রবার আসব ইনশাআল্লাহ!

এভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। অবশেষে তিনি নিজেই এলেন আমার কাছে। আমাকে নিয়ে শাহ নিজামুদ্দীনের কবরস্তানে গেলেন। একটি ঘাস দেখিয়ে বললেন, এটি অমুক অমুক স্থানে পাওয়া যায়, ভালো করে চিনে রাখো। আমিও ভালো করে দেখে নিলাম। পরে তা দিয়ে তিনি স্বর্ণ বানিয়ে দেখালেন। প্রক্রিয়াটি আমি শিখে নিলাম। যাওয়ার সময় স্বর্ণের টুকরোটি আমাকে দিয়ে বললেন, এটি বিক্রি করে তোমার প্রয়োজন পূরণ করো। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যস্ততায় তা বিক্রি করার সুযোগ পেলাম না।

আরেক দিন বলেন, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তুমি আমার সাথে চলো, ঘাসটি আবার দেখে নাও। তিনি আমাকে নিয়ে ঘাসটি আবার দেখিয়ে দিলেন। পরে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন জানি না।

দরস-তাদরীস

সমস্ত উলুম ও ফুনুন সমাপন করে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। বাড়ি ফিরে তিনি দরস-তাদরীসে মশগুল হয়ে যান। বিভিন্ন উলুম ও ফুনুন তথা ইলমে নাহু, ইলমে মাআনী, ফেকাহ, তাফসীর ও হাদিস ইত্যাদির তাদরীসে ডুবে যান। ১৩০০ হিজরির শেষ পর্যন্ত তাদরীসের ধারা অব্যাহত থাকে। ১৩০১ হিজরী থেকে শুধু হাদিসের খেদমত শুরু করেন। এমনকি সিহাহ সিত্তার সমস্ত কিতাব একাই পড়িয়ে দিতেন। শাউয়ালে দাওরায়ে হাদিসের সবক শুরু হতো আর শাবানে গিয়ে সব কিতাব সমাপ্ত হয়ে যেতো।

সুলুকের পথে সূচনা

সুলুক ও তরিকতের সূচনা কীভাবে হলো ইমামে রব্বানী বহুবার সে ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি ও মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম যখন দিল্লিতে থাকতাম। একবার সুল্লাম পড়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু উস্তাদে মুহতারাম ভীষণ ব্যস্ত। পরে সিদ্ধান্ত হলো, সপ্তাহে মাত্র দুটি সবক হবে। একবার সুল্লামের সবক হচ্ছিল ইতিমধ্যে নীল লুঙ্গি কাঁধে এক লোক

এসে উপস্থিত হন। তিনি আসতেই উস্তাদ সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। অত্যন্ত আদব ও এহতেরাম করেন। পরে বলেন, চলো ভাই, হাজী সাহেব এসে গেছেন! মিয়া রশিদ! সবক পরে হবে। সেদিন সবক না হওয়ায় আমার ভীষণ আফসোস হলো। আমি মৌলবী মুহাম্মাদ কাসেমকে বললাম, ভালো হাজীই এলেন, আমাদের সবকই বন্ধ করে দিলেন! মৌলবী মুহাম্মাদ কাসেম বলেন, এমন কথা বলো না ভাই, বড় বুযুর্গ মানুষ! বড় কামেল মানুষ! হযরত ইমামে রব্বানী এই ঘটনা শুনিয়ে বলেন, আমাদের কি জানা ছিল এই হাজী সাহেবই একদিন আমাদেরকে মুণ্ডিয়ে দিবেন।

স্বয়ং ইমামে রব্বানী বলতেন, ছাত্রজীবনে হাদিস পড়ার উদ্দেশ্যে শাহ আব্দুল গনী মুহাজিরে মাদানীর খেদমতে উপস্থিত হতাম। এজন্য বার বার ইচ্ছা হতো শাহ সাহেবের হাতে বয়াত হবো। কিন্তু প্রতিবার মাওলানা কাসেম বাধা দিয়ে বলত, এখানে নয়, বয়াত হবেন হযরত হাজী সাহেবের হাতে।[১]

এরপর হাজী সাহেবের প্রতি তার ভক্তি-ভালোবাসা কেবল বেড়েছে। এমনকি নিজের সবকিছু হাজী সাহেবের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। একসময় সেই মোবারক হাতে বয়াত হন। যার শুরুটা এভাবে–

একবার মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানবীর সঙ্গে একটা মাসআলা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি থানাভবন যান। সেখানে পৌঁছে শায়েখের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে হাজী সাহেবের খানকাহ উপস্থিত হন। হাজী সাহেব তখন কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করছিলেন। এটা ছিল হাজী সাহেবের সঙ্গে হযরত গাঙ্গুহীর পঞ্চম সাক্ষাৎ। হাজী সাহেব অত্যন্ত মহব্বত ও সহানুভূতির আচরণ করেন। জিজ্ঞাসা করেন, কেন এসেছ? বলেন, মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ থানবীর সঙ্গে মুনাজারা করতে এসেছি। হাজী সাহেব বলেন, না ভাই, এমনটা করো না; ইনি আমাদের মুরুব্বী! হযরত গাঙ্গুহী বলেন, আপনার মুরুব্বী হলে তো আমারও মুরুব্বী। পরে সুযোগ বুঝে হাজী সাহেবের কাছে বয়াত হওয়ার আবেদন করেন। হাজী সাহেব তার আগ্রহের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য বয়াত করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে হাজী সাহেবের মহব্বতের যে বীজ তার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছে সেটা শিকড় ছড়িয়ে বহু বিস্তৃত হয়েছে। এজন্য অস্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি আশা ছাড়েননি। নিজের সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। দু'তিন দিন পর অবশ্য হাজী সাহেব বয়াত করে নেন।

১. আরওয়াহে সালাসা ২৮৮।

www.maktabatulabrar.com

বয়াত ও খেলাফত

বয়াতের সময় ইমামে রব্বানী হাজী সাহেবকে বলেন, হযরত, আমার দ্বারা জিকির-শোগল ও সাধনা-মুজাহাদা কিছুই হবে না, আবার রাতেও উঠতে পারব না। হাজী সাহেব মুচকি হেসে বলেন, ঠিক আছে, সমস্যা কী? তখন এক খাদেম ইমামে রব্বানীকে জিজ্ঞাসা করল, পরে কী হলো? তিনি আশ্চর্য জবাব দিলেন–বলেন, পরে তো আমি মিটেই গেছি।

বয়াতের দু'তিন দিন পর হাজী সাহেব তাকে বারো তাসবীহের আমল দিলেন। রাতে হাজী সাহেব অভ্যাসমত তাহাজ্জুদ ও জিকিরের জন্য উঠতেন। অজু করে মসজিদে চলে যেতেন। হযরত গাঙ্গুহীও মসজিদের অন্য কোণায় গিয়ে তাহাজ্জুদ ও জিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। হযরত নিজেই বলেন, তখন আমার গলা ছিল ভালো, গায়েও শক্তি ছিল, উঁচু আওয়াজে জিকির করেছি। সকালে হাজী সাহেব বলেন, তুমি তো এমন জিকির করেছ, দেখে মনে হচ্ছিল, কোনো পুরনো সালেক বুঝি জিকির করছে। সেদিন থেকে আমার জিকিরের প্রতি মহব্বত হয়ে গেল।

বয়াত হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরে হাজী সাহেব বলেন, মিয়া রশিদ আহমদ! আল্লাহ পাক আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সেটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। সামনে এটা বাড়তে থাকবে। হযরত গাঙ্গুহী বলেন, একথায় সেদিন বড় আশ্চর্য বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, কী এমন জিনিস দান করেছেন! পনেরো বছর পরে বুঝেছি, সেটা কী ছিল!

মোটকথা– হযরত গাঙ্গুহী বিয়াল্লিশ দিন সেখানে ছিলেন। বাতেনী দৌলত ও রুহানী নেয়ামত নিয়ে থানাভবন থেকে ফিরে আসেন। হযরত হাজী সাহেব অনেক লোক নিয়ে দূর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেন। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে যান। রাস্তায় হাজী সাহেব তার হাত ধরে একাকী বলেন, কেউ যদি তোমার হাতে বয়াত হওয়ার আবেদন করে বয়াত করে নিবে। তিনি বলেন, আমার কাছে কে বয়াত হওয়ার আবেদন করবে? হাজী সাহেব বলেন, তোমার কী, আমি যা বলি তাই করবে।

তিনি থানাভবন থেকে গাঙ্গুহে ফিরে গেলেন। গাঙ্গুহে পৌঁছে তার যে অবস্থা হয়েছে, যে জওক-শওক দেখা দিয়াছে, সে ব্যাপারে তার মামাতো ভাই মাওলানা আবু নসর সাহেব বলেন, থানাভবন থেকে ফিরে হযরত আমার বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। অর্ধরাতে উঠে মসজিদে চলে যেতেন, পিছনে পিছনে আমিও যেতাম। যখন জিকির করতে শুরু করতেন

মনে হতো পুরো মসজিদ কাঁপছে। আর নিজের ওপর যে হালত হতো সেটা বলাই বাহুল্য।

এজাযত ও খেলাফত পাওয়ার পর রোনাজারি বহু গুণ বেড়ে গেল। সমস্ত রাত কেঁদে কেঁদে কাটাতেন। তার আম্মাজান একটা নীল রঙের চাদর তৈরী করে দিয়েছেন। যেন সেটা গায়ে দিয়ে মসজিদে যেতে পারেন এবং শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে পারেন। অত্যধিক রোনাজারিতে চোখের পানি মোছার কারণে চাদরের রঙ উঠে যায়।

মুরশিদের পরীক্ষা

থানাভবন অবস্থানকালে হযরত হাজী সাহেব তার ধৈর্য-সহ্য ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে ইমামে রব্বানী বলেন, কিছুদিন থানাভবনে অতিবাহিত হলে আমার আত্মমর্যাদায় লাগল হযরতের ওপর খাবারের ভার দিতে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, অন্যত্র খাবারের ব্যবস্থা করব। তবে সেটা কঠিন ছিল আবার অশোভনও। ফলে আমি বিদায় চাইলাম। হযরত অনুমতি না দিয়ে বলেন, আরো কিছুদিন থেকে যাও। আমি চুপ হয়ে গেলাম। থাকার ইচ্ছা তো ছিল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া কোথায় করব সেই ফিকিরে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ঘরে যাওয়ার মুহূর্তে আমার উদ্বেগের কথা অনুমান করে তিনি বলে ওঠেন, মিয়া রশিদ! খাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করো না, আমার সঙ্গে খাবে।

দুপুরে ঘর থেকে খাবার এলো। এক পেয়ালায় ছিল সুস্বাদু কোপ্তা, অন্য পেয়ালায় সাধারণ তরকারী। হযরত আমাকে দস্তরখানে বসালেন, কিন্তু কোপ্তার পেয়ালা দূরে রাখলেন। ইতিমধ্যে হাফেজ যামেন সাহেব এলেন। কোপ্তার পেয়ালা দূরে দেখে হাজী সাহেবকে বললেন, ভাই সাহেব! রশিদ আহমদের তো হাত বাড়িয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছে, পেয়ালাটা একটু কাছে রাখুন! হাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, নিজের সঙ্গে খাওয়াচ্ছি, এটাই বড় সৌভাগ্য, মন তো চায় চোর-চামারদের মত হাতে রুটি ধরিয়ে দেই। কথাটা বলে হাজী সাহেব চকিতে আমার দিকে তাকালেন–চেহারার কোনো পরিবর্তন আসে কি না! আল-হামদু লিল্লাহ, আমার অন্তরে কোনো প্রভাব পড়েনি, চেহারায়ও পরিবর্তন আসেনি। আমি ভাবছিলাম, তিনি যা বলছেন সত্য বলছেন। এই দরবার থেকে রুটি পাওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়। যেভাবেই পাওয়া যায় বড় ইহসান। এরপর তিনি আর কখনো আমাকে পরীক্ষা করেননি। এজন্যই তো আমার কিছু হলো না।

www.maktabatulabrar.com

শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর খানকায়

হযরত হাজী সাহেবের দরবার থেকে খোদায়ী নেয়ামত নিয়ে তিনি গাঙ্গুহ ফিরে আসেন এবং নিজের পূর্বপুরুষ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর খানকা আবাদ করেন। প্রায় তিনশ বছর ধরে সেই খানকা বিরাণ পড়ে আছে এবং ঘোড়া-গাধার আস্তাবলে পরিণত হয়েছে। তিনি নিজ হাতে সেই কামরা পরিষ্কার করেন যেখানে কুতুবুল আলম শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী বছরের পর বছর রিয়াযত-মুজাহাদা করেছেন। কামরার মাটি সমান করে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করেন এবং নতুন মাটি ছড়িয়ে দেন। পরে চাটাই বিছিয়ে ধূপ দেন, আতর ছিটান। এভাবে বিরাণ খানকা আবাদ করে রাতদিন জিকির-শুগল ও ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হয়ে যান। রাতের বেলায় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও রোনাজাতি করতেন। যে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন চোখের পানিতে তাতে দাগ পড়ে যায়।

পরিত্যাক্ত খানকা পরিষ্কার করে তিনি হুজরা বানিয়েছেন। সেখানে রোগী দেখতেন আবার দরস দিতেন। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেলে নতুন কমরা তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়। সবার সহযোগিতায় তিনি একটি নতুন কমরা তৈরি করেন। তখন খানকার নামধারী পীরজাদারা প্রমাদ গুণল। নিজেদের ব্যবসা মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করল। কারণ শিরক বেদাতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতেন। নতুন কামরা তৈরি করতে দেখে তারা যেন বাহানা খুঁজে পেল। সবাই একযোগ চাপ সৃষ্টি করল খানকা ছেড়ে চলে যেতে। তিনি তখনই বিছানাপত্র, কিতাবাদি ও কাপড়চোপড় নিয়ে চলে গেলেন। অথচ একসময় এখানে গাধা-ঘোড়া বাঁধা হতো। ছিল ময়লা-নোংরা ও সাপ-বিচ্ছুর আখড়া। সবকিছু তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন, অথচ আজ তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

ইমামে রব্বানীর মামুলাত

মামুলাতের ওপর ইস্তেকামাত ছিল আকাবিরে দেওবন্দের প্রধান বৈশিষ্ট। এটাই মূলত কামালে বেলায়েত ও আবদিয়্যতের আলামত। তারা মামুলাতের ওপর সর্বদা অটল থাকতেন। হাদিসে আছে, 'আল্লাহর নিকট সবচে' উত্তম আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়।' কথাটি তারা অন্তরে গেঁথে রাখতেন এবং আমলের মধ্যে মাহবুবিয়্যতের মাকাম পয়দা করতেন।

হযরত গাঙ্গুহী প্রচণ্ড রিয়াজত ও মুজাহাদা করতেন। এমনকি অবস্থাদৃষ্টে তার প্রতি মানুষের রহম এসে যেতো। দিনভর রোজা রাখতে-ন। বাদ মাগরিব বিশ রাকাত আওয়াবিন পড়তেন। তাতে অন্তত দুই পারা তেলাওয়াত করতেন। নামাজ পড়ে খাবার খেতে যেতেন বাড়িতে। তখন রাস্তায় ও ঘরে কয়েক পারা তেলাওয়াত করতেন। এশার নামাজ পড়ে সামান্য ঘুমাতেন। রাত দুটো বাজে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন তাহাজ্জুদে। কেউ কেউ তাকে একটা সময়ও অজু করতে দেখেছে। দৈনিক আড়াই তিন ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়তেন। ফজর পড়ে চিঠিপত্র লিখতেন, ফতোয়ার জবাব দিতেন। দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নিতেন। জোহর থেকে আসর পর্যন্ত মশগুল থাকতেন কুরআন তেলাওয়াতে। রমজানে তার দরবারে ছিল রাতদিন সমান।

মুফতী আজিজুর রহমান উসমানী বলেন, আমি বাইশ বছর যাবত হযরতের দরবারে আসা-যাওয়া করি। তার সময় যাপনের রুটিনে কখনো ব্যতিক্রম দেখিনি। দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। জোহরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতেন। পরে গোসল করে নামাজের প্রস্তুতি নিতেন। কামরায় সুন্নাত পড়ে মশগুল হয়ে যেতেন জিকিরে। পরে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াতেন। এরপর কামরায় এসে সুন্নাত, নফল, জিকির, অজিফা ও তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। তখন মেহমানগণও বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি জবাব দিতেন সঙ্গে জিকিরও জারি থাকত। চেহারা দেখে বুঝা যেতো গভীর ধ্যানে আত্মমগ্ন আছেন।

আসরের সময় নতুন অজু করে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল পড়তেন। তিনি নিজেই ইমামতি করতেন। আগত ভক্তবৃন্দ তখন তাকে ঘিরে থাকত। আলেমগণ বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। সব প্রশ্নের তিনি তাহকীকী জবাব দিতেন। এভাবে চলতে থাকত মাগরিব পর্যন্ত। অবসরে চলত জিকির ও তেলাওয়াত। মাগরিবের আজান হলে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করতেন। পরে সুন্নাত ও আওয়াবিন পড়ে দীর্ঘক্ষণ মুরাকাবা করতেন। অজিফা ও মাসনুন দোয়া পড়ে বাসায় গিয়ে খাবার খেতেন। এশার সময় মসজিদে যেতেন নতুন অজু করে। দু'রাকাত নফল পড়ে এশার নামাজ পড়াতেন। সুন্নাত বিতর মসজিদে পড়ে কামরায় ফিরতেন। এশার নামাজ পড়তেন দেরীতে, সুন্নাত ওয়াক্তে। পরে জিকির ও অজিফা থেকে ফারেগ হয়ে ঘুমাতে যেতেন। রাতের একতৃতীয়াংশ বাকি থাকতে

www.maktabatulabrar.com

উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। পরে সুবহে সাদেক পর্যন্ত করতেন তেলাওয়াত। এরপর সুন্নাত পড়ে মুরাকাবা করতেন। জামাতের সময় হলে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করতেন। নামাজ পড়তেন ভোরের আলো ফোটার পর। পরে কামরায় এসে সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত খালওয়াত করতেন। এশরাকের পর খুলতেন কামরা। তখন মুরিদগণ এসে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন। দশটা এগারোটার সময় খাবার খেতেন। এভাবে তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।[১]

প্রথম দিকে এসব ব্যস্ততা সত্ত্বেও এশরাকের পর থেকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত সবক পড়াতেন। জোহরের পর অজিফা তেলাওয়াত সেরে আসর পর্যন্ত হাদিস পড়াতেন। হাজারো তালিবে ইলম তার কাছ ইলম অর্জন করেছে।

প্রখর স্মৃতিশক্তি

হযরত গাঙ্গুহী একবার মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেবকে বলেন, অমুক মাসয়ালাটি ফতোয়ায়ে শামীতে দেখো। তিনি বললেন, মাসআলাটি ফতোয়ায়ে শামীতে নেই। হযরত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, অবশ্যই আছে, কিতাবটি আন। তিনি তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত। কিতাব আনা হলো। তিনি শামীর দুই-তৃতীয়াংশ ডানদিকে আর একতৃতীয়াংশ বামদিকে রেখে বলেন, নিচে দেখো। তিনি নিচে তাকিয়ে দেখেন মাসআলাটি জ্বলজ্বল করছে। এরপর তিনি অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বলেন, আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন, আমার জবান থেকে ভুলভাল কিছু বের করবেন না।[২]

এরই নাম তাকওয়া

ইমামে রব্বানীর তাকওয়ার সর্বনিম্ন দৃষ্টান্ত হলো, যত অসুখই হোক কখনো বসে নামাজ পড়েননি। এমনকি মৃত্যুশয্যায়ও যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতেন, বসে নামাজ পড়েননি। দু'তিন জন অতি কষ্টে দাঁড় করিয়ে কোমর ধরে রাখতো। তিনি কেয়াম ও রুকু সেজদা তাদের সহায়তায় করতেন। খাদেমরা বলত, হযরত! বসে নামাজ পড়ুন! তিনি জবাব দিতেন না।

---

১. তাযকেরাতুর রশিদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১।
২. আরওয়াহে সালাসা ২৯২।

একবার মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব আরজ করেন, এখনো যদি বসে নামাজ পড়া জায়েয না হয় তাহলে আর কবে হবে? জবাবে তিনি বলেন, অন্যের মাধ্যমে সক্ষমতাও এক প্রকার সক্ষমতা। আমার যেহেতু সাথী-সঙ্গী আছে, তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে নামাজ পড়ায়, তাহলে আমি কীভাবে বসে পড়ি? অবশেষে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর শক্তিও যখন ফুরিয়ে গেল তখন বসে নামাজ পড়তেন। কেমন যেন বুঝিয়ে দিলেন, একেই বলে শরীয়তের অনুসরণ! এরই নাম তাকওয়া![1]

হযরত গাঙ্গুহীর চিঠি

হযরত গাঙ্গুহী রহ. একবার নিজের হালত ও ওয়ারেদাত[2] জানিয়ে আপন শায়েখ ও মুরশিদ হাজী সাহেবের কাছে চিঠি লেখেন। মূলত শায়েখ তার অবস্থা জানতে চেয়েছেন। তাই চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটি মাকাতিবে রশিদিয়ায় ছাপা হয়েছে। হযরত ইমামে রব্বানী লেখেন–

'আপনি আমার হালত জানতে চেয়েছেন। আমার দুনিয়া ও আখেরাতের আশ্রয়স্থল মুহতারাম হযরত! আমি অধম বান্দার কী হালত আর কী গুণের কথা আপনার কাছে বলব! আপনি তো হলেন কামালাতের সূর্য। আমার খুবই লজ্জা অনুভূত হচ্ছে। আমি তো কিছুই নই, কিন্তু আপনার নির্দেশে বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার প্রিয় মুরশিদ! জাহেরী ইলমের অবস্থা হলো, আপনার কাছ থেকে এসেছি আজ সাত বছরের কিছুটা বেশি হলো, এখন পর্যন্ত দু'শর বেশি তালিবে ইলম হাদিসের সনদ নিয়েছে। তাদের অধিকাংশ তালীম-তরবিয়তের সঙ্গে যুক্ত এবং সুন্নাতের খেদমতে মশগুল আছে। তাদের মাধ্যমে দীনের প্রচার-প্রসার হচ্ছে। এরচে' বড় কোনো সম্মান ও সৌভাগ্য নেই। যদি আল্লাহ পাক কবুল করেন।

হযরতের দরবারে হাজিরির নতিজা হলো, অন্তরে আল্লাহ পাক ছাড়া অন্যের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতির আশা নেই। এমনকি কখনো নিজের শায়েখদের থেকেও পৃথক হয়ে যাই। ফলে কারো প্রশংসা বা নিন্দার পরোয়া নেই। প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারীকে অপছন্দ করি। গোনাহের প্রতি মনে স্বভাবত ঘৃণা আর নেকীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এসব নিঃসন্দেহে আপনার সোহবতের ফল; আপনার ফয়েয ও বরকতের ফলশ্রুতি। যাই হোক বেশি বলতে যাওয়া নিশ্চয় বেয়াদবি ও নির্লজ্জতা।

১. তাযকেরাতুর রশিদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪।

২. মনে ভাল যেসব চিন্তা-চেতনা ও তথ্যের উদয় হয় সেগুলোকে ওয়ারেদাত বলা হয়।–সম্পাদক

www.maktabatulabrar.com

হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দাও! আপনার নির্দেশ পালনার্থে লিখলাম। আমি মিথ্যাবাদী হই বা না হই আপনার ছায়া চাই, আমি তো কিছুই নই। আর আমার যা কিছু হালত আপনার বরকতেই। সালাম, ১৩০৬ হিজরী।'

হজের সফর

ডেপুটি আব্দুল হক রামপুরী হেজায সফরের সময় ইমামে রব্বানীর কাছে আবেদন করেন, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন! হযরত অত্যন্ত খুশিতে মঞ্জুর করেন। এটাকে মনে করেন গায়েবী দান। ফলে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। সব ব্যবস্থাপনা সেরে ১২৮০ হিজরির শুরুর দিকে তারা রওয়ানা হন।

সেই সফরে তিনি ছাড়াও হাকিম যিয়াউদ্দীন সাহেব, হাফেজ অহিদুদ্দীন সাহেব, হাজী আলাউদ্দীন সাহেব, হাজী মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব এবং হযরতের মামাতো ভাই মাওলানা আবু নসর সাহেবও ছিলেন।

পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমায় হাজী সাহেব তার প্রতি যে মহব্বত ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তা বলাই বাহুল্য। যতদিন মক্কায় ছিলেন নিজের কাছে রেখেছেন। আরাফাতের সফরে হযরত গাঙ্গুহীর উট ছিল হাজী সাহেবের উটের সঙ্গে। মিনা ও মুযদালিফায়ও ছিলেন একসঙ্গে।

মক্কায় থাকতে ইমামে রব্বানী স্বপ্ন দেখেন, আউলিয়া কেরামের একটা কাফেলা যাচ্ছে, তিনি স্বপ্নেই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও! এ দোয়া করে তিনি তাদের পিছনে দৌড়াতে শুরু করেন, এমনকি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হন। সকালে স্বপ্নের কথা হাজী সাহেবকে বললে, তিনি মুচকি হেসে বলেন, মিলে তো গেছোই, আর কি চাও!

দীর্ঘ রোগভোগ

মক্কায় অবস্থানকালে তিনি খুজলি পাচড়ায় আক্রান্ত হন। শুরুতে ছিল শুষ্ক খুজলি, পরে ভেজা খুজলি হয়ে যায়। সে অবস্থায় তিনি জাহাযে আরোহণ করেন। জাহাযে শরীর-স্বাস্থ্য একদম খারাপ হয়ে যায়। প্রচণ্ড জ্বর সঙ্গে মাথাব্যথা। তিনদিন পর্যন্ত বেহুঁশ থাকেন। পরে এমন দাস্ত শুরু হয় যে, থামার কোনো লক্ষণ নেই। এই কঠিন অসুখে তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য ছিলেন একমাত্র মাওলানা আবুন নসর সাহেব।

সপ্তম দিন জাহায মুম্বাই পৌছে। ইতিমধ্যে অসুখ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই। বহু চিকিৎসার

পর কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও আশ্বস্ত হওয়ার মত ছিল না। এরই মাঝে কাঁপুনি রোগ দেখা দিল। ফলে দুর্বল শরীর আরো দুর্বল হয়ে যায়। সর্বশেষ তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন বিখ্যাত হাকিম আজমল খান, যিনি ইকসিরে আজমের লেখক। হাকিম সাহেব হযরতের বাড়িতে গিয়ে তাকে দেখাশোনা করতেন। নাড়ি টিপে লিখে দিতেন ব্যবস্থাপত্র। ফলে দ্বিতীয় দিন থেকে কিছুটা উন্নতি লক্ষ করা গেল। অসুখের প্রকোপ কমতে থাকল। এমনকি তিনি নিজেই পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, কখনো কখনো উঠে বসতেন। স্বাস্থ্যের এতটুকু উন্নতি হলে হাকিম সাহেব পরামর্শ দিলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, অবস্থা এখন আশাব্যঞ্জক, এখন দেশে যেতে পারেন। পরে মাওলানা আবুন নসর সাহেব ইমামে রব্বানীকে নিয়ে সহি-সালামতে গাঙ্গুহে এসে পৌছেন। আল্লাহর রহমতে গাঙ্গুহে এসে সব সমস্যাও দূর হয়ে গেল। এমনকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

হজের দ্বিতীয় সফর

ইমামে রব্বানী ১২৯৪ হিজরিতে দ্বিতীয় হজ করেন। সময়টা ছিল তুর্কি ও রুশের যুদ্ধের সময়। এদিকে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তিনি আসলে হজের বাহানায় রোমে যাচ্ছেন, যেন তুর্কি সরকারের স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিয়ে জিহাদ করতে পারেন। লোকদের এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক। হযরতের উদ্দেশ্য ছিল শুধু হজ করা এবং রাসুলের দেশে হাজিরা দেয়া। সেমতে ১২ই শাউয়াল তিনি সাহারানপুর থেকে রওয়ানা হন। সেবার বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের একটা বিরাট জামাত তার সঙ্গে হজের সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই মোবারক কাফেলায় ছিলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী, হাকিম যিয়াউদ্দীন সাহেব, মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার সাহেব সস্ত্রীক, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব, মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব, মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব, মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ হাসান সাহেব, মৌলবী হাকিম মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাহেবের মত অবিস্মরণীয় উলামায়ে কেরাম।

কাফেলার লোকসংখ্যা ছিল একশর মত। তারা রেলযোগে মুম্বাই পৌছেন। সেযুগে মুম্বাই পর্যন্ত রেলের যোগাযোগ ছিল।

দু'টি কারামাত

এই মহান কাফেলা রাস্তায় বহু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। অনেক কারামত ঘটতে দেখে। তন্মধ্যে দুটি করামত উল্লেখ করা হলো–

www.maktabatulabrar.com

ইমামে রাব্বারীর ভাগিনা মৌলবী আজিজুর রহমান বলেন, তখন ছিল ফজর নামাজের সময়। সুবহে সাদেক হয়ে গেছে। ট্রেন এক স্টেশনে থেমে আছে। ইমামে রব্বানী নেমে অজু করেন। দু'রাকাত সুন্নাত পড়েন। পরে ফজরের জামাত শুরু করেন। জামাত হতে দেখে ট্রেনে যত মুসলমান ছিল প্রায় সবাই নেমে এলো। দ্রুত অজু করে জামাতে শরিক হয়ে গেল। এভাবে একটা বিরাট জামাত ফ্লাটফর্মে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেয়ার হুইসেল দেয়। হুইসেল শুনে অনেকে নামাজ ছেড়ে ট্রেনে উঠে যায়। কিন্তু ইমামে রব্বানী অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে নামাজ পড়েন। কোনো চিন্তা নেই, নেই কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। এটা ছিল হযরতের বিস্ময়কর কারামত যে, ট্রেন কেবল হুইসেল দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু এক কদমও অগ্রসর হতে পারছে না। যখন তিনি নামাজ শেষে সংক্ষিপ্ত দোয়া করে ট্রেনে ওঠেন, তখন ট্রেন চলতে শুরু করে। গাড়ি পাকা পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে। পরে এই লেট সময় কভার করা হয় ট্রেনের গতি বাড়িয়ে।

মুম্বাই পৌছে কাফেলা ২২ দিন জাহাযের অপেক্ষায় বসে থাকে। অথচ জাহায আসার নাম নেই। একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব বলেন, আজ বুঝতে পেরেছি পুরো কাফেলা মৌলবী মুহাম্মাদ কাসেম আঁটকে রেখেছেন। তার কতিপয় সাথী-সঙ্গী মুজাফফরনগর থেকে রওয়ানা হয়েছে, তারা যতক্ষণ না এসে পৌছে জাহায আসবে না। দেখা গেল তেমনই হলো। যেদিন মুজাফফরনগরের কাফেলা এসে পৌছল সেদিনই একটা জার্মানী জাহাযের ঠিকা নিলেন হাজী কাসেম সাহেব। পরে টিকেট বিক্রি শুরু করেন। পরের দিন জাহায মুম্বাই বন্দর থেকে রওয়ানা হয়। ঠিক অষ্টম দিন জাহায এডেন বন্দরে পৌছে। একদিন একরাত সেখানে অবস্থান করে জাহায আবার রওয়ানা হয়। চতুর্থ দিন জেদ্দা বন্দরে পৌছে। চার দিন জেদ্দায় অবস্থান করে সম্ভবত ২০ যিলকদ কাফেলা নিরাপদে পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং পরের দিন রাতে মক্কা নগরে পৌছে।

হাজী সাহেবের সান্নিধ্যে

হাজী সাহেব আগে থেকে খবর পেয়েছেন ইমামে রব্বানী ও কাফেলার আগমনের। ফলে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাদের এস্তেকবালের জন্য বাইরে আসেন। কাফেলা যখন বাবে মক্কায় পৌছল সবাই দেখল হযরত হাজী সাহেব পট্টি দিয়ে কোমর বেঁধে পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ইমামে রব্বানী তখনই সওয়ারী থেকে নেমে যান এবং হযরতের সঙ্গে মোয়ানাকা করেন। তিনি পুরো কাফেলাকে নিজের খানকায় আশ্রয় দেন। সকালে পুরো মজমাকে দাওয়াত করেন। ইমামে রব্বানী অবশ্য আপত্তি করে বলেন, আমরা লোক অনেক! কিন্তু হাজী সাহেব তার আপত্তি খণ্ডন করে বলেন, এতেই আমার আনন্দ, সবাই একসঙ্গে খাবে। হজের পর ইমামে রব্বানী পুরো কাফেলা নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় রওয়ানা হন। প্রায় বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। পরে মক্কায় ফিরে আসেন এবং এক মাস সেখানে অবস্থান করেন। যাদের খরচ ফুরিয়ে গেছে তাদের জোর দাবী ছিল দ্রুত দেশে ফিরে আসার। এমনকি কিছু সাথী-সঙ্গী রওয়ানা হয়ে গেছে। কিন্তু ইমামে রব্বানী কতিপয় সাথী-সঙ্গী নিয়ে থেকে যান। এক মাস অতিবাহিত হলে অবশিষ্ট সাথীরাও পরামর্শ করেন, ইমামে রব্বানীর কাছে দেশে ফেরার আবেদন করবেন, কিন্তু কারো হিম্মত হয়নি। অবশেষে কয়েক জন সাহস করে হাজী সাহেবের কাছে আরজ করেন, আপনি ইমামে রাব্বানীকে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিন। আমাদেরকে তার সোহবত থেকে বঞ্চিত করবেন না। হাজী সাহেব তাদের আবেদন মঞ্জুর করে ইমামে রব্বানীকে বলেন, মাওলানা! মন তো চায় না তোমাকে ছাড়ি, কিন্তু তোমার সাথী-সঙ্গীদের খরচ ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া তোমার মাধ্যমে হিন্দুস্তানবাসী উপকৃত হচ্ছে। তাই আমার মনে হচ্ছে, তুমি হিন্দুস্তানে ফিরে যাও।

শায়েখের নির্দেশে ইমামে রব্বানী বিদায় নেন এবং জেদ্দায় পৌছেন। জাহায প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাতে ছিল জায়গার সংকট। চলেই যখন যাবেন তখন জায়গার চিন্তা করে লাভ নেই, তাই টিকেট কিনে নিলেন। সন্ধ্যায় তারা জাহাযে চেপে বসেন। তের দিনের মাথায় নিরাপদে মুম্বাই পৌছে যান। পরে মুম্বাই থেকে গাঙ্গুহে পৌছেন।

তৃতীয় হজ

১২৯৯ হিজরিতে তিনি তৃতীয় হজের প্রস্তুতি নেন। সেই সফরের ব্যবস্থাপনাও হয় অপ্রত্যাশিত। পূর্ব থেকে কোনো প্রস্তুতি ছিল না। সময় এতই সংকীর্ণ ছিল যে, সময়মত পৌছার সম্ভাবনা ছিল না। ৪ঠা যিলকদ তিনি মুম্বাই থেকে রওয়ানা হন। মুম্বাই পৌছে দেখেন, সবাই রওয়ারা হয়ে গেছেন, শুধু হাতেগোনা কয়েকজন বাকি আছেন। তারা এই আশায় আছেন, হয়ত কোনো জাহাযে সময়মত পৌছতে পারবেন।

www.maktabatulabrar.com

সাথী-সঙ্গীরা জেদ্দার টিকেট কাটতে এবং হজের নিয়ত করতে নিষেধ করল। কারণ সময় একদমই সংকীর্ণ। বিশেষত নতুন আইনের কারণে। এই আইনের কারণে হাজীদেরকে কোয়ারেন্টিন[১]-এর জন্য অন্তত দশ দিন আঁটকে রাখা হতো। কিন্তু তিনি কারো কথা শোনেননি। টিকেট কেটে জাহাযে চেপে বসেন। জাহাযও মুম্বাই থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। ঠিক সপ্তম দিন পৌছে যায় এডেন বন্দরে। কয়েক ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করে জাহায হেজায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। নবম দিন জাহায জেদ্দায় পৌছে। নোঙ্গর করতেই মুসাফিরগণ নৌকায় চড়ে ডাঙ্গায় নেমে আসেন। কারো খেয়ালই ছিল না কোয়ারেন্টিনের কথা, অথচ আইনিভাবে এটা জরুরী ছিল। তবে জাহাযের মালিকপক্ষকে সরকারের ধমক খেতে হয়েছে কোয়ারেন্টিন ছাড়া চলে আসার কারণে। এমনকি ফিরতিপথে তাদেরকে ডবল কোয়ারেন্টিনের শাস্তি দেয়া হয়।

পবিত্র মক্কায় পৌছে দ্বিতীয় দিন হজের কাজ শুরু হয়ে যায়। তিনি অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে হজের রুকনগুলো আদায় করেন। পরে তৃতীয় বারের মত মুরশিদুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী সাহেবের যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এটা ছিল ইমামে রব্বানীর আখেরী হজ। এরপর পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে তালীম-তরবিয়ত ও তাযকিয়ায় মশগুল হয়ে যান।

ইন্তিকাল

জাহেরী ও বাতেনী তালীমের ধারাবাহিকতা ১৩১৩ হিজরী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৩১৪ হিজরীর শুরু থেকে চোখে পানি পড়া শুরু হয়। ফলে জাহেরী ইলমের ব্যস্ততাটুকু তাযকিয়ায়ে নফসে ব্যয় করতে থাকেন। ১৩২৩ হিজরির ৮ই জুমাদাস সানির জুমার দিন জুমার আজানের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ পাক তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। ফলে তাহাজ্জুদের সময় একটা ভয়ানক সাপ তার পায়ে দংশন করে। কিন্তু নামাজে আত্মমগ্নতার কারণে তার কোনো খবরই ছিল না। ভোরে যখন মসজিদে এলে খাদেমগণ দেখেন পা ও পাজামা সব রক্তাক্ত। তখন গিয়ে তার হুঁশ হয়।

---

১. 'কোয়ারেন্টিন' (قرنطينة) হল জাহাজে আরোহীদের মধ্যে মহামারি দেখা দিলে বা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক এরূপ আক্রান্ত ব্যক্তি বা আক্রান্ত হওয়ার জোরালো সন্দেহপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে সকলের থেকে তাদেরকে পৃথক রাখার সযত্ন ব্যবস্থাপনা।–সম্পাদক

দ্রুত কাপড় পরিবর্তন করে নামাজ পড়ান। এ সম্পর্কে হযরত বলেন, আমার তো সাপে কাটার অনুভূতি তখনো হয়নি, এখনো কোনো ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না। ১৩২৩ হিজরির ১২ বা ১৩ জুমাদাল আউয়ালে সাপে দংশন করেছে আর ৮ বা ৯ জুমাদাস সানি মোতাবেক ১১ই আগষ্ট ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৭৮ বছর সাত মাস তিন দিন। হাদিস অনুযায়ী তিনি শাহাদাতের মর্যদা লাভ করেছেন।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব তার জানাযা পড়ান। কেউ কেউ মনে করতেন, তাকে জাদু করা হয়েছে। সেজন্য সবরকম চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যখন সময় হয় বিলম্ব করা হয় না। আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে উঁচু মর্যদা দান করুন।

তিনি ছয় দিন আগে থেকে জুমার অপেক্ষা করতেন। শনিবার দিন জিজ্ঞাসা করতেন, আজ কী জুমার দিন? খাদেমগণ বলতেন, আজ মাত্র শনিবার। এরপরেও কয়েক বার জিজ্ঞাসা করতেন জুমার দিন সম্পর্কে। এমনকি যে জুমার দিন ইন্তিকাল করেছেন সেদিনও সকালে জিজ্ঞাসা করেছেন, আজ কোন্ দিন? যখন জানলেন আজ জুমার দিন সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া...

দু'টি শুভ স্বপ্ন

(১) হযরত হাজী সাহেবের ইন্তিকালের সংবাদ আসার কয়েক দিন পূর্বে হযরতের এক ভক্ত স্বপ্নে দেখেন, হাজী সাহেব দেওবন্দে তাশরিফ এনেছেন। তার চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল। তিনি বলছেন, আমার তো ইন্তিকাল হয়ে গেছে, আমি মৌলবী রশিদ আহমদকে নিতে এসেছি। ২০ শে যিলহজের মধ্যে নিয়ে যাবো। এই স্বপ্নের কারণে মুরিদগণ বেশ মুষড়ে পড়েন। স্বপ্নের কথা হযরতকে বলা হলে তিনি ভালো ব্যাখ্যা করেন, যেন সবার পেরেশানি দূর হয়। কিন্তু সঙ্গে একথাও বলেন, ভাই, ব্যাখ্যা তো ব্যাখ্যাই! এত দিনের মধ্যে তো কত মানুষ মরতে পারে! অনেক সময় অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে বলতেন, হযরত যখন নিতে এসেছেন মনে হয় ভালো মত নিয়ে যাবেন।

(২) সুরাতের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সুলায়মান মিয়া নামে একজন ইমাম থাকেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি চৌকিতে একজন বুযুর্গ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে বসে আছেন, অন্যজন চৌকির নিচে দাঁড়ানো। সুলায়মান মিয়া কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বুযুর্গ কে? আর তার পাশে

www.maktabatulabrar.com

দাঁড়ানো লোকটিই বা কে? তিনি জবাব দিলেন, বুযুর্গ হলেন হযরত মুহাম্মদ সা.। আর পাশের জন হলেন মাদ্রসায়ে ডাবেলের সাবেক মুহতামিম মাওলানা আহমদ সাহেবের পীর মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী। সুলায়মান মিয়া এই স্বপ্নের কথা মৌলবী আহমদ সাহেবকে বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এই স্বপ্ন তুমি কবে দেখেছ? সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, জুমাদাস সানীর আট বা নয় তারিখে। মূলত সেই তারিখে ইমামে রব্বানী ইন্তিকাল করেছেন। সমকালীন উলামায়ে কেরাম ও সূফিয়ায়ে কেরামের একটা বিরাট অংশ তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইমামে রব্বানীর কতিপয় ঘটনা

১. একবার এক লোক বয়াতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলো। হযরত ইমামে রাব্বানী জিজ্ঞাসা করেন, ভাই, তুমি তওবা করবে না ফকির হবে? সে জবাব দিল, আমি তওবা করব না, তবে ফকির হবো। হযরত বলেন, যদি তওবা করো আমি তওবা করিয়ে দিতে পারি। আর ফকির তো আমি নিজেও নই, তোমাকে কীভাবে ফকির বানাবো? তখন সে বলল, তাহলে আমি অন্যখানে দেখছি। এ কথা বলে সে অন্যত্র চলে গেল।

২. একবার ইমামে রব্বানীর উস্তাদজাদাহ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ইবনে মাওলানা মামলুক আলী সাহেব গাঙ্গুহে তাশরিফ আনেন। আসরের নামাজের সময় হযরত গাঙ্গুহী বলেন, হযরত, নামাজ পড়ান! হযরত নানুতবী অগ্রসর হন, কিন্তু হেঁটে আসার ফলে পায়ে ছিল ধূলোবালি। হযরত গাঙ্গুহী নিজের রুমাল দিয়ে তার পায়ের ধূলো পরিষ্কার করে দেন। হযরত নানুতবী নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকেন, কোনো পরোয়া করেননি।

৩. এমনিভাবে হযরত গাঙ্গুহী একবার খাবার খাচ্ছেন। ইতিমধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব তাশরিফ আনেন। তিনি তখন নিজের হাতের টুকরো তাকে দিয়ে ঘরে যান আরো খাবার আনতে। হযরত নানুতবী তখনি সেই টুকরো খেতে শুরু করেন।

৪. হযরত ইমামে রব্বানী একজনের মাধ্যমে কষ্ট পেলেন। তিনি বদদোয়া করতে পারেন এই আশঙ্কায় হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী আরজ করেন, হযরত! তার জন্য বদদোয়া করবেন না! তিনি ঘাবড়ে গিয়ে ভীত-চকিত হয়ে বললেন, তওবা, তওবা, মুসলমানের জন্য বদদোয়া করা যায়! আল্লাহ মাফ করুন!

৫. হযরত বলেন, যদি কোনো মজলিসে আল্লাহর সমস্ত অলী সমবেত হন, সেখানে শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী এবং আমাদের হযরত হাজী সাহেব থাকেন। আমরা হাজী সাহেবের দিকেই তাকিয়ে থাকব। শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী বা অন্য কারো দিকে ভ্রূক্ষেপও করব না। আমরা হাজী সাহেবের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করব। তবে হাজী সাহেবের উচিত তাদের অভিমুখী হওয়া। কেননা তারা ওনার পীর। আমাদের পীর তো হাজী সাহেব।

৬. মুন্সি তাজাম্মুল হোসাইন নামে আম্বেঠায় এক লোক ছিল। হযরত হাজী সাহেবের হাতে বয়াত ছিল। তার অভ্যাস ছিল, পীর-দরবেশদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এজন্য এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াত। একবার তার স্ত্রী হযরতের কাছে অভিযোগ করল। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করো কেন? সে আরজ করল, নিঃসন্দেহে আমাদের শায়েখ কামেল, তার মত কামেল শায়েখ নেই, আল্লাহর ফযলে তার সবকিছু আছে, কিন্তু আমার অন্তর চায় আমার কলব জারি হয়ে যাক। সেই উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করি। হযরত জিজ্ঞাসা করেন, এতে কী রাখা আছে? সে আরজ করল, আমি জানি, এতে কিছুই নেই, কিন্তু আমি কী করব মন চায়। হযরত বলেন, আচ্ছা, যাও, মসজিদে গিয়ে বস। সে মসজিদে গিয়ে বসল। এদিকে হযরত অজু করে খড়ম পায়ে মসজিদের দিকে গেলেন। খড়মের খটখট আওয়াজ শুনতেই তার কলব জারি হয়ে গেল। সে দৌড়ে এসে হযরতের পায়ে পড়ে গেল, আর বলতে লাগল, আমি যেটা চাই, সেটা হাসিল হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি আর কারো কাছে যাবো না। পরে এদিক-সেদিক যাওয়া বন্ধ করে দিলো।

৭. কাজী ইসমাঈল সাহেব বেঙ্গলোরী একবার হযরত গাঙ্গুহীর কাছে আরজ করেন, হযরত! কখনো সখনো সালেকদের দিকে দৃষ্টি দিয়েন! হযরত বলেন, আমি যোগীদের কাজ কেন করব? শুনে সে তাজ্জব হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, মাশায়েখের কাজকে তিনি যোগীদের কাজ বলছেন! পরে একবার দেওবন্দে বিরাট জলসা হলে হযরত সেখানে ওয়াজ করেন। কাজী ইসমাঈল সাহেবও ছিলেন সেখানে। শ্রোতাদের ওপর হযরতের ওয়াজের এমন আছর পড়ল যে, তারা জারজার হয়ে কাঁদা শুরু করল। কেউ কেউ অনিচ্ছায় গড়াগড়ি খাওয়া শুরু করল। তখন উপস্থিত কোনো কোনো আহ্লে বাতেন অনুভব করেন, হযরত মজমার দিকে এ

www.maktabatulabrar.com

উদ্দেশ্যে অভিমুখী হয়ে আছেন যেন তাদের মাঝে প্রশান্তি আসে। ওয়াজ শেষ হলে কাজী ইসমাঈল সাহেব হযরতের কাছে গিয়ে বলেন, মৌলবী সাহেব! কখনো কখনো এমনটা করবেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি কী করেছি, আমি তো কিছুই করিনি!

৮. একজন অকৃত্রিম স্বভাবের গ্রাম্যলোক আভ নামক জায়গায় হযরতকে বলেন–খাদেমরা তখন তার শরীর দাবিয়ে দিচ্ছিল–মৌলবী সাহেব! তুমি তো মনে মনে খুশি যে, লোকেরা তোমার খেদমত করছে। হযরত বলেন, ভাই, মন তো খুশি, কারণ শরীর আরাম পায়, কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ অন্তরে অহংকার আসে না। কখনো এই ভাব আসে না যে, আমি বড় আর যারা খেদমত করছে তারা ছোট। একথা শুনে গ্রাম্য লোকটি বলে উঠল, যদি অন্তরে অহংকার না আসে তাহলে খেদমত নিতে অসুবিধা নেই।

৯. হজের সফরে ইমামে রব্বানী একবার মখমলের পাতলা কাপড় পরে তওয়াফ করছিলেন। মাতাফে বসা ছিলেন এক অন্ধ বুযুর্গ। তওয়াফ করতে গিয়ে যখনই তিনি বুযুর্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, বুযুর্গ খাশন খাশন বলে চিৎকার করতেন। ইমামে রব্বানী অত্যধিক ভাবাচ্ছন্নতার কারণে সেদিকে লক্ষ করেননি। দ্বিতীয় বার তওয়াফের সময় যখন তিনি আবারো শব্দটা উচ্চারণ করলেন। তখন তিনি বুঝলেন বুযুর্গের আসল উদ্দেশ্য। তিনি তার দিকে তাকালে বুযুর্গ বলতে লাগলেন, সালেহীনের পোশাক পরিধান করো। তিনি নিজের মখমলের জামার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটাও সালেহীনের পোশাক। বুযুর্গ বলেন, না, না, মোটা হওয়া চাই। ইমামে রব্বানী আচ্ছা, ঠিক আছে, আল্লাহ পাক আপনাকে বরকত দিন, বলে তওয়াফে লেগে হয়ে যান এবং তওয়াফ পূর্ণ করেন।

১০. একবার তিনি নানুতা বা রামপুর তাশরিফ নিয়ে যান। শীতের মৌসুম ছিল। সকালে খদ্দরের ময়লা চাদর জড়িয়ে বসা ছিলেন। তার ডান ও বাম পাশে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব এবং হাকিম যিয়াউদ্দীন সাহেব। এক লোক এসে ডানে বামে উভয়ের সঙ্গে মোসাফাহা করল, কিন্তু ইমামে রব্বানীকে সাধারণ লোক মনে করে মোসাফাহা করল না। তার উস্তাদজাদা মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব যেহেতু তার সঙ্গে অকৃত্রিম আচরণ করতেন, তাই মুচকি হাসলেন। ইমামে রব্বানী বুঝে গেলেন। পরে বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, আমার তামান্না হয় না যে, লোকে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করুক।

১১. ইমামে রব্বানী একবার এশরাকের নামাজ পড়ে বাইরে আসেন। অভ্যাসের বিপরীত চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েন। আগের দিন কিরনাল থেকে একটা বরাত গাঙ্গুহে আসে। তাদের সঙ্গে নর্তকীও ছিল। বরাতের লোকদের মাঝে ইমামে রব্বানীর কতিপয় ভক্ত ছিল। তারা সকালে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খানকায় আসে। এসে দেখে হযরত চাদড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। তারা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকল, কিন্তু তিনি চাদর থেকে মুখ খোলেননি। অবশেষে একজন বলল, হযরত, আমরা সাক্ষাতের জন্য এসেছি! তিনি মুখ ঢেকেই আফসোসের সঙ্গে বলেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের কী প্রয়োজন? শেষে একজন পক্বকেশ লোক বুঝতে পারল, নর্তকী সঙ্গে আনাই আমাদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ফলে তারা ওজরখাহি করে বলল, হযরত, নর্তকী আমরা আনিনি, মেয়ে পক্ষের কারবার। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মেয়েপক্ষ তো কারো খোদা নয় যে, তাদের কথা মানতেই হবে। এ কথা তাদের মনে এতই রেখাপাত করল যে, সকলে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। পরে সবাই চলে গেলে তিনি চাদর থেকে মুখ খুলে উঠে বসেন।

১২. হযরতের পিতৃপুরুষ শাহ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর মাজারে উরস হতো। তিনি এটা কোনোভাবে বন্ধ করতে পারতেন না। এটা তার এতটাই মর্মপীড়ার কারণ হতো যে, কিছুতে সহ্য করতে পারতেন না। প্রথম দিকে উরসের সময় তিনি রামপুর চলে যেতেন। অবশেষে সেই মর্মপীড়াও একসময় সহ্য করতে অভ্যস্থ হয়ে যান। তখন তিনি খানকায় থাকতেন বটে, কিন্তু কোনো ভক্ত মুরিদ আসা পছন্দ করতেন না। এমনকি রাগে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না।

একবার ইমামে রব্বানীর খলিফা মাওলানা মুহাম্মাদ সালেহ জলন্ধরী অধীর হয়ে হযরতের সাক্ষাতে আসেন। ঘটনাক্রমে তখন ছিল উরসের সময়। যদিও তিনি জানতেন না উরস হচ্ছে, কিন্তু ইমামে রব্বানী নিজের নীতির কাছে ছিলেন অপারগ। ফলে তার আবেগ-অনুভূতি মুল্যায়ন করবেন দূরে থাক, সালামের জবাব ছাড়া একটি কথাও বলেননি। তাকে জিজ্ঞাসা করেননি–খাবার খাবে কি না, কখন এসেছ বা কেন এসেছ?

মৌলবী মুহাম্মাদ সালেহ সাহেব এভাবে দু'দিন অতিবাহিত করেন। হযরতের উপেক্ষা তার কাছে খুবই দুঃসহ মনে হলো। তিনি খুবই পীড়িত বোধ করেন। কিন্তু তিনি যতই ভাবছেন, কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

www.maktabatulabrar.com

হযরতের খেদমতে উপস্থিত হতেন আর দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে থেকে উঠে যেতেন। হযরত একটা কথাও বলতেন না। অবশেষে বিরহ সহ্য করতে না পেরে একদিন সামনে এসে কেঁদে পড়েন। আরজ করেন, আমি কী অপরাধ করেছি, যে কারণে শাস্তি পাচ্ছি? আমি আর সহ্য করতে পারছি না! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন! তিনি তখন তার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেন, অপরাধ আমার সঙ্গে করোনি, তাহলে আমি ক্ষমা করে দিতাম। অপরাধ করেছ আল্লাহর সঙ্গে, সুতরাং তার কাছে ক্ষমা চাও। তখন বুঝে এলো উরসের সময় আসাই অপরাধ হয়েছে। তখন তিনি ওজরখাহি করে বলেন, আল্লাহ সাক্ষী, উরসের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আল্লাহর কসম, আমি এ উদ্দেশ্যে আসিনি, আমি জানতা-মও না এখানে উরস হচ্ছে। ইমামে রব্বানী বলেন, যদিও তুমি উরসে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে আসোনি, কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে অন্যরা উরসে আসছে তুমিও তাদের সঙ্গে ছিলে। আর রসূল সা. বলেছেন, من كثر سواد قوم فهو منهم. 'যে কোনো সম্প্রদায়ের দল ভারী করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৩. একবার ইমামে রব্বানী দেওবন্দের দস্তারবন্দি মাহফিলে তাশরিফ আনেন। একদিন আসরের সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী নামাজ পড়ানোর জন্য মুসল্লায় দাঁড়ান। এমনকি নামাজ শুরু করে দেন। এদিকে মানুষের অত্যধিক ভিড় আর মুসাফাহার কারণে হযরত গাঙ্গুহী পিছিয়ে পড়েন। দ্রুত অজু-ইস্তিঞ্জা সেরে এমন সময় জামাতে শরিক হন যখন কেরাত শুরু হয়ে গেছে। সালাম ফেরানোর পর দেখা গেল, তিনি ভীষণ ব্যথাভারাক্রান্ত। চেহারায় রাগের চিহ্ন। তখন তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, আফসোস, আজ বাইশ বছর পর তাকবিরে উলা ছুটে গেল!

১৪. একবার হযরতের কাছে এক কলসি পবিত্র পানি এলো। অর্থাৎ রসূল সা.-এর চুল মোবারকে রাখা একটা শিশি ছিল কলসিতে। সেই পানি যখন গাঙ্গুহে পৌছল তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কলসিটি খোলেন। সেদিন যেই এলো সালামের জবাবের পর বলেন, মৌলবী ইয়াহইয়া! ওকে পানি পান করিয়ে দাও। মাওলানা আশেকে এলাহী মিরাঠী বলেন, সৌভাগ্যবশত আমিও গেলাম। সেই বরকতময় পানি পেয়ে ধন্য হলাম। আমি দেখলাম, নতুন যারাই আসত, তার নির্দেশে সেই পবিত্র পানি দেয়া হতো।

১৫. একবার এক অন্ধ খানকায় এসে খুবই ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশ

করতে লাগল। শায়েখের যিয়ারতের তামান্নার কথা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল। এমনকি ভক্তির আতিশয্যে বলল, মিরাঠ থেকে পায়ে হেঁটে এসেছি আল্লাহর নাম শেখার জন্য। খানকাবাসী তার ভক্তি-ভালোবাসা দেখে যারপরনাই বিস্মিত। তারা যথাসাধ্য আপ্যায়ন করল। এদিকে হযরত গাঙ্গুহী আজান হলে মসজিদে গেলেন। সে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু তিনি নিজের হাত গুটিয়ে নিলেন, এমনকি অবজ্ঞাভরে তাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন। প্রতিবারই সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এবং দীর্ঘদিনের যিয়ারতের তামান্নার কথা প্রকাশ করল। কিন্তু তিনি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেননি, যেমনটা অন্যদের বেলায় করে থাকেন। তার আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখে যারা মনে করেছিল সত্যিকার আশেক, তারাও অবাক! কিন্তু কারো সাহস নেই কিছু বলার। একসময় কয়েকজন হযরতের কাছে সুপারিশ করল। কিন্তু তিনি উল্টো সুপারিশকারীদের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং রাগের সঙ্গে বললেন, তোমাদের কোনো অধিকার নেই, এ বিষয়ে কথা বলার? তার অন্তর দেখ, দুনিয়ার মহব্বতে ভরপুর। পরে আর কারো সাহস হয়নি কিছু বলার। অবশেষে সেই অন্ধ চলে গেল।

দশ বারো দিন পর শুরু হলো উরস। দেখা গেল, সেই অন্ধ উরসে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিচ্ছে, কাওয়ালীতেও অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। সূফী করম হোসাইন –যিনি পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে জানেন– তার এ অবস্থা দেখে একদম তাজ্জব বনে গেলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মিয়া, হযরতের ভক্তি-ভালোবাসা কোথায় গেল? সে ছিল ঠোঁটকাটা স্বভাবের, তাই সত্য কথা বলে দিলড়্আরে ভাই! এটাই আমাদের ধান্দা। ভেবেছিলাম, তোমাদের হযরতকে পটিয়ে কয়েক দিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব। পরে উরসের সময় সেখানে অংশগ্রহণ করব। আমাদের কিসের ভক্তি, কিসের যিয়ারতের তামান্না, আমরা হলাম ভবঘুরে। এভাবে জীবন কাটাচ্ছি।

হযরতের কতিপয় বাণী

১. হযরত বলেন, নিসবত আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের নাম, এটা কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না। এটা কীভাবে হতে পারে আল্লাহ পাক একটা জিনিস বান্দাকে দিলেন, পরে কেউ সেটা ছিনিয়ে নিল?

২. ইমামে রব্বানীর কাছে লোকেরা এসে নিজেদের হালত বর্ণনা

www.maktabatulabrar.com

করত এবং অন্যদের ব্যাপারে অভিযোগ করত। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যসহ সবার কথা শুনতেন। একবার মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কাছে এসে লোকেরা অন্যদের শেকায়েত করে আর আপনি উভয় পক্ষের শেকায়েত শোনেন, আপনার ওপর কোনো আসর হয় না? জবাবে তিনি বলেন, আমি মনে করি তাদের উভয় পক্ষের মনে দুঃখ আছে। সুতরাং উভয় পক্ষের কথা না শুনলে কীভাবে বিশ্বাস করব সত্য না মিথ্যা।

৩. প্রথম জীবনে ইমামে রব্বানী তরিকতের হাকিকত নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। উপকারী মনে করে এখানে তা তুলে দেয়া হলো–

ইলমে সূফিয়া বলে জাহেরী ও বাতেনী ইলমকে এবং অন্তরের ইয়াকিনকে। এটাই হলো উন্নতমানের ইলম। সূফিবাদ হলো, নিজের চরিত্রকে সংশোধন করা, সর্বদা আল্লাহর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা। তাসাউওফের হাকিকত হলো, নিজেকে আল্লাহর রঙে রঙিন করা, নিজের চাহিদা মিটিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর রেজামন্দিতে নিজেকে বিলীন করে দেয়া। রসূল সা.-এর আখলাকই সূফীদের আখলাক। আর আল্লাহ পাক বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুমি সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' তাছাড়া হাদিসে যা কিছু এসেছে সেসবের ওপর আমল করাও সূফিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

সূফীদের আখলাকে হাসানা হলো, নিজেকে অন্যের চেয়ে নীচু মনে করা। এর বিপরীত হলো অহংকার। সৃষ্টিজীবের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। মানুষের দেয়া কষ্ট সহ্য করে উদার আচরণ করা। রাগ-গোস্বা হজম করা। অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেয়া। অন্যের হক নিজের হকের ওপর রাখা। এমনিভাবে ক্ষমা, দয়া-মায়া, উদারতা ও দানশীলতা। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা। সর্বপ্রকার লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা ছেড়ে দেয়া।

খরচে ভারসাম্য বজায় রাখা। বেশি উদারহস্ত না হওয়া আবার কৃপণতাও না করা। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। অল্পতুষ্ট হওয়া। পরহেজগারি অবলম্বন করা। ঝগড়াঝাটি, গালাগালি না করা, তবে ন্যায়সঙ্গত হলে ভিন্ন কথা। কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা। পদ ও সম্মানের লোভ না করা। ওয়াদা পূরণ করা। ধৈর্য, সহনশীলতা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করা। ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে মিল-মহব্বত রাখা। উপকারীর উপকার স্বীকার করা। নিজের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য

খরচ করা। সূফীদের আখলাকে নিজের জাহের বাতেনকে সজ্জিত করা। মূলত তাসাউওফের পুরোটাই হলো আদব। আল্লাহ পাকের আদব হলো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

৪. মাওলানা বেলায়েত হোসাইন সাহেব একবার জিজ্ঞাসা করেন, এই যে শোনা যায়, শয়তান পীরের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, কথাটি কি সত্য? জবাবে হযরত বলেন, হ্যাঁ, যদি মুরিদদের সত্যিকার নিষ্ঠা থাকে। অর্থাৎ তাদের মনে এ বিশ্বাস থাকে যে, পীর ছাড়া আমাদের হেদায়েতের কোনো উপায় নেই।

৫. হযরত বলেন, যারা উলামায়ে কেরামকে অপমান করে, গালাগালি দেয়, কবরে তাদের চেহারা কেবলার দিক থেকে সরে যায়। যদি মনে চায় দেখে নিতে পারো। গায়ের মুকাল্লিদরা যেহেতু ইমামদের গালমন্দ করে তাই তাদের পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহ।

৬. একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান মুরাদাবাদী জিজ্ঞাসা করেন, রসূল সা.-এর জন্মের ঘটনা প্রচলিত রুসুম ছাড়া কিতাব দেখে বলা কি জায়েয? হযরত বলেন, তাতে ক্ষতি কি! পরে বলেন, পীরজাদা সুলতান জাহান একবার বলে পাঠান, যে মিলাদ জায়েয সেটা পড়ে দেখিয়ে দিন! আমি বলে দিলাম, আমাদের মসজিদে চলে আসুন! তিনি ওজর করে বলেন, মহিলারাও শুনতে আগ্রহী, তাই বাড়িতে পড়লে ভালো হয়। আমি তখন মৌলবী খলিল আহমদ সাহারানপুরীকে মুফতী এনায়েত আহমদ সাহেবের তারিখে হাবিবে এলাহী কিতাবটি দিয়ে পাঠালাম। বলে দিলাম কিতাব দেখে পড়ে শোনাবে। তিনি গিয়ে দেখেন, দড়ি বিছানো। বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, যদি নিষেধ হয় উঠিয়ে ফেলি। মৌলবী সাহেব বলেন, দরকার নেই। শেষে মিলদ শুরু হলো। প্রথমে এই আয়াত পড়া হলো-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

পরে শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর বাণী ও মর্ম আলোচনা করা হলো। পরে প্রচলিত বেদাতের স্বরূপ উন্মোচন করা হলো এবং তথাকথিত সূফীদের মুণ্ডুপাত করা হলো। সর্বশেষ তারিখে হাবিবে এলাহী থেকে রাসুলের জন্মের বিভিন্ন ঘটনা পড়ে শোনানো হলো। মৌলবী সাহেবের বয়ান যাদের বিরুদ্ধে গেল ওরা বাড়িওলার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলো,

www.maktabatulabrar.com

এমনকি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তুমি এমন মৌলবী এনে আমাদের অপমান করেছ। পরিণামে সেই মিলাদে বহু ফায়দা হয়েছে।

৭. হযরত বলেন, আল্লাহ পাক যদি কারো অন্তর থেকে অহংকার বের করে দেন তার সব কিছু হাসিল হয়ে যায়।

হযরতের খলিফাগণ

ইমামে রব্বানীর তরবিয়তে যারা উঁচু মর্তবায়ে পৌছতে পেয়েছেন তারা হলেন।

১. হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী।
২. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী।
৩. মাওলানা শাহ আব্দুর রহিম রায়পুরী।
৪. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ আম্বীটি।
৫. শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী।
৬. মাওলানা মুহাম্মাদ রওশন খান সাহেব মুরাদাবাদী।
৭. মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দিক সাহেব মুহাজিরে মাদানী ইলাহাবাদী।
৮. মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব নাহটুরী। আরো বাইশ তেইশ জন আছেন যারা হযরতের তরবিয়তপ্রাপ্ত ও এজাযতপ্রাপ্ত। যাদের নাম তাযকেরাতুর রশিদে পাওয়া যায়।

(৩৯) শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর অষ্টাদশ উর্ধ্বতন পুরুষ শাহ নুরুল হক ছিলেন হোসাইনী সাইয়েদ। তিনি ৮০০ হিজরিতে যুক্ত প্রদেশের ফয়যাবাদ জেলার টাণ্ডা নামক শহরে এসে বসতি স্থাপন করেন। তৎকালে অঞ্চলটি ছিল জনৈক পৌত্তলিক রাজার কর্তৃত্বাধীন। তার অত্যাচারে সেখানকার মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। শাহ নুরুল হক স্বীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে ওই অত্যাচারী রাজাকে পরাজিত করেন এবং রাজ্যটির নাম রাখেন এলাহদাদপুর।

শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. ১৯শে শাওয়াল ১২৯৬ হিজরী মোতাবেক ৬ই অক্টোবর ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে আন্নাউ জেলার বাঙ্গারমৌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার ঐতিহাসিক নাম চেরাগ মুহাম্মাদ। তার পৈত্রিক নিবাস টাণ্ডা থানাধীন এলাহদাদপুর গ্রামে। প্রায় চারশ বছরের বেশি সময় ধরে তার খান্দান সেখানে বসবাস করছে।

তারা ছিলেন জমিদার ও পীর বংশ। জমিদারী ও পীরমুরিদী করে জীবন ধারণ করতেন। মুঘলদের এক বাদশা তার পূর্বপুরুষকে ২৪টি গ্রামের জায়গির দেয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ১৩টি গ্রাম অবশিষ্ট ছিল। পরে এক হিন্দু রাজা সেগুলো জবরদখল করে, এলাহদাদপুর লুটপাট করে এবং দলিল-দস্তাবেজ ছিনিয়ে নেয়। ফলে খান্দানের লোকেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং অন্যত্র গিয়ে বসবাস শুরু করে। তার পিতা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ বাঙ্গারমুয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ছিলেন মাওলানা ফজলে রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদীর বিশিষ্ট খলিফা। অত্যন্ত আবেদ, যাহেদ ও পরহেযগার।[১] মাওলানা ফযলে রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী বলেন, মাওলানা হাবিবুল্লাহ (হযরত মাদানীর পিতা) ছিলেন সাইয়েদ ও পীরযাদা। তার উর্ধ্বতন পুরুষ শাহ নুরুল হক ছিলেন অতি উঁচুস্তরের বুযুর্গ। একদা রাত্রে স্বপ্নযোগে তিনি আমাকে বলেন, ভাই! আমার সন্তান হাবিবুল্লাহর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রেখো।

শিক্ষা-দীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা পিতার কাছে লাভ করেন। পবিত্র কুরআনের পাঁচ পারা পড়েন মায়ের কাছে। অবশিষ্ট পারা পড়েন বাবার কাছে। ১৩ বছর বয়সে ১৩০৯ হিজরিতে দেওবন্দ গমন করেন। তখন বড় ভাই মাওলানা সিদ্দিক আহমদও দেওবন্দে পড়তেন। বড় ভাই ও প্রিয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। শায়খুল হিন্দ যদিও দাওরায়ে হাদিসের বড় বড় কিতাব পড়াতেন, কিন্তু তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রাথমিক কিছু কিতাব পড়িয়ে দেন। এ ছাড়াও তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন শায়খুল হিন্দের পিতা মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব, মাওলানা আব্দুল আলী মুহাদ্দিসে দেহলভী, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী, মুফতী আজিজুর রহমান উসমানী ও মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী প্রমুখের কাছে। হাদিসের সনদ লাভ করেছেন শায়েখ হাসবুল্লাহ শাফেয়ী মক্কী ও মাওলানা সাইয়েদ আহমদ বারযাঞ্জীর কাছ থেকে।

শৈশব থেকে তার মাঝে ছিল সৌভাগ্যের লক্ষণ ও মানবসেবার প্রবণতা। আবার শায়খুল হিন্দের বিশেষ তত্ত্বাবধান সোনায় সোহাগার কাজ দেয়। সতেরো বছর বয়সে দরসে নেজামীর ৬৪টি কিতাব মাত্র সাড়ে ছয় বছরে সমাপ্ত করে ফেলেন। উলুমে নবুওয়াতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে বিরাজ করতে থাকেন। কুড়াতে থাকেন সকল উস্তাদের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া ও ভালোবাসা।

১. বিস বড়ে মুসলামন ৪৬২।

শিক্ষাজীবনে সর্বদা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতেন। তখনকার যুগে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৫০। অথচ তিনি অধিকাংশ কিতাবে ৫১, ৫২, ৫৩ নম্বর পেতেন। সদরার মত কঠিন কিতাবে একবার পেয়েছেন ৭৫ নম্বর। অল্প বয়সে বিপুল যোগ্যতার অধিকারী হওয়ায় উস্তাদগণ স্নেহের বশে ডাকতেন—মাসতুরাতী মুন্সি তথা মহিলাদের মৌলবী। উস্তাদগণের সব রকম খেদমতে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে।

মদিনায় হিজরত

১৩১৬ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন। ইতিমধ্যে তার পিতা হিজরতের সংকল্প করেন। তিনিও পিতামাতা ও ভাইদের সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন।

বিদায়ের সময় প্রিয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দ তাকে অসিয়্যত করে বলেন, পড়াতে থাকবে; কখনো ছাড়বে না, দু'একজন হলেও পড়াতে থাকবে। উস্তাদের নসিহত তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পড়িয়ে গেছেন। মদিনায় প্রচণ্ড অভাব-অনটনে, হিন্দুস্তানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে, জেল-জুলুমের মাঝেও ছিলেন উস্তাদের নসিহতের ওপর অটল। সর্বদা ইলমচর্চা ও তালীম-তরবিয়তে নিয়োজিত ছিলেন। এমনকি করাচীর জেলে অবস্থানকালে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেবকে কুরআন শরীফের তরজমা পড়িয়েছেন।

মদিনায় তার দরসের সুনাম-সুখ্যাতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। তার হালকায়ে দরস ক্রমে সুপ্রশস্ত হতে থাকে। তালিবে ইলমের বিরাট জামাত শরিক হয় তার দরসে। মোতালায়া ছাড়া তিনি সবক পড়াতেন না। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র তিনঘণ্টা আরাম করতেন। বাকি সময় দরস-তাদরীস, জিকির-অজিফা ও কিতাব মোতালায় মগ্ন থাকতেন। পড়ানোর সময় সামনে কোনো কিতাব রাখতেন না। ছাত্ররা পড়ত আর তিনি মুখস্থ তাকরীর করতেন। অথচ অন্যরা সামনে কিতাব রাখতেন, এমনকি শরাহ শুরুহাতও রাখতেন। এভাবে দৈনিক পনেরোটি সবক পড়াতেন। একসময় তিনি 'শায়েখ হরমে মদিনা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। নকশে হায়াত নামক কিতাবে তিনি লেখেন,

'একসময় তালিবে ইলমের ভিড় অত্যধিক বেড়ে গেল। ফলে

www.maktabatulabrar.com

মাদরাসার সময়ের বাইরে মসজিদে নববীতে পড়াতে শুরু করলাম। ফজরের পর, আসরের পর, মাগরিবের পর এমনকি এশার পরও বিভিন্ন বিষয় পড়াতে লাগলাম। এতে অনেকে চোখ টাটাল, কেউ কেউ খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে নাজেহাল করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারেনি, কারণ আমার আরবী ভাষা ছিল সাবলীল। তাছাড়া আমি খায়রাবাদী আলেমদের অনুসরণ করতাম। পড়ানোর সময় মূল কিতাব, হাশিয়া বা শরাহ সামনে রাখতাম না। ছাত্রদের এবারত পড়ার পর বিষয়বস্তুর ওপর তাকরীর করতাম। বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতাম।'

তিনি বলেন, একবার রাবেগ মনযিলে রাত্রি যাপনের সময় রসূল সা. কে স্বপ্নে দেখি। এটা ছিল আমার প্রথম যিয়ারত। আমি রাসুলের পায়ে পড়ে যাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী চাও? আমি বলি, যেসব কিতাব পড়েছি সেগুলো যেন মুখস্থ হয়ে যায়। আর যেগুলো পড়িনি সেগুলো যেন পড়তে পারি। জবাবে তিনি বলেন, ঠিক আছে, তোমাকে দেয়া হলো। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি 'শায়খুল আরব ওয়াল আজম' উপাধিতে ভূষিত হন।১

হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘদিন মসজিদে নববীতে হাদিস পড়িয়ে অবশেষে ১৩২৬ হিজরিতে দেওবন্দ ফিরে আসেন এবং শায়খুল হিন্দের দরসে শরিক হন। পরে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়। তিনি নিজেই লিখেন, 'হযরত শায়খুল হিন্দসহ সকল বুযুর্গ উস্তাদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে দারুল উলুমের খেদমত করার সুযোগ দেন। তারা এ প্রস্তাবও পাশ করেন, মাওলানা মাদানী যখনই হিন্দুস্তানে আগমন করবেন, কোনো নিয়োগপত্র ব্যতীতই দারুল উলুমে শিক্ষকতা করবেন। মোটকথা আমাকে শিক্ষকতার পদে নিয়োগ দিয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হাদিস, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতি বিষয়ের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো পড়াতে দেয়া হয়।'

১৩২৯ হিজরিতে তিনি আবারো মদিনা শরিফে গমন করেন এবং মাল্টায় নির্বাসন পর্যন্ত দরস-তাদরীসে মশগুল থাকেন। মাল্টা থেকে ফিরে কিছুদিন দরস দেন আমরুহার জামে মসজিদে। পরে শায়খুল হিন্দ তাকে

১. বিস বড়ে মুসলামন ৪৬৬।

নিজের খেদমতের জন্য ডেকে নেন। কিছুদিন পর মাওলানা আবুল কালাম

www.maktabatulabrar.com

আযাদ কলকাতা মাদরাসায়ে আলিয়ার জন্য সদরে মুদাররিস চেয়ে শায়খুল হিন্দের কাছে আবেদন করেন। শায়খুল হিন্দ এ বিষয়ে নিজের বহু খাদেমের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সকলেই তাকে নিষেধ করেন দেওবন্দ ত্যাগ করে কলকাতা যেতে। অবশেষে শায়খুল হিন্দের নির্দেশে হযরত মাদানী কলকাতা আলিয়ায় গমন করেন। ১৩৩৯ হিজরিতে শায়খুল হিন্দের ইন্তেকালের পর কিছুদিনের জন্য দেওবন্দ আসেন। পরে পুনরায় কলকাতা গিয়ে পড়াতে থাকেন। করাচির মুকদ্দমার সময় তিনি ছিলেন কলকাতায়। তবে গ্রেফতারি ও জেল-জুলুমের আশঙ্কায় মাদরাসা থেকে চলে যান।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকেন। জামিয়া ইসলামিয়া সিলেটের শায়খুল হাদিস হিসাবে জীবনের শেষ পর্যন্ত দরস দেন। অবশেষে ১৩৭৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ৩১ বছরের তাদরীসি জীবনে তার কাছে হাজারো ছাত্র ইলম অর্জন করে।

দরসের বৈশিষ্ট্য

হযরত মাদানীর দরসে অত্যন্ত শান্ত, নীরব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করতো। তবে ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তি বা অমনোযোগিতা লক্ষ্য করলে ইলমী কৌতুক শুরু করতেন। ফলে সবার মাঝে আনন্দ উৎফুল্লতা ও সজীবতা ফিরে আসতো।

সবকে প্রতিটি মাসআলায় ইমামগণের মতামত, তাদের বিভিন্ন ধরনের উক্তি এবং টীকাকারদের মতামত বর্ণনা করতেন। আবার প্রত্যেক ইমামের দলিল-প্রমাণও উল্লেখ করতেন বিশদভাবে। অতঃপর নকলী দলিল ও যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা ইমাম আজমের মাযহাবকে সপ্রমাণ করতেন। সাধারণত অন্য ইমামগণের শক্তিশালী দলিলকে শুধু তরজমার কারিশমায় নিজ মাযহাবের পোষকতায় নিয়ে আসতেন। পরস্পর বিরোধী হাদিসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। ইমাম আজমের মাযহাব বর্ণনার সময় তার মাঝে পরিলক্ষিত হতো প্রচণ্ড জোশ ও জযবা। দলিলের পর দলিল ও যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে ইমাম আজমের মাযহাবকে সপ্রমাণ করতেন। শ্রোতাদের মনে হতো স্বয়ং ইমাম আজম বুঝি কাছে দাঁড়িয়ে শিখিয়ে দিচ্ছেন। জটিল থেকে জটিল মাসআলা নিমেষের মধ্যে সমাধান করে দিতেন। যত কঠিন প্রশ্নই হোক তৎক্ষণাৎ কুরআন হাদিস থেকে ইমাম আজমের পক্ষে দলিল পেশ করতেন।

সবকে ইমামগণের নাম অত্যন্ত তাযীম ও সম্মানের সঙ্গে নিতেন।

এমনকি হাদিসের টীকাকার ও শারেহীনদের নামের সঙ্গেও বলতেন রাহেমাহুল্লাহ। এ ক্ষেত্রে কোনো তালিবে অবহেলা করলে সতর্ক করতেন। এ আদব রক্ষা করার কারণেই উর্ধ্বজগতের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের রূহ তার জন্য দোয়া করত।

এ সম্পর্কে হযরত মাদানী বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক লোক বলছে, চার মাযহাবের ইমামগণ তোমার জন্য দোয়া করেন। কেননা তুমি সবকে কোনো ইমামের নাম এলে সাথে সাথে 'রাহেমাহুল্লাহ' বলে থাক। এমনকি আমি আশপাশে কয়েকজনকে দেখলাম হাত তুলে আমার জন্য দোয়া করছে।

এ ছাড়া সবকে তিনি আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসাও করতেন। রূহ ও কলবের বহু রোগী তার সবকে বসে আরোগ্য লাভ করত।

বয়াত ও খেলাফত

সুলুক ও তাসাওউফেও তিনি ছিলেন শায়খে কামেল। ১৩১৬ হিজরিতে শায়খুল হিন্দের ইঙ্গিতে তিনি কুতুবুল আলম মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর দরবারে উপস্থিত হন। বয়াতের দরখাস্ত করতেই তিনি কবুল করে নেন। তখনি হযরত মাদানীর পিতা মদিনায় হিজরতের ইচ্ছা করেন। সঙ্গে তিনিও যাওয়ার সংকল্প করেন। হযরত গাঙ্গুহী বলেন, আমি তোমাকে বয়াত করে নিচ্ছি, মক্কায় শায়খুল মাশায়েখ হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী আছেন; তার কাছে গিয়ে বলবে, তিনি তোমাকে জিকিরের তালকীন করবেন।

পবিত্র মক্কায় পৌছে দরবারে এমদাদিয়ায় উপস্থিত হয়ে তিনি আরজ করেন, হযরত গাঙ্গুহী আমাকে বয়াত করে নিয়েছেন। সঙ্গে একথাও বলেছেন, জিকিরের তালকীন হযরতের কাছ থেকে নেবে। শুনে হাজী সাহেব তাকে জিকিরের তালকীন করেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন সকালে এখানে বসে এই জিকির করতে থাকবে। এভাবে বাতেনী তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে তার রুহানী তারাক্কী হতে থাকে।

এর পর তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় রওয়ানা হন। তখন হাজী সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি।' মদিনায় দীর্ঘদিন তিনি হরমে নববীতে হাদিসের দরস দেন। কখনো জিকির ও মোরাকাবায় মশগুল থাকেন। তখন একাধিক স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ পান।

১৩১৮ হিজরিতে হযরত গাঙ্গুহী তাকে এবং তার বড় ভাই মাওলানা

www.maktabatulabrar.com

সিদ্দিক আহমদকে চিঠির মাধ্যমে ডেকে পাঠান। তারা মদিনা থেকে হযরত গাঙ্গুহীর দরবারে উপস্থিত হন। কিছুদিন খেদমতে থাকার পর হযরত গাঙ্গুহী তাদেরকে বয়াতের এজাযত দেন এবং নিজ হাতে মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন। পাগড়ি বাঁধার সময় জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার এটি কিসের পাগড়ি? জবাবে মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বলেন, সম্মানের পাগড়ি। ইমামে রব্বানী বলেন, না, বরং খেলাফতের পাগড়ি। এভাবে তিনি কামালাতে রশিদিয়া ও এমদাদিয়া উভয় ফুয়ুয ও বারাকাত লাভে ধন্য হন।

এদিকে শায়খুল হিন্দের নেকদৃষ্টি তো বাল্যকাল থেকেই পাচ্ছেন। আবার মাল্টার বন্দিজীবনে সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়ে জানতোড় খেদমত করেছেন। এভাবে শায়খুল হিন্দের একান্ত আস্থাভাজন ও প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তার কলকাতা যাওয়ার প্রাক্কালে শায়খুল হিন্দ দুর্বলতাবশত বিছানা থেকে উঠতে পারেননি। তখন তিনি তার হাত টেনে নিয়ে নিজের মাথায় চোখে লাগান, বুকের ওপর চেপে ধরেন এবং সমস্ত শরীরে তার হাত বুলান।

এভাবে এমদাদী, কাসেমী, রশিদী ও মাহমুদী কামালাত তাকে বহু সমুদ্রের মিলন মোহনায় পরিণত করে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই একটি স্বপ্নের কথা বলেন, 'আহমদাবাদ জেলে থাকাকালে আমি একবার স্বপ্নে দেখি, একজন লোক উর্ধ্বজগত থেকে ডেকে বলছে, আল্লাহ তাআলার যেই রহমত শায়খুল হিন্দের ওপর বর্ষিত হতো, এখন থেকে তার মোড় তোমার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

রুহানী তালীম-তরবিয়ত

হযরত গাঙ্গুহীর কাছ থেকে যদিও তিনি খেলাফত লাভ করেছেন, কিন্তু শায়খুল হিন্দের জীবদ্দশায় বয়াত শুরু করেননি। শায়খুল হিন্দের ইন্তিকালের পর বয়াতপ্রার্থীকে পরামর্শ দিতেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর শরণাপন্ন হতে। কিন্তু সাহেবজাদা জনাব হাকীম মাসউদ আহমদ গাঙ্গুহী অনুযোগ করে বলেন, আপনি বয়াত না করলে তো আব্বাজান মরহুমের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবে! তখন থেকে তিনি বয়াত করতে শুরু করেন। গাঙ্গুহ শহরের জনৈক লোক সর্বপ্রথম বয়াত হন।

তখনও তিনি খুব কম বয়াত করতেন। প্রার্থীদের টালবাহানা করে সরিয়ে দিতেন। কখনো থানবীর দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. বলেন, একবার আমি হযরত মাদানীর

নিকট আবেদন করলাম, আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছা হয়। হযরত মাদানী বলেন, বেশ তো করুন! আমি অনুযোগ করে বললাম, হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত হাজী সাহেব আপনাকে যে খেদমত অর্পণ করেছেন এর প্রতি কি আপনার কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে? না শুধু ভারতের স্বাধীনতা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি সেই খেদমত সম্বন্ধে উদাসীন নই। এ উদ্দেশ্যেই প্রতি রমজান আমি সিলেটে অবস্থান করি। এরপর তিনি যতবারই সিলেট থেকে আসতেন আমাকে মুরিদদের দু'একটি চিঠি দেখাতেন। বলতেন, দেখুন, তাদের কতখানি উন্নতি হয়েছে। শায়খুল হাদিস বলেন, এ সমস্ত চিঠি দেখে আমি মনে মনে লজ্জিত হতাম, কেন তার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করতে গেলাম!

যদিও তরীকতের তালীম প্রাচীনকাল থেকেই ছিল কষ্টসাধ্য বিষয়। কিন্তু হযরত মাদানী মানুষের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। সাধারণত তাওয়াজ্জুহ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি এসলাহের কাজ করতেন। যার ভাগ্যে এসলাহ থাকত এতেই কাজ হয়ে যেত। যারা তার মজলিসে ওঠাবসা করেছেন তারা জানেন, তালীম তরবিয়তের ক্ষেত্রে তার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, কিংবা তাসাওউফের কোনো গূঢ়তত্ত্বও বর্ণনা করতেন না। আগন্তুকরা এসে দেখত তিনি হয়ত সংবাদপত্র পাঠ করছেন, বা চিঠিপত্র পড়ছেন, অথবা জবাব লিখছেন। কিন্তু তাওয়াজ্জুহের অবস্থা ছিল এমন, যার প্রতি দৃষ্টি দিতেন জীবনের মোড় ঘুরে যেতো, জীবনে বিপ্লব দেখা দিত। এ কারণেই অতি অল্প কালের মধ্যে তার খলিফার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৭।

শেষ জীবনে জনগণও মুরিদ হওয়ার জন্য তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হাজার হাজার লোক মুরিদ হয়ে তার সিলসিলায় শামিল হয়। কখনো কখনো বয়াতপ্রার্থীর সংখ্যা এত অধিক হতো যে, তিনি লাউড স্পীকারের সাহায্যে বয়াত করতে বাধ্য হতেন।

পরিবার-পরিজন

হযরত মাদানী মোট চারটি বিবাহ করেছেন। প্রথম বিবাহ হয় আজমগড় জেলার অন্তর্গত কেতালপুর গ্রামে। সেই বিবির গর্ভে দু'জন কন্যার জন্ম হয়। তাদের একজন শৈশবে মারা যায়, অন্যজন সিরিয়ায় থাকাকালে মৃত্যুবরণ করে। তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন মুরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত বিছরায়ুনে কারী গোলাম আহমদ সাহেবের কন্যার সঙ্গে।

www.maktabatulabrar.com

এ বিবির গর্ভে দুই পুত্র আখলাক আহমদ ও আশফাক আহমদ জন্মগ্রহণ করে। আখলাক আহমদ আট বছর বয়সে হিন্দুস্তানে এবং আশফাক আহমদ দেড় বছর বয়সে মদীনায় মারা যায়। এ বিবি সাহেবাও মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। হযরত মাদানীর মাল্টার বন্দিজীবনে তারা ইন্তিকাল করেন। তার তৃতীয় বিবাহ হয় কারী গোলাম আহমদ সাহেবের ছোট কন্যার সঙ্গে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবির ছোট বোনের সঙ্গে। এ বিবির গর্ভে মাওলানা আসআদ সাহেবের জন্ম হয়। তার একজন বোনও হয়, কিন্তু শৈশবে মারা যায়। তিনি চতুর্থ বিবাহ করেন নিজের চাচাত ভাই সাইয়েদ বশির উদ্দীন সাহেবের মধ্যমা কন্যাকে। এ বিবির গর্ভে তার দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যার জন্ম হয়। দুই পুত্র হলেন আরশাদ সাহেব ও আমজাদ সাহেব আর পাঁচ কন্যা হলেন, রায়হানা, সাওয়ানা, রাখশানা, এমরানা ও ফারহানা।

তাওয়াক্কুলের জীবন

হযরত মাদানী রহ. তাওয়াক্কুলের ওপর জীবন যাপন করতেন। মাদিনা মুনাওয়ারার ১৮ বছরের জীবন সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুলের ওপর অতিবাহিত হয়। তখন মদিনার হরম শরীফে শিক্ষকতা করতেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা বেতনে। মাওলানা আব্দুল হক মাদানীকে তিনি তখন বিশেষভাবে পড়াতেন। তার পিতা পুত্রের গৃহশিক্ষকের পারিশ্রমিক বাবদ শায়খকে কিছু দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। বিনা বেতনে পড়াতে থাকেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন তার পরিবারের বারোজন সদস্য দৈনিক তিন পোয়া মশুর ডালের পানি পান করে জীবন ধারণ করতেন। তবে উপলক্ষ্য-স্বরূপ তিনি একটি খেজুরের দোকানও দিয়েছেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে দোকানের পুঁজি ফুরিয়ে যায়।

হিন্দুস্তানে থাকাকালে তার জীবনের অধিকাংশ সময় জেলখানায় অতিবাহিত হয়। ঘরের খরচপত্রের ব্যবস্থা তাওয়াক্কুল ছাড়া কিছুই ছিল না। দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বটে, কিন্তু মেহমানদারি ও দুঃখী-দরিদ্রদের সাহায্য সংক্রান্ত ব্যয় ছিল প্রচুর। দেওবন্দে যতদিন সবক পড়াতেন কেবল ততদিনের বেতন গ্রহণ করতেন। মোটকথা তার গোটা জীবন ছিল তাওয়াক্কুলের মূর্ত প্রতীক।

রাজনৈতিক খেদমত

প্রথম জীবনে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ছিল না। এমনকি তার সাথী মাওলানা উযাইর গুল সাহেবকে বলতেন, আপনারা শায়খুল হিন্দকে কী ঝামেলায় ফেলে দিয়েছেন! এ সম্পর্কে তিনি নকশে হায়াতে লেখেন, 'তখন পর্যন্ত আমি হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি। এমনকি শায়খুল হিন্দের কর্মতৎপরতা সম্পর্কেও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। মদিনায় পৌছে শায়খুল হিন্দ একটি বিশেষ সভায় আমাকে ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবকে ডাকেন এবং নিজের অতীত কার্যাবলী ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।'

শায়খুল হিন্দের আরাদ্ধ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেন। তালীম-তরবিয়ত ও রুহানী খেদমতের পাশাপাশি রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন জোরালোভাবে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসাবে তার মর্যাদা ছিল অত্যুচ্চ। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি কয়েকবার জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। স্বাধীনতার জন্য জানমাল কুরবান করেছেন, জীবন বাজি রেখেছেন, এমনকি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যৌথভাবে আন্দোলন করেছেন। অবশেষে দেশ স্বাধীন করেছেন। ইংরেজের সীমাহীন জেল-জুলুম ও নির্মমতা তার হিম্মতে সামান্য চিড় ধরাতে পারেনি। ইংরেজ সরকারকে তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন–প্রথমে হিন্দু-মুসলিম মিলে দেশ স্বাধীন করা হবে। পরে মুসলিম দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হবে হিন্দুস্তান আক্রমণ করার জন্য।

তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুরা যখন মুসলমানদের জীবন সংশয়ে ফেলে দিল, হিন্দু ও শিখেরা মিলে মুসলমানদের কচুকাটা করতে লাগল, মুসলিমরক্তে হোলিখেলা খেলতে লাগল, তখন তিনি ও মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী তুমুল গোলাগুলির মধ্যেও নিজেদের জীবন বাজি রেখে মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করেছেন। দিল্লি, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ ও মিরাঠের অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাস্তবতা হলো– হিন্দুস্তানে মুসলমানদের নেতৃত্বের মুকুট হযরত মাদানীর মাথায় শোভা পায় আর পাকিস্তানে মুসলমানদের নেতৃত্বের মুকুট শোভা পায় আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানীর মাথায়। উভয়ে ছিলেন একই মাদারে ইলমীর সন্তান, একই উস্তাদের শাগরেদ। হযরত শায়খুল হিন্দ ছিলেন উভয়ের উস্তাদ।

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু একজন নিজের ইলমী ইজতিহাদের মাধ্যমে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন আর অন্যজন সমর্থন করেছেন মুসলিম লীগকে। আল্লাহ পাক তাদের কবরে রহমত নাযিল করুন। তাদের ব্যাপারে বদধারণা থেকে আমাদেরকে হেফাজত রাখুন।

ইন্তিকাল

সমগ্র জীবন তিনি দেশ ও জাতির খেদমত করেছেন। অবশেষে এই মহামনীষী ১৩৭৭ হিজরির ১৩ই জুমাদাল আউয়াল বৃহস্পতিবার বাদজোহর আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন।

তার ইন্তেকালের সংবাদ বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে। হাজারো মানুষ আসে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে। তার জানাযা পড়ান শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.। তার বড় ছেলে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আসাদ মাদানী তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। তিনিও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসাবে দেশ ও জাতির খেদমত করেন।[১]

সমকালীন আলেমদের দৃষ্টিতে

মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী বলেন, 'আরে ভাই, শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী সম্পর্কে কী জিজ্ঞাসা করো। তাকে তো প্রথমে সাধারণ মনে করতাম। কিন্তু গোলযোগপূর্ণ সময়ে তার দিকে যখন ভালো করে দৃষ্টি দিলাম, দেখি, তার পা যেখানে আমার মাথা সেখানে। সত্যি বলতে কি, হযরত মাদানী দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় পদে অধিষ্ঠিত। তিনি আরো বলেন, কেউ হযরত মাদানী সম্পর্কে মন্দ ধারণা করলে তার উচিত ক্ষমা প্রার্থনা করা। অন্যথায় অন্তিম মুহূর্তে ঈমান নিয়ে মরতে পারে কিনা সন্দেহ আছে।'

ইলমী ও রুহানী কামালাতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সেটা অনুমিত হয় শায়খুল হিন্দের একটি কথায়, 'যে খেদমত করবে সে মাখদুম হয়ে যাবে।' মাওলানা সাইয়েদ আসগর হোসাইন দেওবন্দী বলেন, মাওলানা হোসাইন আহমদ ছিলেন এ কথার জীবন্ত নমুনা। নিবাসে প্রবাসে সর্বদা তিনি শায়খুল হিন্দের খেদমত করতেন। তাকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করতেন। একদিন অভ্যাসমত তিনি শায়খুল হিন্দের পা দাবাচ্ছেন। আমারও আকাঙ্ক্ষা হলো শরিক হই। সেমতে অন্য পা দাবানো শুরু করলাম।

১. বিস্তারিত দেখুন, নকশে হায়াত।

আমি কৌতুকের ছলে মাওলানা মাদানীকে বললাম, মৌলবী সাহেব! আজ তো আমিও আপনার সমান হয়ে গেলাম। তখন শায়খুল হিন্দ বলেন, ভাই! তুমি আর কোন ক্ষেত্রে তার সমান হতে পারবে?[১]

মাওলানা আসগর হোসাইন আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে মাওলানা মাদানীর জীবন শায়খুল হিন্দের জীবনের সঙ্গে ঠিক তেমনি জড়িত, রসূলুল্লাহর জীবনের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের জীবন যেমনি জড়িত। আর বলা বাহুল্য, শায়খুল হিন্দের শাগরেদদের মাঝে হযরত মাদানী যেসব বিশেষত্ব ও কামালিয়াত লাভ করেছেন, অন্য কারো দ্বারা সেটা সম্ভব হয়নি। মাওলানা আসগর হোসাইন দেওবন্দীর মত বুযুর্গও বলতে বাধ্য হয়েছেন, শায়খুল হিন্দের সকল ছাত্রের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য কেবল হযরত মাদানী লাভ করেছেন।

মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী বলেন, হযরত মাদানী এ যুগের আউলিয়ায়ে কেরামের ইমাম।

তাকওয়া ও তাহারাত

জনগণের মাল খরচের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। জনগণের এক পয়সাও অযথা খরচ করতেন না। একবার কলকাতা থাকতে একটা লম্বা সফরের দাওয়াত এলো। অন্যদের মত তাকেও খাদেমসহ সেকেন্ড ক্লাশের টিকেট দেয়া হলো। সঙ্গে পাঠানো হলো অতিরিক্ত কিছু রাহাখরচ। সফর ছিল ২৬ ঘণ্টার। অথচ তিনি একাই থার্ড ক্লাশে চড়ে রওয়ানা হন। রাস্তায় নাস্তা বাবত খরচ করেন সাত আনা। সম্মেলনে পৌঁছে ব্যবস্থাপকের সঙ্গে সাক্ষৎ করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেন। ফেরার সময় ব্যবস্থাপকগণ একশ রুপিয়া হাদিয়া দিতে চাইল। তিনি অস্বীকার করে বলেন, আসতে যত খরচ হয়েছে তত নিতে পারি, অতিরিক্ত কিছুতেই নয়। তারা পীড়াপীড়ি করে বলল, কমিটি এটা খুশিতে মঞ্জুর করেছে। তিনি জবাবে বলেন, এটা তো জনগণের টাকা, আপনাদের অধিকার নেই জনগণের টাকা অযথা খরচ করার। তারা এতটুকু অধিকার দিয়েছে যে, আপনারা মিতব্যয়িতার সঙ্গে খরচ করবেন। অযথা খরচের অধিকার দেয়নি।[২]

১. হায়াতে শায়খুল ইসলাম ১৯৮।
২. বিস বড়ে মুসলামন ৪৯৭।

www.maktabatulabrar.com

হযরত মাদানীর মামুলাত

হযরত মাদানীর জীবন ছিল খুবই কর্মবহুল। রাতদিন মোতালায়া, দরস-তাদরীস ও এসলাহী কাজে মশগুল থাকতেন। মাঝেমধ্যে সফরে চলে যেতেন। এমনিতে প্রতিদিন রাত তিনটার সময় উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। পরে ফজর পর্যন্ত মশগুল থাকতেন জিকির-অজিফায়। বাদ ফজর এক ঘণ্টা তেলাওয়াত ও মোতালায়া করতেন। পরে মেহমানদের সঙ্গে চা-নাস্তা করতেন। বারোটা পর্যন্ত পালন করতেন দরস-তাদরীস ও মাদরাসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। এরপর মেহমানদের সঙ্গে খাবার খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম করতেন। পরে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতেন; কাউকে সুলুকের তালীম দিতেন, কাউকে দিতেন তাবিজ, কারো প্রশ্নের জবাব দিতেন। আসর পর্যন্ত চলত এসব কাজ, সঙ্গে চা-পান। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হাদিসের দরস। বাদ মাগরিব প্রায় একঘণ্টা নফল পড়তেন। তাতে অন্তত সোয়া পারা তেলাওয়াত করতেন। নফলের পর মেহমানদের সঙ্গে খাবার খেতেন। এশার পর প্রায় তিন ঘণ্টা বুখারী শরিফের দরস দিতেন। তারপর মেহমানদের খোঁজখবর নিতেন। কেউ অসুস্থ হলে বা ক্লান্ত থাকলে শরীর দাবিয়ে দিতেন। পরে নিজে ঘুমাতে যেতেন।

মোটকথা রাত তিনটা থেকে পরবর্তী রাত বারোটা পর্যন্ত তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দুপুরে শুধু আধ ঘণ্টা বা পৌনে ঘণ্টা বিশ্রাম নিতেন। সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। সামনে থাকত চিঠিপত্রের ঢের, মেহমানের ভিড় লেগেই থাকত। প্রত্যেকের সমস্যা জেনে সে অনুপাতে সমাধান দিতেন। এত চিঠি আসত যে, কখনো হাজারখানিক হয়ে যেত। কারণ তিনি যেমন ছিলেন শায়েখে তরিকত, তেমনি বিদগ্ধ আলেম, আবার রাজনৈতিক নেতা। ফলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে চিঠি লিখত।[১]

সুন্নাতের প্রতি আকর্ষণ

সুন্নাতের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। সব কাজে সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ কোনো কাজের সুন্নাত তরিকা জানতে চাইলে বা কোনো সময়ের আমল জানতে চাইলে তাকে দেখে শিখে নিতো। অলিমার ক্ষেত্রে তার নীতি ছিল, শুধু একটি বকরির মাধ্যমে অলিমা করতে হবে।

১. বিস বড়ে মুসলামন ৪৯২।

গোশতের ঝোল করুন বা পোলাও করুন একটি বকরির বেশি নয়। মাকরুহ কাজ দেখলে ধমক দিতেন, মুবাহ কাজ দেখলে উপেক্ষা করতেন। আর সুন্নাত কাজ দেখলে চেহারায় দেখা যেতো খুশির আভা। অনুষ্ঠান সুন্নাত মোতাবেক হলে দূরের দাওয়াতেও অংশগ্রহণ করতেন। ডান হাতে খেতেন, ছোট ছোট লোকমায় খেতেন। এমনভাবে খেতেন যেন কারো কষ্ট না হয়। নিজের সামনে থেকে খেতেন। খাওয়ার সময় আওয়াজ হতো না। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতেন। শুরু ও শেষে দোয়া পড়তেন, হাত ধুতেন, কুলি করতেন। এসব ছিল তার সারা জীবনের অভ্যাস।

খেতে খেতে তসবীহ পড়তেন। প্রতি লোকমায় বিসমিল্লাহ বলতেন। সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদু লিল্লাহ ছিল তার সব সময়ের অভ্যাস। জিকির ছাড়া কোনো লোকমা গলায় নামত না। নিজের প্লেটে সর্বদা কাউকে শরিক করতেন। এই অভ্যাস জেলেও ছিল। সাথী-সঙ্গী কাউকে না পেলে বি ক্লাশের কাউকে শরিক করতেন। অথচ তারা ছিল নৈতিক অপরাধে অপরাধী। মোটকথা, জীবনের সব অঙ্গনে ছিলেন ইত্তিবায়ে সুন্নাত, ইশকে নববী ও জিকরুল্লাহর জীবন্ত নমুনা।[১]

কয়েকজন মনীষীর স্মৃতিচারণ

মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী হযরত মাদানীর স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমার দৃষ্টিতে হযরত মাদানীর প্রধান গুণ হলো, তার বিনয়-নম্রতা, স্বভাবের অকৃত্রিমতা ও মানবসেবার অন্তহীন প্রেরণা। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, তিনি একজন ভালো বন্ধু ও উত্তম সফরসঙ্গী। মেহমানের জন্য নিজের মামুলাত ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত নন। ঋণ করে হলেও তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন। অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষায় রাতদিন একাকার করে ফেলেন। কারো চাকরি প্রয়োজন, কেউ মুকদ্দমায় দাঁড়াবে বা ইন্টারভিউ দেবে অবলীলায় সুপারিশ করে দেন। নিজেও দৌড়ঝাঁপ করেন। এতে নিজের মান-সম্মান, শরীর-স্বাস্থ্য বা টাকা-পয়সার পরোয়া করেন না। যেভাবে হোক তার কাজ উদ্ধার করে দেন। বড়দের সঙ্গে যেমন আচরণ করেন মুরিদদের সঙ্গেও তেমনি আচরণ করেন। খাদেমকে একদম মাখদুম বানিয়ে দেন। শুনতে পাই এটা নাকি ছিল শায়খুল হিন্দের নীতি। আশ্চর্য কি, তার খাস শাগরেদের মাঝেও এ গুণ প্রতিফলিত হবে![২]

১. বিস বড়ে মুসলমান ৪৯১।
২. বিস বড়ে মুসলমান ৪৮৮।

www.maktabatulabrar.com

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির দীনিয়াতের প্রধান মাওলানা সাঈদ আহমদ এম এ আকবরাবাদী লেখেন, আমি বিভিন্ন দেশের বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মিশেছি। অনেকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। আমার জানামতে সর্বগুণে গুণান্বিত কাউকে নিজের পীর ও মুরশিদ বানাতে হলে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীকে বানাতাম। অথচ আজো তার হাতে বয়াত হওয়ার বা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আমার সৌভাগ্য হয়নি। সুতরাং আমি যা বলছি অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং বাস্তবতা হলো, ইমামে আসর হযরত মাদানী তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেদের গুণ-গরিমায় অনন্য। যদিও যুগের দৃষ্টিতে তিনি অনগ্রসর, কিন্তু মর্যাদায় অগ্রসর।[১]

বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ তাইয়েব সাহেব বলেন, হযরত মাদানীর তাকওয়া-পরহেযগারী ছিল অকল্পনীয়। শেষ জীবনে অসুস্থতার দরুণ প্রায় চার মাস পড়াতে পারেননি। মাদরাসার নিয়ম অনুযায়ী তখনকার বেতন প্রায় একহাজার রুপিয়া তিনি পাবেন। তারও অর্থের প্রয়োজন ছিল। কারণ, চিকিৎসা বাবত বহু অর্থ খরচ হয়েছে। তাছাড়া মেহমানের ভিড় তো লেগেই থাকে। তাদের ব্যয় নিজেই বহন করতেন। এতে কোনো প্রকার অবহেলা হলে রাগ করতেন। অথচ তার আয়ের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। তাই প্রায়ই ঋণগ্রস্ত থাকতেন।

আর্থিক সমস্যা মানুষের কঠিন সমস্যা। তাতে মহাপুরুষদেরও পদস্খলন হয়। কিন্তু ধন্য মাওলানা মাদানী! এমন সংকটময় মুহূর্তেও প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করতে রাজি নন। অথচ তাতে কোনো বাধা ছিল না, মাসআলাগতও সমস্যা ছিল না। হযরত বলেন, অসুস্থতার দরুণ আমি যেহেতু মাদরাসার কাজ করতে পারিনি, তাই বেতনের টাকা গ্রহণ করব না।

মুহতামিম সাহেব আরও বলেন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনো নিজের আরাম-আয়েশের কথা চিন্তা করতেন না। বহু ঝড়ঝাপটার মধ্যেও মামুলাতে কোনো ব্যত্যয় দেখা যেতো না।

১৩৪৬ হিজরির কথা। দারুল উলুমের আর্থিক উন্নতির জন্য আমরা খোরজায় গেলাম। সেখানে আমি হযরতের সঙ্গে এক সপ্তাহ ছিলাম। প্রতি রাতে একটা দেড়টা পর্যন্ত বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করতেন। দিনেও ব্যস্ত

১. বিস বড়ে মুসলমান ৪৮৯।

থাকতেন মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। দিনে বিশ্রামের সুযোগ ছিল না, আবার রাতেও দেড়টা দুটোর আগে শোয়া হতো না। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাত তিনটার সময় ঘুম ভাঙলে দেখতাম, তিনি তাহাজ্জুদে বা জিকির-মু-রাকাবায় মগ্ন আছেন!

একবার দেওবন্দে এক দাওয়াতে এশার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে বলেন, এখনই আমাকে হাদিসের সবকে যেতে হবে। দাওয়াতকারী চা-পানের জন্য জোর অনুরোধ করেন। হযরত জিজ্ঞাসা করেন, কতক্ষণ লাগবে? বলেন, পনেরো মিনিট। হযরত বলেন, বেশ, এর মধ্যে আজকের ঘুম পূরণ করে নিই। এ কথা বলে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ঠিক পনেরো মিনিট পর উঠে যান, ডাকতে হয়নি। জাগ্রত অবস্থায় ঘড়ি দেখেও অনেকে এত সূক্ষ্মভাবে সময়ের পাবন্দি করতে পারে না। এটা শুধু একবারের ঘটনা নয়, বরং বাড়িতে, গাড়িতে, সফরে সর্বত্র ঘুম ছিল তার আয়ত্তাধীন। কারণ, তার আত্মা সবসময় জাগ্রত থাকত। যদিও দেখা যেতো তিনি ঘুমিয়ে আছেন। হাদিসে আছে, হুজুর সা. বলেছেন, 'আমার চোখ ঘুমায় বটে, কিন্তু আমার কলব ঘুমায় না।' তিনিও সেই মাকামে পৌঁছে গেছেন। জিকির ও মুজাহাদা দ্বারা নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে।[১]

উস্তাদের খেদমত

উস্তাদের খেদমতে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। উস্তাদের খেদমতের এমন দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন ইতিহাসে যা বিরল। শুধু উস্তাদের খেদমতের জন্য স্বেচ্ছা-কারাবরণ ভোগ করেছেন। মাল্টার দ্বীপে শায়খুল হিন্দের সঙ্গে ছিলেন সুদীর্ঘ তিন বছর। তখন প্রাণভরে উস্তাদের খেদমত করেছেন। নিবাসে প্রবাসে তিনি উস্তাদের সঙ্গে থাকতেন। তার সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখতেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা জামিল সাহেব নিজের দেখা ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, একবার হযরত শায়খুল হিন্দের বাড়িতে বেশি মেহমান আসে। বাথরুম ছিল মাত্র একটা। সারা দিনে তা ভরে যেতো। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, প্রতিদিন সকালে বাথরুম যথারীতি পরিষ্কার! আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হলো। ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে দেখি কে পরিষ্কার করে?

১. হযরত মাদানী জীবন ও কর্ম।

www.maktabatulabrar.com

একদিন এ উদ্দেশ্যে সারারাত জেগে থাকলাম। রাত দুটো বাজে দেখি, শায়খুল ইসলাম টুকরি নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করছেন। টুকরি ভর্তি ময়লা নিয়ে জঙ্গলে ছুটছেন। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাকে আগলে দাঁড়ালাম। তিনি সাবধান করে বললেন, খবরদার! কাউকে বলবে না।[১]

চল্লিশ হাজার রুপিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

জীবনে তিনি তেমন সচ্ছল ছিলেন না, অথচ খরচ ছিল প্রচুর। বিরাট পরিবারের ভরণপোষণ, সঙ্গে মেহমানের ঢল লেগেই থাকত। হযরত মাদানী বলেন, আমি যখন করাচি জেল থেকে মুক্ত হয়ে এলাম, বাংলা কাউন্সিলের এক সদস্য প্রস্তাব করেন, চল্লিশ হাজার রুপিয়া নগদ পাবেন, সঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাঁচশ রুপিয়ার প্রফেসরি। জানতে চাইলাম, কী করতে হবে? জবাবে বললেন, তেমন কিছু নয়, শুধু রাজনীতির ব্যাপারে চুপ থাকবেন। আমি বললাম, হযরত শায়খুল হিন্দ আমাকে যে কাজে লাগিয়েছেন সেটা থেকে কীভাবে বিরত থাকব? মাওলানা মাকসুদ আলী খান সাম্ভলী বলেন, অথচ তখন তার কোথাও চাকরি ছিল না। কিছুদিন পরে অবশ্য সিলেটে দেড়শ রুপিয়া বেতনে খেদমত হয়েছে।[২]

আরেকবার মিসর সরকারের পক্ষ থেকে জামে আজহারে শায়খুল হাদিস হিসাবে যোগদানের প্রস্তাব করা হয়। দেড় হাজার রুপিয়া বেতন, সরকারী গাড়ি বাড়ি, বছরে একবার হিন্দুস্তানে আসা-যাওয়ার ভাড়াসহ থাকবে আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা। তিনি তখন দারুল উলুম দেওবন্দে দেড়শ রুপিয়া বেতনে খেদমত করেন। তবুও সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের লেটারফর্ম

জনগণের সম্পদ ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। পারতপক্ষে জনগণের জিনিস ব্যবহার করতেন না। লেটারফর্ম একটা সাধারণ জিনিস। বহুবার আবেদন করা হয়েছে, হযরত! জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের লেটারফর্ম ব্যবহার করুন। জমিয়তের সভাপতি হিসাবে এ অধিকার আপনার আছে। এটা অশোভন কিছু নয়। কিন্তু জমিয়তের প্রয়োজনেও তিনি লেটারফর্ম ব্যবহার করতেন না। নিজের খরচে উন্নতমানের কাগজ

১. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৬৩।
২. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামাত ৬৩।

দিয়ে লেটার প্যাড বানিয়ে নিয়েছেন। প্রয়োজনে তাতে চিঠিপত্র লিখতেন। আর ব্যক্তিগত কাজে জমিয়তের কাগজপত্র করা কল্পনাও করা যায় না।[১]

সব কাজে সুন্নাতের অনুসরণ

ইত্তিবায়ে সুন্নাত ছিল তার সারা জীবনের অভ্যাস। সব কাজ সুন্নাত মোতাবেক করতেন। এমনকি মানুষ প্রত্যেক কাজের সুন্নাত তাকে দেখে শিখে নিত। যদি কখনো জুমার দিন ফজর নামাজ পড়ানোর সুযোগ পেতেন সুরায়ে আলিফ লাম মীম সাজদা ও সুরা দাহর তেলাওয়াত করতেন। একবার বলেন, পুরো হিন্দুস্তানের ইমামগণ এই সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছে। এজন্য আমি সুযোগ পেলেই সুরাদুটি পড়ি, যেন ইমামদের বোধোদয় হয়।

রমজান মাসে বিতর নামাযে অধিকংশ সময় সুরা আ'লা, সুরা কাফিরুন ও সুরা ইখলাস তেলাওয়াত করতেন। জুমার নামাযে তেলাওয়াত করতেন সুরা আ'লা ও সুরা গাশিয়া।[২]

দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য হাকিম মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব বলেন, একবার আমি তাকে অনুযোগ করে বললাম, হযরত! আপনি তো অসুস্থ, আর অসুস্থ অবস্থায় বেশি নড়াচড়া ক্ষতিকর। সুতরাং আপনি বাইরে যাবেন না, ঘরেই নামাজ পড়ুন! আর গেলেও নামাজ সংক্ষিপ্ত পড়বেন। আপনি তো সুস্থ মানুষের মত সবকিছু করে যাচ্ছেন? অসুস্থ অবস্থায় সুন্নাত মুস্তাহাব ছুটে গেলে ক্ষতি কি? জবাবে তিনি বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু কী করি, খেলাফে সুন্নাত নামাযে আমার তৃপ্তি আসে না! শুনে হাকিম সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।[৩]

দারুল উলুম দেওবন্দের বাগানে এবং নিজের বাড়িতে তিনি বাবুল বৃক্ষ রোপন করেছেন। যেই শুনত অবাক হতো! তারা ভাবত, এ গাছের কী ফায়দা! এতে না ফুল হয়, না ফল হয়। ঘ্রাণও নেই, আবার বাগানের সৌন্দর্যও বর্ধন করে না। তাহলে কেন এই বৃক্ষ রোপন? বহু অনুসন্ধানের পর জানা গেল, রসূল সা. বাবুল বৃক্ষের নিচে বসে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বয়াত নিয়েছেন। যেটা বয়াতে রিদওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। বৃক্ষটি সেই ঘটনার স্মারক।[৪]

১. মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া দেওবন্দীর সূত্রে প্রাগুক্ত ৭০।
২. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৬৬।
৩. রশিদুদ্দীন হুমাইদীর সূত্রে প্রাগুক্ত ৭২।
৪. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৩৩।

www.maktabatulabrar.com

একবার তার দস্তরখানে দুই পাত্রে তরকারি দেয়া হয়। সাধারণত এক ধরনের তরকারি একটা বড় পাত্রে দেয়া হতো। সবাই পাত্রের চারপাশে বসে খেতো। সেবার কেউ অসুস্থ ছিল বলে তার জন্য আলাদা তরকারি পাকানো হয়। এটা দেখে হাফেজ মুহাম্মাদ হোসাইন বলে ওঠেন, হযরত! আজ দুই রকমের তরকারি এসেছে, রাসূল সা. কখনো দুই প্রকার তরকারি খেয়েছেন? তিনি আবু দাউদের রেওয়ায়েতের কথা বলতে পারতেন, যেখানে দুই ধরনের তরকারি খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু বলেননি, বরং বিনয় দেখিয়ে বলেন, আমি তো সুন্নাতের অনুসরণ করতে পারি না; আমি পেটপূজারী।[১]

হযরত মাদানীর মহানুভবতা

একবার দেওবন্দে হযরত মাদানীর কাছে এক লোক এলো। তার কাপড়ে ছিল অজস্র উকুন। গায়ে ছিল উৎকট গন্ধ। মেহমানখানায় কেউ তাকে বসতে দেয়নি। কিন্তু তিনি তাকে নিজের দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়ান। ফলে তার গায়ের উকুন হযরতের গায়ে উঠে যায়। পরে তিনি অন্দর মহলে গিয়ে উকুন পরিষ্কার করে আসেন। কিন্তু মেহমানের মনে আঘাত দেননি।[২]

করাচি জেলের ঘটনা। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহারের বহুমূত্র রোগ ছিল। যে কারণে পেশাবের পাত্র রুমেই রাখতেন। হযরত মাদানী প্রতিদিন সেই পাত্র পরিষ্কার করে জায়গামত রেখে দিতেন। একদিন তার ঘুম ভেঙে গেলে দেখেন, হযরত মাদানী পাত্র পরিষ্কার করছেন। দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। আসলে হযরত মাদানী তো ছিলেন জগতের মাখদুম, অথচ জীবনভর মানুষের খেদমত করে গেছেন।[৩]

একবার কেউ চিরকুট পাঠাল, আপনি নাকি হারামজাদা? শুনে পুরো মজলিস গরম হয়ে গেল। প্রতিটি ছাত্র রাগে নিশপিশ করছে। তিনি বলেন, খবরদার! রাগ করার প্রয়োজন নেই। আমার দায়িত্ব হলো, তাকে জবাব দিয়ে প্রশান্ত করা। পরে বলেন, আমি ফয়জাবাদ জেলার টাণ্ডা থানাধীন এলাহদাদপুর এলাকার বাসিন্দা। আমার পিতার বিয়ের সাক্ষীরা আজো বেঁচে আছেন। আপনি চিঠি পাঠিয়ে বা সরেজমিনে গিয়ে যাচাই করে নিতে পারেন।[৪]

১. মালফুজাতে ফকিহুল উম্মত কিসতি ২/৯।
২. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৬৫।
৩. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৬৮।
৪. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৭৮।

একদিন এক কয়েদি এসে হযরত মাদানীর কাছে অভিযোগ করল, নামাজের সময় অমুক কয়েদি আমার নিকট ছিল। সে আমার আটানি চুরি করে নিয়ে গেছে। তখন জেলে আটানি ছিল এক রুপিয়ার সমান। হযরত বলেন, ভাই, আমি কী করব! আমি তো তোমার মতই কয়েদি। কিন্তু তাকে খুব বিমর্ষ দেখালে তিনি নিজের আটানি দিয়ে দেন। এ ঘটনা দেখে এক অমুসলিম হযরতকে বলল, হযরত! আমি আর আপনার সঙ্গে এক ব্যারাকে থাকব না। কেননা আপনার চরিত্র মাধুর্য দেখে হয়ত আমি মুসলমান হয়ে যাব। তখন হযরত বলেন, আরে তুমি তো বহু দিন ধরেই মুসলমান। তুমি আর কী মুসলমান হবে![১]

একবার কিছু লোক হযরত থানবীর মুজাদ্দিদ হওয়া নিয়ে বির্তক করছিল। কেউ সমর্থন করছিল তো কেউ অসমর্থন করছিল। তিনি রাত বারোটার দিকে বুখারীর সবক থেকে ফিরেন। আমি বির্তকের কথা তার কর্ণগোচর করে জিজ্ঞাসা করলাম, আসলেই কি হযরত থানবী এ যুগের মুজাদ্দিদ? তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, নিশ্চয়ই মুজাদ্দিদ। তিনি দীনের এমন খেদমত করেছেন যেই খেদমতের খুবই প্রয়োজন ছিল।[২]

হযরত মাদানীর বিনয়

একবার মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী ও মাওলানা আব্দুল বারী নদবী হযরত মাদানীর হাতে বয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য দেওবন্দে আসেন। তিনি তাদের স্বাগত জানাতে নিজে স্টেশনে উপস্থিত হন। কুলির পয়সা ও টাঙ্গার ভাড়া নিজেই আদায় করেন। পরে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে আসেন। নিজে দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খাওয়ান, হাত ধোয়ান, পরে জিজ্ঞাসা করেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তারা আরজ করল, হযরত! বয়াতের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করে বলেন, আপনারা হযরত থানবীর হাতে বয়াত হোন। তারা আরজ করল, আমরা এসেছি আপনার কাছে, আর আপনি হযরত থানবীর কাছে যাওয়ার কথা বলছেন, তাহলে একটা চিঠি লিখে দিন! জবাবে তিনি বলেন, চিঠি নয়, আমি নিজেই আপনাদের নিয়ে যাব।

সবাই হযরত থানবীর দরবারে গেলেন। হযরত থানবী জিজ্ঞাসা করেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? হযরত মাদানী বলেন, ওদের নিয়ে এসেছি, বয়াত করে নিন। হযরত থানবী বলেন, ওরা এসেছে আপনার কাছে, সুতরাং

১. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৪১।
২. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৫৮।

www.maktabatulabrar.com

আপনি ওদের বয়াত করুন। তিনি নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করলে হযরত থানবী বলেন, দেখুন, আপনিও জুনাইদ শিবলী নন, আমিও নই। তাদের এসলাহের জন্য আপনি যেমন যথেষ্ট, আমিও যথেষ্ট। সুতরাং আপনি বয়াত করে নিন, আমি এসলাহের দায়িত্ব নিলাম। তিনি তখন তাদের বয়াত করে নেন আর এসলাহের দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত থানবীর হাতে।[১]

হযরত মাদানীর উদারতা

মাওলানা আব্দুল হালিম লৌক্ষ্ণবী বলেন, আমার দাওরায়ে হাদিসের বছরের ঘটনা। একদিন শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানীর সবক চলছে। দুপুর বারোটা বেজে গেছে অথচ তখনো তিনি সবক পড়াচ্ছেন। ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে শুনছে আর তিনিও নিবিষ্টচিত্তে পড়াচ্ছেন। ঘড়ির কাঁটা যতই আগে বাড়ছে আমাদের এক সাথী ততই অস্থির হয়ে উঠছে। আমরা অবশ্য কেউ সেটা লক্ষ্য করিনি। এক হাদিস শেষ হলে তিনি সামনে পড়তে বলেন। হঠাৎ সেই সাথী অত্যন্ত বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল, সবক বন্ধ করুন!

সবাই তার দিকে ক্রোধভরে তাকাল। হযরতের সঙ্গে বেয়াদবির কারণে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলো, কিন্তু হযরতের চেহারা তখনো প্রশান্ত। তাতে নেই রাগগোস্বা বা অসন্তুষ্টির ছাপ। বরং মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, সবক বন্ধ করব কেন? আসলে সে অবুঝ ছিল না, শায়েখের সম্মানের ব্যাপারেও ছিল না অজ্ঞ। সে জবাব দিল, হযরত! আমি ক্ষুর্ধাত। তিনি মৃদু হেসে বলেন, আমি বুড়ো মানুষ ক্ষুধা নিয়ে পড়াচ্ছি, আর তুমি যুবক হয়ে বসে থাকতে পারছ না?

তার আচরণে সবাই যুগপৎ লজ্জিত ও ক্রদ্ধ হলো, কিন্তু হযরতের সহানুভূতির কারণে কিছু বলতে পারছে না। এদিকে সেও নিজের অবস্থা ব্যক্ত করার এবং হযরতের সহানুভূতি লাভের সুযোগ পেল। অনুযোগের স্বরে সে বলল, আপনি তো সকালে নাস্তা খেয়েছেন, আমি খাইনি। তার কথা শুনে হযরতের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিতায বন্ধ করে সবক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পরে তাকে নিয়ে বাসায় যান, নিজ হাতে খানা খাওয়ান। এরপর জোর দিয়ে বলেন, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে খাবে।[২]

১. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ২৯২।
২. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ২৯০।

একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা

দিল্লির মাদরাসায়ে আলিয়ার প্রধান শিক্ষক মাওলানা সাজ্জাদ হোসাইন সাহেব একটি ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, একবার আমি হজ থেকে ফারেগ হয়ে মদিনায় রওজায়ে আতহারে উপস্থিত হই। মদিনার বুযুর্গদের কাছে শুনি এ বছর রওজা আতহারে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। এক হিন্দি যুবক দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে সালাত ও সালাম পেশ করলে সেখান থেকে জবাব আসে। ঘটনা শুনে মনে ভীষণ তোলপাড় অনুভব করলাম। খুশির বিষয় হলো, যুবকটি ছিল হিন্দুস্তানের। কোন সেই ভাগ্যবান যুবক? আমি তাকে খুঁজতে শুরু করলাম, যাতে প্রিয় নবীর প্রিয় পাত্রের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হতে পারি। তার কাছ থেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পারি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, সেই ভাগ্যবান যুবক হলো মৌলভী সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ মুহাজিরে মাদানীর সন্তান। সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গে আমার কিছুটা পূর্বপরিচয় ছিল। বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। পরে তার ভাগ্যবান ছেলেকে নিয়ে ঘরের কোণে চলে গেলাম। ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে সে নীরবতা অবলম্বন করল। বহু পীড়াপীড়ির পর বলল, আপনি যা শুনেছেন ঠিকই শুনেছেন।

এই ঘটনা শুনিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, জানেন সেই হিন্দি যুবকটি কে? ইনি হলেন মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী।[১]

ফুলের ডালা

কারী নাজিব আলী করিমগঞ্জী ছিলেন একজন সত্যিকার আশেকে রসূল। মাঝেমধ্যে তিনি মাজযুব হয়ে যেতেন। তখন ইয়া রসূলাল্লাহ! ইয়া রসূলাল্লাহ! বলে জঙ্গলের দিকে চলে যেতেন। হযরত মাদানী তাকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তিনি ছিলেন হযরতের প্রাণোৎসর্গী মুরিদ। সিলেটের নতুন সড়ক মসজিদে হযরত তারাবীহ পড়াতেন। তারাবীর পর এক ঘণ্টা বয়ান করতেন। বয়ানের পর হতো বিশেষ মজলিস।

একবার তিনি কারী নাজিব সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, কী খবর কারী সাহেব! আজ কী দেখলেন? কারী সাহেব বলেন, আজ বয়ানের সময় আপনার পিছনে রসূল সা.কে দেখেছি। ফুলভরা ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে আমি অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলাম![২]

১. মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ওয়াকিয়াত ও কারামত ১৩২।
২. মাওলানা আহমদ আলী বাঁশকান্দির সূত্রে প্রাগুক্ত ২৬৭।

www.maktabatulabrar.com

তাহাজ্জুদের পাবন্দি

শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর ঘুমের ওপর ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যখন চাইতেন কয়েক মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার ঠিক সময় উঠে যেতেন। প্রায়ই সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সফর করতেন। রাত দুটো তিনটা পর্যন্ত থাকতে হতো সজাগ। তবুও কখনো তাহাজ্জুদ কাজা হতো না। সম্মেলন থেকে এসে শুয়ে পড়তেন। আধা ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা পর উঠে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে সকাল পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ট্রেনেও তার মামুলাতে পরিবর্তন হতো না।

মাওলানা ইদরিস নদবী বলেন, একবার আজমগড় থেকে হযরত ফিরছেন। আমিও ছিলাম সঙ্গে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তিনি অতি সন্তর্পণে ওঠেন। অজু করে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যান। আমি সব দেখলাম, তাই শুয়ে থাকতে পারলাম না। আমিও উঠে অজু করে দাঁড়িয়ে গেলাম তাহাজ্জুদে। পুরো রাত তিনি এভাবে কাটিয়ে দেন।[১]

হযরত থানবীর প্রতি মহব্বত

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলেন, হযরত মাদানীর সঙ্গে হযরত থানবীর রাজনৈতিক বিরোধ ছিল, কিন্তু তার অন্তরে হযরত থানবীর মহব্বত ছিল প্রবল। আমার মনে আছে, একবার তুমুল রাজনৈতিক বিরোধের সময় তিনি দেওবন্দের আসাতেযায়ে কেরামকে বলেন, দীর্ঘদিন হলো থানাভবনে যাওয়া হয় না; হযরত থানবীর সঙ্গে সাক্ষাতের খুব ইচ্ছে করছে, চলুন, হযরত থানবীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

সেমতে কয়েকজন উস্তাদকে নিয়ে তিনি থানাভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঘটনাক্রমে গাড়ি রাতে থানাভবনে পৌঁছে। তারা গিয়ে দেখেন খানকার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তারা জানতেন, খানকার নেজাম খুবই কড়া। সুতরাং নেজামের বিপরীত কিছু করা তারা শোভন মনে করলেন না। আবার বাসায় গিয়ে হযরতকে কষ্ট দেয়াও অশোভন মনে করলেন। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে খানকার বারান্দায় শুয়ে পড়লেন।

হযরত থানবী ফজরের সময় খানকায় গিয়ে দেখেন কিছু লোক বারান্দায় শুয়ে আছে। অন্ধকারে চেনা গেল না। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে সেও অজ্ঞতা প্রকাশ করল। কাছে গিয়ে দেখেন, হযরত মাদানী ও

১. মাওলানা যফিরুদ্দীন মিফতাহীর সূত্রে ওয়াকিয়াত ও কারামত ৩২২।

শায়খুল আদব এজাজ আলী সাহেবের মত মহান ব্যক্তিগণ! তাদের দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন, কিন্তু আফসোস করে বললেন, আমার এখানে এসে আপনারা এই অবস্থায় রাত কাটালেন! ভিতরে গেলেন না কেন, আবার আমাকেও খবর দিলেন না?

হযরত মাদানী বলেন, আমাদের জানা আছে, আপনার এখানে সবকিছুর নেজাম সুনির্ধারিত। খানকা নির্দিষ্ট সময় বন্ধ হয়ে যায়, আর খোলা হয় না। হযরত থানবী বলেন, খানকার নেজাম তা-ই, তবে গরীবের বাড়ি তো ছিল। তাছাড়া আপনাদের মত মহান ব্যক্তিদের জন্য নেজামের পাবন্দি জরুরি নয়। হযরত মাদানী বলেন, রাতে বাড়ি গিয়ে আপনাকে কষ্ট দেয়া শোভন মনে হয়নি। মোটকথা তারা থানাভবনে একদিন থেকে ফিরে আসেন। দেখুন, চরম বিরোধের সময়ও তারা কত বিনয়ী ও অকৃত্রিম। পরস্পরের প্রতি কত মহব্বত ভালোবাসা।[১]

(৪০) হাকিমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তার প্রসিদ্ধ নাম আশরাফ আলী। তিনি ১২৮০ হিজরির ৫ই রবিউস সানী বুধবার সুবহে সাদেকের সময় থানাভবনে জন্মগ্রহণ করেন। এটি যুক্ত প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলায় অন্তর্গত। এর চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত দেওবন্দ, গাঙ্গুহ, কান্ধলা, কীরানা, ঝাঞ্ঝানা, পানিপথ, নানুতা প্রভৃতি অঞ্চল। যেখানে বহু ঐতিহাসিক বিদ্যান ও শরীফ খান্দান বসবাস করেন। তার জন্মের পূর্বে, বরং মাতৃগর্ভে আগমনের পূর্বেই এ নাম রাখা হয়। বিশিষ্ট বুযুর্গ হাফেজ গোলাম মুর্তাযা পানিপথী এ নাম নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অলী ও সর্বজনমান্য বুযুর্গ।

তার পিতা ছিলেন ফারুকী আর মাতা ছিলেন হযরত আলীর বংশের। ফারুকীদের মধ্যে আবার খাতীব গোত্র ছিল সকলের বরেণ্য। এ গোত্রেই তার জন্ম। খাতীব গোত্রের উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন মাওলানা দসরে জাহান। অত্যধিক পরহেযগারির কারণে তার উপাধী ছিল তাকওয়া শে'আর। সতরাং তাকওয়া-পরহেযগারি তার খান্দানী বৈশিষ্ট্য।

১. হযরতকে শুযুখ ও আকাবির।

www.maktabatulabrar.com

পিতৃকুল ও মাতৃকুল

তার পিতার নাম জনাব আব্দুল হক। তিনি ছিলেন থানাভবন এলাকার একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। মিরাঠের এক জমিদারের নায়েব ও কন্ট্রাকটর ছিলেন। ফার্সি ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত ও উঁচু মাপের লেখক। হযরত থানবী নিজেই বলেন, আল্লাহর ফযলে কোনো আমীর –তা সে যত বড়ই হোক– নিজের ঐশ্বর্য, নেতৃত্ব বা সামাজিক মর্যাদায় আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কেননা আমার মধ্যে এ আত্মতৃপ্তি রয়েছে যে, আমি কোনো দীন-দরিদ্রের সন্তান নই।' তার মাতৃকুল ছিল বিখ্যাত পীরজাদা খান্দান। বিখ্যাত বুযুর্গ শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক ঝাঞ্ঝানবী ছিলেন তাদের পূর্বপুরুষ।

হযরত থানবী জ্ঞানগুণ ও বুদ্ধিমত্তা হাসিল করেন পিতৃকুল থেকে আর ইশক ও খোদাপ্রেম হাসিল করেন মাতৃকুল থেকে।

তার নানা পীরজী নাজাবত আলী ছিলেন কুঞ্জপুর স্টেটের সরকারী কৌসুলি; ফারসী ভাষার বিশিষ্ট কবি ও সুপণ্ডিত। আবার শাহ নিয়ায আহমদ বেরেলভীর খলিফা ছিলেন। বিখ্যাত অলী হাফেজ গোলাম মুর্তাজা মাজযুব ছিলেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তার মামা পীরজী এমদাদ আলী ছিলেন সাহেবে হাল বুযুর্গ। তিনি মাজযুব সাহেবের পরামর্শে হায়াদারাবাদ গিয়ে চাকরি নেন। পরে তারই ইঙ্গিতে মির্জা সরদার বেগের সিলসিলায় দাখেল হন, যিনি নবাবী ছেড়ে দরবেশি গ্রহণ করেছেন।

তার উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন সুলতান শিহাবুদ্দীন ফররুখ শাহ কাবুলী। তারই অধস্তন ছিলেন থানাভবনের শুযুখ পরিবার। তাছাড়া হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, শায়েখ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী ও শায়েখ ফরিদুদ্দীন গাঞ্জেশোকারও ছিলেন তার পূর্বপুরুষ। ফররুখ শাহ প্রথমে কাবুলের গভর্নর ছিলেন। গজনী রাজত্ব খতম হয়ে গেলে জিহাদের আগ্রহে কয়েকবার হিন্দুস্তানে আক্রমণ করেন এবং বিজয়ী বেশে ফিরে যান। পরে জিহাদে আসগর থেকে ফারেগ হয়ে জিহাদে আকবরে মশগুল হয়ে যান। একসময় কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে চিশতিয়া সিলসিলায় তালিম নেন এবং উঁচু মর্তবা হাসিল করেন। আজো তার মাজার দাররায়ে ফররুখ শাহ নামে প্রসিদ্ধ। মোটকথা তার খান্দান মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ইলম-আমল, তাকওয়া-পরহেযগারি ও অর্থবিত্তে ছিল অনন্য।

এলহামী নাম

তার পিতা মুনশী আব্দুল হক বহুদিন ধরে কঠিন চর্মরোগে ভুগছিলেন। কোনো ওষুধে কাজ হচ্ছে না দেখে একবার ডাক্তার বলেন, 'এ রোগের একটি অব্যর্থ ওষুধ আছে, তবে তা মানুষকে নির্বংশ করে দেয়।' রোগযন্ত্রণা সইতে না পেরে তিনি সে ওষুধ খেয়ে ফেলেন। কারণ বংশরক্ষার চেয়ে জীবনরক্ষা বেশি জরুরী। শুনে তার মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ ইতিপূর্বে কয়েকটি পুত্রসন্তান হয়ে মারা যায়। একসময় নানী কথাটা শোনেন। তিনিও দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন। ঘটনাক্রমে সেখানে ছিলেন হাফেজ গোলাম মুর্তাযা মাজযুব রহ.। নানী সাহেবা অভিযোগের সুরে বলেন, হযরত! আমার মেয়ের ছেলে-সন্তান জীবিত থাকে না! হাফেজ সাহেব রসিকতা করে বলেন, উমর ও আলীর টানাটানিতে মরে যায়। এবার আলীকে সোপর্দ করো, আশা করি বেঁচে থাকবে।

মাজযুবের হেয়ালী কথা কেউ বুঝতে পারেনি, কিন্তু তার বিচক্ষণ মা বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন, 'পিতা ফারুকী বংশের আর মাতা আলী বংশের। এখন পর্যন্ত ছেলেদের নাম রাখা হয়েছে পিতার নামে। এবার রাখতে হবে মাতৃকুলের নামে।'

ব্যাখ্যা শুনে মাজযুব হেসে বলেন, আমার কথার মর্ম এটিই। এ মেয়ে বড় বুদ্ধিমতী। পরে বলেন, তার দুটি ছেলে হবে এবং উভয়ে জীবিত থাকবে। একজনের নাম রাখবে আশরাফ আলী খান আর দ্বিতীয় জনের নাম রাখবে আকবর আলী খান। জোশের চোটে তিনি খান শব্দটি জুড়ে দেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! তারা কি পাঠান হবে? তিনি বলেন, না, আশরাফ আলী ও আকবর আলী রাখবে। তিনি আরো বলেন, উভয়ে ভাগ্যবান হবে, তবে একজন হবে আমার। পরে তার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।[১]

এরূপে মাতৃগর্ভে আগমনের পূর্বেই আলমে আরওয়াহে থাকাকালে একজন উচ্চশ্রেণীর বুযুর্গ তার নাম রেখে দেন। এটি দেখে অন্য একজন স্ত্রীলোক মাজযুব সাহেবকে তার পুত্রের নাম রাখার আবেদন করেন। তিনি রুক্ষ ভাষায় জবাব দেন, আমি কি ভাট যে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকের নাম রাখব? এতে বুঝা যায়, একজন বুযুর্গ কর্তৃক জন্মের পূর্বে নাম রাখা এবং তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এলহাম ছিল।

১. আশরাফুস সাওয়ানেহ ৪৬।

www.maktabatulabrar.com

প্রতিপালন

শৈশবেই তিনি মাতৃহারা হন। পাঁচ বছর বয়সে স্নেহময়ী মায়ের শীতল ছায়া মাথার ওপর থেকে উঠে যায়। তিনি বলতেন, আমার মায়ের আকার-আকৃতি পুরোপুরি মনে নেই। শুধু এতটুকু মনে আছে, একটি খাটের পায়ের দিকে তিনি বসা ছিলেন। আমি ছিলাম তখন খুবই ছোট। চার পাঁচ বছর বয়সের কথা কতটুকু মনে থাকে। তিনি আরো বলতেন, মায়ের ইন্তেকালের পর আব্বাজান খুবই স্নেহ-মমতার সঙ্গে আমাদের দুই ভাইকে লালন-পালন করেন। মাখনে ভাজা রুটি টুকরো টুকরো করে ঘিয়ে ভিজিয়ে নিজ হাতে খাওয়াতেন। এভাবে তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন। যেন মাতৃ-বিয়োগের শোক অনুভূত না হয়। তিনি আমাদেরকে মায়ের চেয়ে বেশি মহব্বত করতেন।

তার চৌদ্দ মাস বয়সে ছোট ভাই আকবর আলী ভূমিষ্ঠ হয়। মায়ের দুধে দু'ভাইয়ের যথেষ্ট হতো না। ফলে তাকে মিরাঠের এক কসাই রমণীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি দীর্ঘদিন কসাই রমণীর দগ্ধ পান করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, কসাই মায়ের দুধ পান করে আমার মেজাযের মধ্যে উষ্ণতা এসেছে বটে, কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ কঠোরতা আসেনি। কেননা আমার অন্তর এত কোমল যে, কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, 'আব্বাজান যদিও রাগী ছিলেন, কিন্তু আমাদের ওপর রাগ কমই করতেন। আমাদেরকে সর্বদা আরাম-আয়েশে রাখতেন। বিশেষত আমার সঙ্গে খুবই নম্র ব্যবহার করতেন। একবার চাচিমা আব্বাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার, দুষ্টামি করলে ছোটটিকে মারেন, বড়টিকে মারতে দেখি না যে? আব্বাজান বলেন, ভাবী সাহেবা! ছোটটি মূলত বড়টিকে দুষ্টামি শেখায় আর বড়টি সবক মুখস্থ করে। তাই তাকে বেশি মহব্বত করি।

আব্বাজান আমাকে খুব কম মারতেন। উস্তাদের হাতেও আমি কচিৎ মার খেয়েছি। কারণ আমি সবক মুখস্থ করতাম আর আদবের সঙ্গে থাকতাম। কখনো আব্বাজানের ওপর অভিমান করে খানা খেতাম না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম, ক্ষুধা নেই। তিনি তখন এক টাকা দিয়ে বলতেন, এবার তো ক্ষুধা লাগবে। তখন আমরা খুশিতে খাবার খেতাম।'

শৈশব থেকেই পিতা তাকে আত্মমর্যাদাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। রমজান মাসে তারাবীতে কুরআন খতম হলে মিষ্টি বিতরণ করা হতো। মহল্লার ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকল ছেলেমেয়ে মিষ্টির জন্য মসজিদে আসত। কিন্তু পিতা কখনো দু'ভাইকে মিষ্টির জন্য মসজিদে যেতে দিতেন না। বরং বাজার থেকে মিষ্টি এনে খাওয়াতেন। আর বলতেন, বেটা, মসজিদে সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিষ্টির জন্য হাত পাতলে আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়।

শৈশবের প্রবণতা

বাল্যকালে তিনি খেলাধূলা একদম পছন্দ করতেন না। সাধারণ বালকদের সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। ঘরে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন। এতে সমবয়স্ক বালকেরা অপমান বোধ করত। এমনকি অনেক সময় ছোরা-চাকু দিয়ে তাকে ভয় দেখাত। ফলে পিতা তাকে মক্তবে পাঠাতেন প্রহরীর সাথে। এতেও দুষ্ট বালকেরা নিবৃত্ত হচ্ছে না দেখে পিতা বাধ্য হয়ে থানার দারোগাকে জানান। দারোগা সাহেব ওই সমস্ত বালককে ডেকে আচ্ছা রকম পিটিয়ে দেন। পরে শাসিয়ে বলে দেন, আবার যদি শুনতে পাই তোমরা আশরাফ আলীকে খেলার জন্য বাধ্য করছ, তাহলে এমন শাস্তি দেব যে, চিরজীবন মনে থাকবে।

শৈশব থেকেই নামাজের প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। এমনকি খেলার মধ্যেও নামাজের অভিনয় করতেন। যেমন সাথীদের জুতো সারিবদ্ধ করে রাখতেন। পরে একটা জুতো রাখতেন সামনে। কেমন যেন জুতোগুলো নামাজ পড়ছে। এতে তিনি বিমলানন্দ অনুভব করতেন। এমনিভাবে বারো বছর বয়স থেকেই শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। প্রচণ্ড শীতের রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখে চাচিমা অনেক সময় দুঃখ করে বলতেন–'বাবা, এখন তোমার বয়সই বা কত! এখনি তাহাজ্জুদ শুরু করতে হবে?' তিনি বলতেন, আমার মধ্যে দীনের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে প্রিয় উস্তাদ মাওলানা ফাতেহ মুহাম্মাদ সাহেবের সোহবতের বরকতে।

শৈশব থেকেই তার স্বভাব ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন। কারো খালি পেট দেখলে বমি এসে যেতো। স্বভাবের এমন নাযুকতার কারণে অনেক কষ্ট পেতেন। কোথাও তীব্র গন্ধ থাকলে ঘুমাতে পারতেন না। নিয়মনীতির ছিলেন একান্ত পাবন্দ। এজন্য তার বড় স্ত্রী মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করে বলতেন, উচিত ছিল কোনো বাদশার ঘরে আপনার জন্ম হওয়া।

www.maktabatulabrar.com

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর পীর ভাই মিয়াজি নুর মুহাম্মাদ ঝাঞ্ঝানবীর খাস খলিফা শায়েখ মুহাম্মাদ মুহাদ্দিস থানবী শৈশবে তার হালাত দেখে বলতেন, ভবিষ্যতে এই ছেলে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

পিতার দূরর্শিতা

হযরত থানবীর পিতা ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। ছেলেদের মন-মানস ভালো বুঝতেন। মাতৃহীন দু'টি ছেলেকে তিনি অত্যন্ত আদর-স্নেহে লালন-পালন করেন। অনেক ভেচেচিন্তে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বড় ছেলেকে আরবী পড়াবেন আর ছোট ছেলেকে পড়াবেন ইংরেজি। একবার তার ভাবী কথা প্রসঙ্গে বলেন, ভাই! ছোট ছেলেকে তো ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আশা করি সে ভালো উপার্জন করবে। (পরবর্তীতে তাই হয়েছিল, তিনি মিউনিসিপলিটির সেক্রেটারী পদে আজীবন ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরি করেছেন এবং সচ্ছল জীবন যাপন করেছেন।) কিন্তু বড় ছেলেকে যে আরবী পড়াচ্ছেন, সে কী করে খাবে? এ কথা শুনে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পান। প্রচণ্ড জোশের সঙ্গে বলে ওঠেন, ভাবী সাহেবা! আপনি বলছেন, আরবী পড়ে ও কী করে খাবে। খোদার কসম, যাদেরকে আপনি উপার্জনোক্ষম মনে করছেন তারাই তার পিছনে ঘুর ঘুর করবে। সে তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

হযরত থানবী এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'চাচীআম্মার জবাবে আব্বাজান যা বলেছেন, সেটি কোনো দরবেশের মুখ দিয়ে বের হলে মস্তবড় কারামত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু আমার আব্বাজান ছিলেন দুনিয়াদার মানুষ। তবে তার ইয়াকীন ও এখলাসের বরকতে আল্লাহ পাক তার কথার মধ্যে বরকত দিয়েছেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই এহসান করেছেন। তিনি যদি আমাকে আরবী না পড়াতেন তাহলে আমার কী অবস্থা হতো কে জানে? আমার অবস্থা দেখে ভাই মাঝেমধ্যে আফসোস করে বলতেন, আহা! আব্বাজান যদি আমাকেও আরবী পড়াতেন!'

মোটকথা– তিনি আকবর আলীর চেয়ে হযরতের জন্য বেশি খরচ করতেন। একবার ভাবী অভিযোগ করলে বলেন, ভাবী! আশরাফ আলীর জন্য আমার মায়া হয়। সে যা কিছু নিচ্ছে আমার জীবদ্দশা পর্যন্তই। আমার মৃত্যুর পর দেখবেন, সে আমার সম্পত্তি কিছুই গ্রহণ করবে না।

হযরতের পিতা প্রায়ই বলতেন, আমার এ ছেলেটি বড়ই ভাগ্যবান। কেননা তার সমস্ত উৎসব উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা প্রচুর বরকত দান

করেন। আমি প্রাণ খুলে খরচ করতে পারি। হযরতের বিবাহ অনুষ্ঠানেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হাজার হাজার লোককে খাইয়েছেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

তার তলবে ইলম শুরু হয় কুরআন পাকের মাধ্যমে। প্রথমে কুরআন শরিফের কয়েক পারা পড়েন মিরাঠ জেলার খাতোলী নামক স্থানে আখনজীর নিকট। পরে ফার্সি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মিরাঠের একাধিক উস্তাদের কাছে। হাফেজ হোসাইন আলী সাহেবের নিকট হেফজ করেন। মামা ওয়াজেদ আলীর কাছেও ফার্সি পড়েন, যিনি ছিলেন ফার্সি সাহিত্যের একজন সুদক্ষ উস্তাদ। থানাভবনে আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদ থানভীর কাছে। অবশেষে ১২৯৫ হিজরিতে উচ্চশিক্ষার জন্য দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে মাওলানা মানফাআত আলী দেওবন্দীর কাছে ফার্সির অবশিষ্ট কিতাবগুলো পড়েন এবং ফার্সি ভাষায় পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ফার্সি পদ্যে গদ্যে তার দখল ছিল অসামান্য। ছাত্রজীবনে একবার খুজলি-পাচড়ায় আক্রান্ত হয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন। তখন ফার্সিতে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার বয়স ছিল তখন মাত্র আঠারো বছর। মানতেক ও হেকমতের কিতাব তিনি বিসমিল্লাহর পরিবর্তে আউযুবিল্লাহ বলে শুরু করতেন। কেননা তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে। তিনি বলতেন, আল-হামদু লিল্লাহ, আমি কখনো তবিয়তকে আকলের ওপর এবং আকলকে শরীয়তের ওপর প্রাধান্য দেইনি।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেওবন্দে

দেওবন্দে তিনি মেশকাত শরিফ, মুখতাসারুল মায়ানী, নুরুল আনওয়ার ও মোল্লা হাসান থেকে সবক শুরু করেন। ১৩০১ হিজরিতে শিক্ষা সমাপন করেন। তার মুরব্বী উস্তাদ ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবী ও মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী। তাছাড়া শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ও মাওলানা সাইয়েদ আহমদ প্রমুখের কাছেও ইলম অর্জন করেন। ১৩০০ হিজরিতে কুতুবুল ইরশাদ মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী দস্তারবন্দি উপলক্ষে দেওবন্দ আসেন। তখন শায়খুল হিন্দ তার প্রিয় শিষ্য সম্পর্কে অত্যুচ্চ প্রশংসা করেন। ফলে হযরত গাঙ্গুহী তাকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। তিনি সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন।

www.maktabatulabrar.com

সময়ের সদ্ব্যবহারের ফলে তিনি পাঠ্য কিতাব ছাড়াও অন্যান্য কিতাব পড়ার সুযোগ পান। কোনো কোনো কিতাব তিনি এভাবেও পড়েছেন, উস্তাদ অজু করছেন আর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবক পড়ছেন। ইলমের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আগ্রহ দেখে উস্তাদগণ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং আগ্রহ সহকারে পড়াতেন।

তার উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হলো– মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদ থানবী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবী, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী ও কারী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাহেব প্রমুখ।

দেওবন্দে তার অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল। কিন্তু তিনি তাদের বাড়িতে যেতেন না। প্রথম দিকে অনেকে অনুযোগ করে বলত, অযথা কষ্ট করার কী প্রয়োজন, আমাদের বাড়িতে এসে খাও! তবুও তিনি তাদের বাড়ি যেতেন না। এ ব্যাপারে পিতার নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি লেখেন, তুমি কি সেখানে আত্মীয়তা রক্ষা করতে গিয়েছ, না লেখাপড়া করতে গিয়েছ? খবরদার! কারো বাসায় আসা-যাওয়া করবে না। পরে এভাবেই তিনি পুরো ছাত্রজীবন কাটিয়ে দেন। কারো সঙ্গে মিশেননি, কোনো আত্মীয়ের বাসায় যাননি।

সর্ব বিষয়ে পারদর্শিতা

বয়ান-বক্তৃতা ও তর্ক-বিতর্কে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। তার উপস্থিত বুদ্ধি, বাকচাতুর্য ও বিচক্ষণতা ছিল অসাধারণ। কখনো কোনো বিতর্কে পরজিত হননি। একবার এক ইংরেজ পাদ্রির সঙ্গে বিতর্ক করতে যান। তার উস্তাদ শায়খুল হিন্দ ভাবলেন, সে তো এখনো ছেলেমানুষ, ভয় পেয়ে যায় কি না! তাই নিজেও উপস্থিত হন। কিন্তু দেখা গেল, দু'মিনিটেই তিনি পাদ্রির মুখ বন্ধ করে দেন। অবস্থা বেগতিক দেখে মেম সাহেবা চিরকুট পাঠান, তুমি চলে এসো। সুযোগ বুঝে তিনি চলে গেলেন এবং দেওবন্দ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

উলুমে আকলিয়ার প্রতি ছিল তার বিশেষ ঝোঁক। তীক্ষ্ণ মেধা, সাবলীল উপস্থাপনা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ছিলেন অদ্বিতীয়। একবার বলেন, কোনো প্রকার অহংকার বা অতি বিনয় ছাড়াই বলছি, ইলমে মানতেকে আমার দক্ষতা আছে। দেওবন্দে কোনো মুনাজারা হলে তিনি উৎসাহের সঙ্গে উপস্থিত হতেন। তবে তবিয়তে ভারসাম্য ছিল। দীনি ইলমকে সর্বদা

মাকুলাতের ওপর প্রাধান্য দিতেন। দারুল উলুমের উস্তাদ যুগশ্রেষ্ঠ মুনাজির, সাইয়েদ মুর্তাজা হাসান চাঁদপুরী তার সম্পর্কে বলেন, ফন্নে মুনাজারায় তার দক্ষতা বড় বড় মুনাজিরদের চেয়েও বেশি। অথচ তিনি ছিলেন নিতান্তই তরুণ। তার তখনকার বয়ান-বক্তৃতা শুনেই তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। পরে অবশ্য মুনাজারার প্রতি তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি নিজেই বলেন, ছাত্রজীবনে মুনাজারার প্রতি যতটা আগ্রহ ছিল এখন এর ক্ষতি দেখে আমি ততটাই বিরক্ত।

আল্লাহ পাক তাকে দৈহিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি চমৎকার কণ্ঠস্বরও দান করেছেন। তাই ইলমে কেরাতে দক্ষতার সঙ্গে চমৎকার কণ্ঠ সোনায় সোহাগার কাজ দেয়। তিনি পবিত্র মক্কায় কেরাত মশক করেন প্রসিদ্ধ কারী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নিকট। আরবদের নিকটও তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য কারী। তার দক্ষতা এতই নিপুণ ছিল যে, উস্তাদ শাগরেদ যখন মশক করতেন তখন বুঝা যেতো না কে উস্তাদ আর কে শাগরেদ।

তার ছাত্রযমানায় মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী তার মাধ্যমে ফতোয়া লেখাতেন। একবার একটা প্রশ্নের বিশদ উত্তর লিখে তিনি হযরত নানুতবীর সামনে পেশ করেন। আরেফ বিল্লাহ হযরত নানুতবী দস্তখতের সময় বলেন, মনে হচ্ছে তোমার অবসর আছে। আমি তো দেখছি তোমার সামনে চিঠিপত্রের বিশাল স্তূপ, আর তুমি লম্বা লম্বা উত্তর লিখছ। উস্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

উলুমে আকলিয়া ও নকলিয়ায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তার বিনয় ছিল অসাধারণ। একবার খবর পেলেন মাদরাসায় দস্তারবন্দি মাহফিল হবে। হযরত গাঙ্গুহীর হাতে হবে দস্তারবন্দি। তিনি সব ছাত্র নিয়ে প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবীর কাছে গিয়ে মাহফিল না করার আবেদন করেন।

তাসাওউফের প্রতি আকর্ষণ

ছাত্রজীবনেই তার অন্তর তাসাওউফের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে দরসী ইলমী কিতাবের পাশাপাশি তাসাওউফের কিতাবাদিও পড়তেন। এ কারণে ছাত্রজীবন থেকেই তার চালচলন ছিল নিতান্ত সাদাসিদা ও অনাড়ম্বর। উস্তাদগণের নিকট থেকে শুধু ইলম অর্জন করতেন না, বরং তাদের চালচলন এবং জীবন যাপন পদ্ধতিও অনুসরণ করতেন। বুযুর্গ উস্তাদগণের দেখাদেখি তিনিও অভ্যস্ত হয়ে যান সাদাসিদা জীবনযাপনে। একবার

www.maktabatulabrar.com

ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে নিজের কম্বলখানি এলোমেলোভাবে গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন। দেখে পিতা বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, মিয়া, তুমি কি কম্বলও গায়ে দিতে শেখনি? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, আব্বাজান! আমাকে কম্বল গায়ে দেয়া শেখানোই যদি আপনার উদ্দেশ্য হতো তাহলে তো আমাকে দেওবন্দে পাঠাতেন না। সেখানে তো উস্তাদগণ সুশৃঙ্খলভাবে কম্বল গায়ে দেন না, সকলে বরং আলুথালু বেশে পড়ে থাকেন। তার পিতা উষ্ণ মেজাযের লোক হয়েও সেদিন কিছু বলেননি।

প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহ তাআলা তাকে অসাধারণ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাকে শাসন বারণ করা বা কড়া নজরে তাকানোর প্রয়োজন পড়েনি। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সংশোধন হয়ে যেতো। 'আসদাকুর রুইয়া' নামক কিতাবে তিনি লেখেন, দারুল উলুম দেওবন্দে থাকাকালে একবার এক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার জন্মতারিখ কোনটি? আমি বললাম, ৫ই রবিউস সানী। তিনি বললেন, জন্মবর্ষ আরম্ভ হওয়ার আগে দু'টি রোজা রেখো, তাতে বরকত হবে। আমি কয়েক বছর পর্যন্ত তার সেই নির্দেশ পালন করি, এখন অবশ্য কিছুটা ত্রুটি হচ্ছে। একসময় স্বপ্নের কথা আত্মীয়-স্বজনকে বললে তাদের মধ্যে এক বুযুর্গ বলেন, বলো তো সেই বুযুর্গের আকৃতি কেমন? আমি তার আকার-আকৃতি যথাযথভাবে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, ইনি তো হাফেজ গোলাম মুর্তাজা মাজযুব রহ.।

এমনিভাবে মিয়াজী নুর মুহাম্মাদের খলিফা হযরত হাজী সাহেবের পীরভাই মাওলানা শেখ মুহাম্মাদ মুহাদ্দিস যখন তাকে শৈশবে মক্তবে যেতে দেখতেন, তখন বলতেন, একদিন এই ছেলে থানাভবনে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। পরবর্তীতে তা-ই হয়েছে। মাওলানা শেখ মুহাম্মাদের ইন্তিকালের পর একদিন স্বপ্নযোগে তাকে বলেন, তোমার প্রতি জীবদ্দশায় আমি যেমন লক্ষ্য রেখেছি, এখনও আমার তেমনি লক্ষ্য আছে।[১]

দরস-তাদরীস

তৎকালে কানপুরে একটি প্রাচীন মাদরাসা ছিল মাদরাসায়ে ফয়যে আম নামে। সেখানকার সদরে মুদাররিস মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব কোনো কারণে চলে যান। তিনি ছিলেন মানতেক ও হেকমতে অত্যন্ত দক্ষ মুদাররিস।

১. তাযকেরাতুল আউলিয়া ৯১৫।

তখন সদরে মুদাররিস হিসাবে হযরতকে তলব করা হয়। তিনি উস্তাদ ও পিতার অনুমতিক্রমে ১৩০১ হিজরিতে পঁচিশ রুপিয়া বেতনে সেখানে যোগদান করেন। যুবক ছিলেন, তবুও অতি দ্রুত সকলের মাঝে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেন।

একদিকে দরস-তাদরীসে ছাত্র ও শিক্ষকগণ মুগ্ধ হচ্ছিল, অন্যদিকে ওয়াজ-নসিহতে কানপুরবাসী হচ্ছিল বিমুগ্ধ। মাত্র তিনচার মাসে তিনি সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ছাড়েন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ চাইল তার জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে মাদরাসার আর্থিক ফায়দা হাসিল করতে। তারা মাদরাসার জন্য চাঁদা তুলতে আবেদন করল। এ ধরনের চাঁদা যেহেতু তিনি নাজায়েয মনে করতেন, দীনী মর্যাদার পরিপন্থী মনে করতেন, তাই অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'মাদরাসার জন্য চাঁদা তোলা আমার কাজ নয়, এটি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কাজ। আমার কাজ শুধু পড়ানো।' ফলে তার বিরুদ্ধে কথা ওঠে। জানতে পেরে তিনি মাদরাসা থেকে ইস্তফা দেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সেখানে থাকেননি, বরং বাড়িতে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেন।

জামেউল উলুমে কয়েক বছর

বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে মাওলানা ফজলুর রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদীর খেদমতে উপস্থিত হন। কারণ এ সুযোগ আর নাও হতে পারে। যদিও তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার ছিলেন, আর হযরত থানবী ছিলেন চিশতিয়া তরিকার, তবুও যেহেতু কুতুব ছিলেন, তাই সাক্ষাৎ করা জরুরী মনে করলেন।

এদিকে কানপুরবাসী তার চলে যাওয়ায় ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমন যোগ্য আলেমের চলে যাওয়া তারা মানতে পারছেন না। ফলে তারা একটি নতুন মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। জনাব আব্দুর রহমান খান ও কেফায়েতুল্লাহ সাহেব ছিলেন হযরত থানবীর একান্ত ভক্ত। তারা উদ্যোগী হয়ে পঁচিশ রুপিয়া বেতনে তাকে সেখানে রেখে দেন। এভাবে জামেউল উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি সেখানে দরস-তাদরীসে মশগুল থাকেন। সঙ্গে ওয়াজ-নসিহত, তালীফ-তাসনীফ ও ফতোয়ার কাজও করেন। দারুল উলুম দেওবন্দে যে রঙে রঙিন হয়েছেন, যে জাহেরী ও বাতেনী কামালাতে সজ্জিত হয়েছেন, তালাবা-উলামা ও জনগণকেও সে রঙে রঙিন করে তোলেন।

www.maktabatulabrar.com

অতঃপর ১৩১৫ হিজরিতে আপন মুরশিদ শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নির্দেশে কানপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে থানাভবনে চলে যান। এ বিষয়ে হাজী সাহেবের একটি চিঠি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন, 'ভালোই হলো থানাভবনে চলে এসেছেন। আশা করি বহু মানুষ আপনার মাধ্যমে উপকৃত হবে। আপনি আমাদের মাদরাসা মসজিদকে নতুনভাবে আবাদ করুন। আমি সবসময় দোয়া করছি।'

সারা জীবনই তিনি তালিবে ইলমদের বেশি মহব্বত করতেন। তাদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন। নিজেকে সর্বদা তালিবে ইলম মনে করতেন। তিনি বলতেন, 'আমার পীর-মুরিদী আসে না। আমি তো তালিবে ইলম। মানুষ আমার কাছে কুরআন-হাদিস জিজ্ঞাসা করে। আর কুরআন-হাদিসের কথাই আমার জবানে বেশি আসে। এটাকেই আসল দরবেশি মনে করি।' অন্যত্র বলেন, 'সুফীদের চেয়ে আলেমদের প্রয়োজন বেশি। কেননা তাদের মাধ্যমে দীনে ইসলাম টিকে আছে।'

দরসদান পদ্ধতি

হযরত থানবীর দরসদান পদ্ধতি ছিল খুবই সুন্দর ও প্রাঞ্জল। কেউ তার কাছে দু'চারটি সবক পড়লে অন্য কারো কাছে পড়ে তৃপ্তি পেতো না। তিনি বলেন, আমি দরসদানের পূর্বে যত্নসহকারে সবকের বিষয়গুলো আত্মস্থ করে নিই, তারপর সবব পড়াই। ফলে আমার তাকরীর হয় সহজ, সরল ও সুবিন্যস্ত। বিষয় যত কঠিনই হোক বুঝতে সামান্য কষ্ট হয় না। সরল ভাষায় ব্যক্ত করতে আমার যদিও কষ্ট হয়, কিন্তু ছাত্রদের বুঝতে সহজ হয়।

সদরা কিতাবে মুসান্নাত বিততাকরীর শিরোনামে একটি প্রসিদ্ধ আলোচনা আছে। আলোচনাটি খানিকটা জটিল। একবার সবকে বিষয়টির ওপর আমি খুব সহজ সরল একটি বক্তব্য রাখলাম। ছাত্রকে বুঝতেই দিলাম না, এটি জটিল বিষয়। আমার সহজ সরল বক্তব্যে সে বিষয়টি সহজে বুঝে নিল। পরে বললাম, এটিই সেই মুসান্নাত বিততাকরীর। আমার কথা শুনে সে নড়েচড়ে বসল। বললাম, ব্যস, ভয় নেই, পার হয়ে গেছি। এরপর জিজ্ঞাসা করলাম, বলতো, এটি এমন কি কঠিন? সে বলল, সবাই এটাকে জটিল বলে, তাই ভয়ে ছিলাম। কিন্তু বাস্তবে তেমন জটিল নয়।

১. আশরাফুস সাওয়ানেহ ৪৬।

তিনি আরো বলেন, দরসদানের ক্ষেত্রে সবসময় আমি সুবিন্যস্ত তাকরীর করার চেষ্টা করি। এজন্য আমাকে কষ্ট করতে হয়। দরসের পূর্বে বিষয়বস্তু সাজিয়ে নিয়ে হয়। বর্তমানে উস্তাদগণ সামান্য কষ্ট করতে রাজী নন। ছাত্রদের প্রতি তাদের কোনো দরদ নেই, শুধু নিয়মরক্ষা করেন।

সবকে আমি কখনো অযথা তাকরীর করি না। শুধু কিতাব বুঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় কথা বলি। অতিরিক্ত কথা বললে ছাত্রদের সময় নষ্ট হয়। আজকাল উস্তাদগণ যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। ফলে ছাত্ররা কিতাবের মর্ম বুঝে না কিছুই।

দীর্ঘ তাকরীরের সপক্ষে অনেকে বলেন, এতে নাকি উস্তাদের ওপর ছাত্রদের আস্থা বাড়ে। আমি বলি, দরসের দ্বারা ছাত্রদের আস্থা কুড়ানো উদ্দেশ্য, না তাদের কল্যাণ উদ্দেশ্য? যদি কল্যাণ উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলব, কিতাব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার মধ্যেই তাদের কল্যাণ।

তার শাগরেদদের মাঝে অন্যতম হলেন– মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা আব্দুল আজিজ নোয়াখালী, মাওলানা মুহাম্মাদ রশিদ কানপুরী, মাওলানা আহমদ আলী ফতেহপুরী, মাওলানা সাদেকুল ইয়াকীন কুরসুবী, মাওলানা ফযলে হক বারাবাঙ্কী, মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ মোস্তফা বিজনৌরী ও মাওলানা জফর আহমদ উসমানী প্রমুখ।

সাপ্তাহিক বয়ান-বক্তৃতা ও মুনাজারা তিনি অপছন্দ করতেন। কারণ এতে সপ্তাহভর ছাত্রদের মনোযোগ নষ্ট হয়। তিনি বলেন, কিতাব ভালো করে পড়লে বয়ান-বক্তৃতা এমনিতে এসে যায়। তার জীবন ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি বলতেন, ছাত্ররা যদি তিনটি বিষয়ে পাবন্দি করে তাহলে অবশ্যই তার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

প্রথমত : সামনের সবক এমনভাবে মোতালায়া করবে যেন কোন্‌টা বুঝেছে আর কোন্‌টা বোঝেনি পার্থক্য হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত : সবক বুঝা ছাড়া সামনে অগ্রসর হবে না।

তৃতীয়ত : বুঝে থাকলে নিজেও একবার তাকরার করে নেবে। এই তিনটি বিষয়ে পাবন্দি করা আবশ্যক। তবে আরেকটি কাজ করতে পারলে ভালো। প্রতিদিন পিছনের পড়ায় চোখ বুলাবে।

বুযুর্গানে দীনের সোহবত

আহলুল্লাহদের প্রতি ছিল তার গভীর মহব্বত। তিনি বলতেন, বুযুর্গদের আলোচনায় অন্তরে সজীবতা আসে এবং নুর পয়দা হয়।

www.maktabatulabrar.com

'নুযহাতুল বাসাতীন' নামে তিনি একটি সংকলন তৈরি করেছেন যাতে আহলুল্লাহদের একহাজার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, এরা হলেন আল্লাহ পাকের আশেক, কেউ তাদের ঘটনা পড়বে আর তার অন্তরে আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা হবে না, এটা হতে পারে না।

একবার নিজের সম্পর্কে বলেন, ছাত্রজীবনে কখনো এ বিষয়ে মেহনত করিনি, রিয়াযত-মোজাহাদা কিছুই করিনি। আল্লাহ পাক যা কিছু দিয়েছেন উস্তাদের দোয়ার বরকতে এবং তাদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার বদৌলতে। কখনো কখনো তাদের বাতেনী কামালাত ও ইলমী উৎকর্ষের আলোচনায় উদ্বেলিত হয়ে পড়তেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা রফিউদ্দীন মুজাদ্দেদী সাহেবের মজলিসে তিনি শরিক হতেন। একবার বলেন, তার মজলিসে অন্তরে এমন আছর হতো মনে হতো একদম পাক সাফ হয়ে গেছি। তার সঙ্গে একবার তিনি সীমান্ত প্রদেশে মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর মাযার জিয়ারত করতে যান। ফিরতি পথে পাটয়ালায় সেসব জায়গা জিয়ারত করেন যেখানে নবীদের মাযার আছে বলে জনশ্রুতি আছে। এমনিভাবে শাহ ফজলে রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী ও শাহ আবু হামেদ ভূপালীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। প্রথমজনের সঙ্গে খুবই মহব্বত হয়ে যায়। এমনকি তিনি তাকে গোপন হালতও শোনান। একবার বলেন, বলার মত নয়, তবুও তোমাকে বলছি, যখন সেজদা করি মনে হয় আল্লাহ পাক পেয়ার করছেন। আরো বলেন, ভাই, জান্নাতের মজা সত্য, কাউসারের মজাও সত্য, কিন্তু নামাজের যে মজা সেটা অন্য কিছুতে নেই। কবরেও আমি নামাজ পড়ব। দোয়া করি, আল্লাহ যেন কবরে আমাকে নামাজ পড়ার অনুমতি দেন।'

তিনি সর্বপ্রথম কুতুবে আলম মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর হাতে বয়াতের দরখাস্ত করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তার সঙ্গে শায়েখের মত আচরণ করেন। হযরত গাঙ্গুহীর সঙ্গে ছিল তার গভীর সম্পর্ক। তিনি বলতেন, 'আমি তার মত জাহের ও বাতেনের এমন জামে' বুযুর্গ কোথাও দেখিনি। মানুষের সঙ্গে আমার মহব্বত দালিলিক, কিন্তু হযরত গাঙ্গুহীর সঙ্গে আমার মহব্বত দালিলিক নয়। কারণ তার ব্যাপারে দলিল খোঁজা বেয়াদবী।'

থানাভবনে হযরত থানবীর ওয়াজ-নসিহতের ব্যস্ততা শুনে তিনি খুশি হতেন। কিন্তু সঙ্গে একথাও বলতেন, 'সবই ঠিক, তবে আমি সেদিন পুরোপুরি খুশি হবো যেদিন শুনব সেখানে কিছু জাকেরীন জমা হয়েছে।'

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে কে না চেনে? হযরত গাঙ্গুহীর প্রিয় খলিফা, হযরত কাসেম নানুতবীর খাস শাগরেদ এবং হযরত থানবীর প্রিয়তম উস্তাদ। প্রিয় শাগরেদকে শায়খুল হিন্দ এতটা মহব্বত করতেন যে, 'সেরাপা ফযল ও কামাল' এবং 'মা'দানে হাসানাত ওয়া খায়রাত' বলে সম্বোধন করতেন। শায়খুল হিন্দের সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতভিন্নতা ছিল। কেউ কেউ তার ব্যাপারে শায়খুল হিন্দের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলতেন, আফসোস, তোমরা আমার কাছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করো যাকে আমি এমন এমন (হযরত থানবী বিনয়স্বরূপ শব্দটা বলেননি) মনে করি। আমি যা করছি এ ব্যাপারে কি ওহি আছে যে, এর সবই সঠিক। আমার একটা অভিমত, ওর ভিন্ন অভিমত। এতে অভিযোগের কী আছে?'

মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী ছিলেন হযরত গাঙ্গুহীর খাস খলিফা। আবার ইলম ও আমলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। হযরত থানবী সম্পর্কে তিনি বলতেন, আমি তাকে তখন থেকে মহব্বত করি যখন সে জানতই না।' তার মাওয়ায়েজ সম্পর্কে তিনি বলেন, তার বয়ানে আঙ্গুল উঠানোর সুযোগ নেই। তার উপস্থিতিতে কারো বয়ান করা লজ্জাজনক।

হাজী সাহেবের খেদমতে

হযরত হাকিমুল উম্মতের পুরো জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায়, তাকে শুধু দীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জন্মের আগে থেকেই এমন লক্ষণ প্রকাশ পায়, যার মাধ্যমে প্রতিভাত হয় তিনি একজন বড় আল্লাহওয়ালা ও মুজাদ্দিদ হবেন। শিক্ষা সমাপনের পর তার উস্তাদ মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তুমি যেখানেই যাবে শুধু নিজেকেই দেখবে। বাস্তবেও হয়েছে তাই। উলুমে জাহেরী থেকে ফারেগ হওয়ার পর তার অন্তরে তাযকিয়ায়ে নফসের তড়প সৃষ্টি হয়।

একবার হযরত গাঙ্গুহী কোনো প্রয়োজনে থানাভবনে আসেন। হযরত থানবী তাকে একনজর দেখে আকৃষ্ট হয়ে যান। আগ্রহভরে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ান। এমনকি আগ্রহাতিশয্যে পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত গাঙ্গুহী তাকে ধরে ফেলেন। যদিও অল্পবয়স্ক ছিলেন কিন্তু বয়াতের জন্য

www.maktabatulabrar.com

আবেদন করে বসেন। হযরত গাঙ্গুহী ছাত্রদের বয়াত করতেন না, তাই অস্বীকার করে বলেন, তালিবে ইলম অবস্থায় বয়াত হওয়া পড়াশোনার জন্য ক্ষতিকর। ১২৯৯ হিজরিতে হযরত গাঙ্গুহী হজের সফরে রওয়ানা হন। তখন তার মাধ্যমে হাজী সাহেবের কাছে চিঠি লেখেন, 'আপনি হযরতকে বলে দিন যেন আমাকে বয়াত করে নেন।' জানা নেই, দু'জনের মাঝে কী কথাবার্তা হয়েছে হাজী সাহেব তখন নিজেই তাকে বয়াত করে নেন। তখন হযরত থানবীর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর।

হযরত থানবীর জন্মের পূর্বেই হাজী সাহেব মক্কায় হিজরত করেন। তবে অন্তর্দৃষ্টিতে চিনে নেন তাকে। তিনি তখনো ছাত্র, হাজী সাহেব তার পিতাকে লেখেন, আপনি হজে আসুন, সঙ্গে আপনার বড় ছেলেকে নিয়ে আসুন।

১৩০১ হিজরিতে তার লেখাপড়া সমাপ্ত হয়। কানপুরে খেদমত শুরু করেন। হঠাৎ সফরের সামান প্রস্তুত হয়ে গেলে পিতার সঙ্গে হারামাইনে রওয়ানা হন। সেখানে হযরত হাজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাকে দেখে হাজী সাহেব অত্যন্ত খুশি হন এবং হাতে হাত রেখে বয়াত করেন। হজের পরে বলেন, আমার কাছে ছয় মাস থেকে যাও। কিন্তু পিতা রাজী না হওয়ায় বলেন, পিতার আনুগত্য আগে; আচ্ছা, এবার যাও, পরে এসো। বিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম হজ করেন।

দ্বিতীয় হজ

খোদাপ্রেমের জ্বলন তো এমনিতে ছিল। হাজী সাহেবের সোহবত ও পাক জমিনের বরকতে তা আরো জ্বলে উঠল। তিনি দরস-তাদরীস, ওয়াজ-নসিহত ও লেখালেখিতে মশগুল ছিলেন। শায়েখের কাছে চিঠিপত্র পাঠাতেন। ১৩০৭ হিজরিতে তার অবস্থার আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। বাতেনী শুগল এত বেড়ে যায় যে, সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন। চাকরি ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে শায়েখের কাছে পরামর্শ চান, কিন্তু শায়েখ অসম্মতি প্রকাশ করেন।

শায়েখের নির্দেশে দরস-তাদরীস জারি রাখেন। ১৩১০ হিজরী পর্যন্ত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু করতে থাকেন। পরে মনে পড়ে যায় শায়েখের কথা, 'মিয়া আশরাফ আলী! আমার কাছে ছয় মাস থেকে যাও।' অস্থির হয়ে একসময় হজের নিয়ত করে ফেলেন। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রওয়ানা হন পবিত্র মক্কায়। এদিকে শায়েখও তাকে পেয়ে

যেন হারানো ছেলেকে ফিরে পান। হজের পর শায়েখের সোহবতে কয়েক মাস কাটান। কিছু দিনের মধ্যেই পীর-মুরিদ যেন একই রঙে রঙিন হয়ে যান। একসময় শায়েখ বলেন, ব্যস, তুমি পুরোপুরি আমার তরিকায় আছ। কখনো তার লেখা পড়ে বা বয়ান শুনে বলতেন, জাযাকাল্লাহ! তুমি আমার মনের কথা বলে দিয়েছ। কেউ উলুম ও মায়ারেফ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে তাকে দেখিয়ে বলতেন, ওকে জিজ্ঞাসা করো, ও সব ভালো বোঝে। কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ও আমার নাতি। কখনো স্নেহবশত বলতেন, মিয়া আশরাফ আলী। শায়েখ একবার সুসংবাদ দেন–তাফসীর ও তাসাওউফের সঙ্গে তোমার মুনাসাবাত হবে। বাস্তবেই ফনদুটির সঙ্গে তার মুনাসাবাত ছিল গভীর।

শায়েখের সঙ্গে বাতেনী মুনাসাবাত যেমন ছিল তেমনি শায়েখ চাইতেন জাহেরী মুনাসাবাতও থাকুক। মক্কায় থাকাকালে একবার তার খালা শায়েখের কাছে আবেদন করেন, তার জন্য দোয়া করুন যেন সন্তান হয়। শায়েখ তাকে বলেন, তোমার খালা তোমার জন্য দোয়া করতে বলেছে যেন সন্তান হয়। আমি দোয়া করেছি, কিন্তু ভাই! আমার যে এটাই পছন্দ আমি যেমন আছি তুমি তেমনি থাক। জবাবে তিনি বলেন, আপনার যা পছন্দ আমার তাই পছন্দ। একথা শুনে হাজী সাহেব অত্যন্ত খুশি হন।

দীর্ঘ ছয় মাস শায়েখের কাছে থেকে একসময় বিদায় নেন। বিদায়ের সময় শায়েখ দুটি নসিহত করেন। দেখো, মিয়া আশরাফ আলী! হিন্দুস্তান পৌঁছে তুমি একটি বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হবে। তখন তাড়াহুড়া করবে না। দ্বিতয়ত কখনো কানপুর থেকে মন উঠে গেলে আর কোথাও জড়াবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে সোজা থানাভবনে গিয়ে বসে যাবে। ১৩১১ হিজরিতে তিনি হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন।

১৩১৫ পর্যন্ত কানপুরে

হজ থেকে ফিরে তিনি কানপুরে দরস-তাদরীসে মশগুল হয়ে যান। কিন্তু কিছু দিন যেতেই মনে ইশকে এলাহীর আগুন জ্বলে ওঠে। তবে আগের মত মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল; মন ভারাক্রান্ত ছিল না, বরং ছিল আনন্দ-উৎফল্লতা। তিনি বলেন, কখনো মন চাইত সারা দুনিয়াকে জাকের শাগেল বানিয়ে দেই। মাদরাসায় শুরু থেকে মজলিস চালু ছিল। একসময় সকলে জাকের শাগেল হয়ে গেল। তবে অবস্থাটা ছিল সাময়িক। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। তার বাতেনী

www.maktabatulabrar.com

মাকাম যত বাড়ছিল অস্থিরতাও বাড়ছিল সে অনুপাতে। শায়েখও এ ব্যাপারে তাকে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছেন। একসময় সমস্ত ব্যস্ততার প্রতি মন বিতৃষ্ণ হয়ে গেল। দরস-তাদরীস থেকে মন উঠে গেল। ওয়াজ-নসিহতের আগ্রহ রইল না। কানপুরবাসী তার ওয়াজের জন্য তৃষ্ণার্ত থাকত, কিন্তু তিনি ছিলেন অপারগ। ইশকের আগুন তাকে অক্ষম বানিয়ে দিয়েছে।

তিনি নিজের অস্থিরতার কথা শায়েখকে জানান। শায়েখ সান্ত্বনা দিলে মন প্রশান্ত হয়। হঠাৎ একাগ্রতার প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। লোকের সংস্পর্শ অসহ্য হয়ে উঠল। এমনকি কানপুরের মত প্রিয় জায়গা, দরস-তাদরীসের মত প্রিয় শুগল থেকেও মন উঠে গেল। তখন মনে পড়ল শায়েখের নসিহত–কখনো কানপুর থেকে মন উঠে গেলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে থানাভবনে বসে যাবে।

১৩১৪ হিজরী সমাপ্ত হতেই তিনি থানাভবনের খানকায়ে এমদাদিয়া আবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন, বহুদিন থেকে যা পড়ে আছে। মাওলানা ইসহাক বর্ধমানীকে মাদরাসার সদরে মুদাররিস বানিয়ে নিজে থাকেন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। পরে কিছুদিন অবসরের অজুহাতে থানাভবনে চলে আসেন। জানতে পেরে শায়েখ বলেন, ভালোই হয়েছে, আপনি থানাভবনে চলে এসেছেন। আশা করি, অনেক মানুষ আপনার মাধ্যমে জাহেরী বাতেনী এসলাহের সুযোগ পাবে। আপনি আমাদের মাদরাসা মসজিদ পুনরায় আবাদ করুন।

স্থায়ীভাবে থানাভবনে

১৩১৫ হিজরী থেকে তিনি স্থায়ীভাবে থানাভবনে বসবাস শুরু করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে থাকেন। হাজী সাহেবের হিজরতে, হযরত যামেন সাহেবের শাহাদাতে এবং মাওলানা শায়েখ মুহাম্মাদ সাহেবের মৃত্যুতে থানাভবনে মারাফাতের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর হযরত থানবী তা পুনরায় চালু করেন। হাজী সাহেবের নির্দেশে এবং হযরত গাঙ্গুহীর ইঙ্গিতে আল্লাহর ওপর ভরসা করে খেদমত শুরু করেন।

তখনো দীর্ঘ একবছর তার মাঝে অস্থিরতা থাকে। গালাবায়ে খওফ তাকে অস্থির করে তুলে। শরীর-স্বাস্থ্য শুকিয়ে যায়। কখনো খানকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কখনো খালি বন্দুক নিয়ে ফায়ার শুরু করেন। এমনকি মাঝেমধ্যে আত্মহত্যার ইচ্ছাও মনে জাগে।

শায়েখের কাছে ক্রমাগত মুরাজায়াত ও শায়েখের সান্ত্বনায় অবস্থা একসময় স্বাভাবিক হয়। এমনকি আবদিয়্যতের সুউচ্চ মাকামে তিনি উত্তীর্ণ হন। অবশেষে একসময় বলেন–

আমি নিজেকে কোনো মুসলমান থেকে এমনকি ভবিতব্য হিসাবে কোনো অমুসলিম থেকেও উত্তম মনে করি না। আখেরাতে মর্তবা পাওয়ার সামান্য আশাও আমার মনে জাগে না। বরং মনে হয়, জান্নাতীদের জুতোর কাছে জায়গা পাওয়াও আল্লাহর বড় অনুগ্রহ। এটাও অধিকার বলে নয়, বরং জাহান্নামের আযাব সহ্য হবে না বলে। তবে এসলাহের জন্য মানুষকে যে তিরস্কার করি, সেটা অন্য বিষয়। মনে করুন, কোনো শাহযাদী অপরাধ করেছে। বাদশা জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন শাহযাদীকে দোররা মারার। জল্লাদের কি মনে হয়, আমি শাহযাদী থেকে ভালো? কোনো মুমিন যত পাপীই হোক তাকে নগণ্য মনে করি না। এই দৃষ্টান্ত তখন জেহেনে এসে যায়।

শরীয়ত ও তরিকতের সুসমন্বয়

এদেশে আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ অনেক দেখা যায়। কিন্তু শরীয়ত ও তরিকতের এমন সুসমন্বয় তেমন দেখা যায় না। কেউ হয়ত নিরেট আলেম, কিন্তু তরিকত সম্পর্কে বে-খবর। কেউ তরিকতে অভিজ্ঞ, কিন্তু শরয়ী উলুমে অজ্ঞ। তিনি ছিলেন যুগপৎ বিশিষ্ট সুফী, বিদগ্ধ আলেম। আবার রুমিয়ে যমান ও যুগের রাজী, গাজালী। জাহেরী শরীয়তকে যেমন জাহালাত ও গাফলত থেকে পবিত্র করেছেন, তেমনি বাতেনী তরিকতকেও করেছেন সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তরিকতকে সমস্ত কুসংস্কারের ঘেরাটোপে থেকে মুক্ত করে সালাফের রাজপথে তুলে দিয়েছেন। তিনি একথা প্রমাণ করেছেন–তরিকতের মাঝে শরীয়ত আছে; শরীয়ত আলাদা কোনো বিষয় নয়। তার নিকট তরিকতের খোলাসা হলো, মুসলমানদের মাঝে যেন সাহাবীদের মত জীবনরুচি চলে আসে।

সেই মহান উদ্দেশ্যে তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করতেন যার মাধ্যমে যোগবাদ, সুফিবাদ ও বৈরাগ্যবাদের পর্দা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং রুহানিয়াতের সঠিক অর্থ বাঙময় হয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, শরীয়ত দুনিয়া-আখেরাত এবং জাহেরী-বাতেনী সমস্ত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

তখনকার সময়ে বুযুর্গি ও অকর্মণ্যতা সমর্থক হয়ে গিয়েছিল। মানুষ মনে করত, বুযুর্গদের কোনো নিয়মনীতি নেই, তাদের জন্য কাজকর্ম,

www.maktabatulabrar.com

সময়জ্ঞান বা শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই। অথচ তিনি সব কাজ নিয়মমাফিক করতেন। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতেন না। একদিন তার উস্তাদ শায়খুল হিন্দ তার বাড়িতে মেহমান হলেন। মেহমানের যথাযথ আপ্যায়নের পর তিনি উস্তাদের কাছে অনুনয় করে বলেন, হযরত! এ সময়টিতে আমি কিছু লিখি। অনুমতি হলে কিছু লিখে একটু পরেই হাজির হবো। উস্তাদ খুশি মনে অনুমতি প্রদান করেন। উস্তাদকে একাকী রেখে তিনি তো গেলেন, কিন্তু কাজে মনোনিবেশ করতে পারলেন না। কয়েক লাইন লিখেই উস্তাদের খেদমতে হাজির হলেন।

খানকায়ে এমদাদিয়া ছিল নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তার সময় যাপন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। সকাল থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এবং বাদ আসর থেকে এশা পর্যন্ত নিজস্ব কাজ করতেন। তালীফ-তাসনীফ ইত্যাদি কাজে মশগুল থাকতেন। তবে নতুন আগন্তুক সাক্ষাৎ করতে পারত বা কেউ বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে পারত। বারোটা থেকে জোহর পর্যন্ত বিশ্রাম, জোহরের পর আসর পর্যন্ত সাধারণ মজলিস। তখন সবাই শরিক হতে পারত এবং প্রশ্ন করতে পারত। এশার পর কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। তবে যারা একান্তে নিজের কথা বলতে চাইত তাদেরকে সময় দিতেন।

খানকায় নিয়মনীতি ও তথ্য-সম্বলিত একটা ফর্ম পূরণ করে হযরতের কাছে পেশ করতে হতো। তাতে ছিল–নাম কি, স্থায়ী ঠিকানা, অস্থায়ী ঠিকানা, কতদিন থাকার ইচ্ছা, রাতে কোথায় থাকার ইচ্ছা, পেশা কি, স্থাবর সম্পত্তি কী কী আছে, ইলমী যোগ্যতা কতটুকু, আরবী উর্দু ও ইংরেজি কোন ভাষা জানে, আসার উদ্দেশ্য কি, শুধু সাক্ষাৎ না কিছু বলার মত আছে, লিখে দিলে হবে না বলতে হবে, সবার সামনে বলা যাবে, না একাকী, আগে কারো কাছে বয়াত হয়েছে কি না, হলে কার কাছে, আমার কাছে বয়াত হয়ে থাকলে কতদিন হয়েছে, তালীম কার থেকে নেয়া হয়, আমার মাওয়ায়েজ পড়া হয় কি না, পূর্বে চিঠিপত্র লিখে থাকলে সঙ্গে আছে কি না, থাকলে দেখাও, খানকায় এই প্রথম না আগেও আসা হয়েছে, এখানকার খাবার ব্যবস্থাপনা জানা আছে কি না, বাইরের ঘোষণাপত্র দেখা হয়েছে কি না? সেই ঘোষণাপত্রে হযরতের সময়সূচী লেখা আছে।

আসলে এসব নিয়মনীতি ছাড়া কি এত বিপুল কাজ করা সম্ভব হতো? হাজারো কিতাব লেখা, উলুম ও মায়ারেফের খাজানা জমা করা, হাজারো চিঠিপত্রের জবাব দেয়া, ওয়াজের মাধ্যমে হাজারো মানুষকে হেদায়েত করা,

তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করা। মূলত নিয়মনীতি ও সময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এত বিপুল কর্মযজ্ঞ।

পারিবারিক জীবন

শুধু খানকায় নয়, পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন নিয়মের একান্ত পাবন্দ। তবে স্থান-বিশেষ নিয়মনীতি ভিন্ন ছিল। তার ছিল দুই স্ত্রী। নগদ অর্থ বা হাদিয়া এলে সমানভাবে বন্টন করে দিতেন। তিনি স্বভাবে ছিলেন কোমল, কঠোর ছিলেন না। সর্বদা শাসনের ওপর রাখতেন না, বরং দয়ামায়া ও উদারতা দেখাতেন। সবার সঙ্গে হাসিখুশি থাকতেন। স্ত্রীর আত্মীয়দেরও যথাসাধ্য মেহমানদারি করতেন। তাদের সন্তানদের সঙ্গে করতেন হাসি-মজাক।

পরিবারের ওপর কোনো বোঝা চাপাতেন না। বিশেষ কোনো খাবারের ফরমায়েশ করতেন না। কখনো তাদের পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ি হলে বলতেন, সহজে পাকানো যায় এমন কয়েকটি খাবারের নাম বলো আমি নির্বাচন করে দেবো। ব্যস্ততা সত্ত্বেও ঘরে নিয়মিত আসতেন যেন তাদের মনোকষ্ট না হয়। অসুস্থ হলে উদারভাবে খরচ করতেন। প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য দূরে নিয়ে যেতেন। তাআল্লুক মাআল্লার বাহানায় কারো হক নষ্ট করতেন না।

যদিও তিনি দুই বিয়ে করেছেন, কিন্তু তাদের মাঝে সম্পূর্ণ ইনসাফ করতেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি একজনের বাড়িতে অন্যজনের কল্পনা করাও বেইনসাফি মনে করতাম। কেননা এতে মনোযোগ কম হয়, তার হক নষ্ট হয়। কাপড়-চোপড় খানকায় রাখতাম যেন কারো মনোকষ্টের কারণ না হয়।

এসলাহের প্রচলিত ধারণা খণ্ডন

হযরত থানবী চার তরিকা তথা চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও কাদেরিয়া তরিকায় বয়াত করতেন। সঙ্গে একথাও বলে দিতেন, এসলাহে বাতেন ও চরিত্র সংশোধনের জন্য বয়াত হওয়া জরুরী নয়। এসলাহে নফস বয়াতের ওপর নির্ভরশীল নয়। বয়াত ছাড়াও এসলাহ হতে পারে। বয়াত ছাড়া এসলাহে নফস সম্ভব নয় বলে প্রচলিত ধারণা তিনি ভেঙ্গে দেন। এমনকি অনেককে তিনি খেলাফত দিয়ে পরে বয়াত করেছেন। তাও তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে।

এ ক্ষেত্রে আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী ও মাওলানা আব্দুল বারী নদবীর দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। তাদের বেলায় কোনো তরিকার প্রয়োজন

www.maktabatulabrar.com

ছিল না। প্রচলিত হালকা, তাওয়াজ্জুহ বা মুরাকাবা কিছুই ছিল না।এমনকি তারাও রুসুম-রেওয়াজের অন্ধভক্ত ছিলেন না। বরং শরয়ী বিধানের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। সার্বক্ষণিক ফিকির ছিল যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করা হয়। নফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা হয়। তিনি মুরিদদের সবিশেষ তাকিদ করতেন, নিজের জাহের ও বাতেনকে পবিত্র রাখতে। কখনো বলতেন, দীনের জাহের ও বাতেনের নাম শরীয়ত ও তরিকত। জাহেরী আমলের জন্য যেমন ফারায়েজ ও ওয়াজেবাত আছে, তেমনি বাতেনী আমলের জন্যও আছে। আমরা উভয়টি পালনের পাবন্দ।

তিনি আরো বলেন, আরেকটি জরুরী বিষয় হলো হুকুকুল ইবাদ। তোমরা নিজের পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও কর্মচারীদের হক যথাযথ আদায় করবে। এটা ফরজ। এতে অবহেলা করলে তায়াল্লুক মাআল্লাহর বাতাসও পাবে না, চাই সারা জীবন তাসাওউফ-সাধনা ও নফল অজিফায় মশগুল থাক না কেন। আল্লাহর সৃষ্টিকে অসন্তুষ্ট করে কি আল্লাহকে রাজি করা যায়? এটা কখনো সম্ভব নয়।

তরিকতের খোলাসা

মোটকথা– তার নিকট তরিকতের খোলাসা হলো মনুষ্যত্ব ও মানবতা অর্জন করা। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার মজলিসকে বুযুর্গদের মজলিস বানাতে চাই না, মনুষ্যত্বের মজলিস বানাতে চাই।'

তাই কেউ বেআইনি কিছু করলে, বেফিকির থাকলে, হুকুকে ওয়াজেবা তরক করলে, অব্যবস্থাপনা দেখলে, নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করতেন। এ ব্যাপারে মুরিদদের বারবার তাকিদ করতেন। কারণ এতে অন্যদের কষ্ট হয়। আর কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে যাদের এসলাহী সম্পর্ক আছে তাদের সামান্য অবহেলা আমার নজর এড়ায় না। তাদের থেকে কোনো গোনাহ বা অশোভন কিছু প্রকাশ পেলে আমার খারাপ লাগে। আমি কঠিনভাবে তাদেরকে পাকড়াও করি, চাই সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হোক। তবে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, তাদের দোষ-ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না। বরং সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাদের গুণগুলো শুধু চোখে পড়ে।

হযরত থানবীর দরবারে কাশফ-কারামাতের গুরুত্ব তেমন ছিল না, যতটা গুরুত্ব ছিল আকায়েদ, এবাদাত, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, সিয়াসাত ও তরিকতের এসলাহের। তিনি দোষ-ত্রুটির ব্যাখ্যায় বেশি জোর দিতেন। জাহেরী ও বাতেনী আমলের মাঝে এখতিয়ারী ও গাইরে এখতিয়ারীর

প্রতি, মাকসাদ এবং গাইরে মাকসাদের সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আদাবে যিন্দেগী ও আদাবে ইনসানিয়াত ছিল তার দৃষ্টিতে রুহানিয়তের মূল। তিনি অনেক সময় বলতেন, শাহ সাহেব হওয়া সহজ, বিরাট ব্যবসায়ী হওয়া সহজ, বুযুর্গ হওয়া সহজ, কুতুব হওয়া সহজ, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন। আবার একথাও বলতেন, বুযুর্গ হতে চাও, অলি হতে চাও, কুতুব হতে চাও, তো অন্য কোথাও যাও। মানুষ হতে চাও তো আমার কাছে আস। আমি মানুষ বানাতে পারি।

মারেফতের ঝরনাধারা

হযরত থানবীর দরবার ছিল আলেম-উলামা, আমীর-উমারা ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের মিলনমেলা। মারেফত ও রুহানিয়াতের এমন স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা যেখানে রাতদিন হাজারো পাপীতাপীর আত্মা পবিত্র হয়। মারেফাতের মহামূল্যবান নেয়ামত বিতরণ হয়। তার উলুম ও ফুয়ুয ছিল সর্বব্যাপক। তাতে আলেমগণ যেমন উপকৃত হতেন তেমনি আম-খাস, আমীর-ফকির, নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ সবাই নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী পরিতৃপ্ত হতো। তার দরবারে আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, খতিব ও বক্তা সব রকম লোক দেখা যায়। আবার গরিব, গ্রাম্য লোক, মধ্যবৃত্তশ্রেণীও দেখা যায়। তিনি কাউকে গরিব বানিয়ে দেন না। আবার কাউকে ঘরের কোণে আঁটকে রাখেন না। কাউকে স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেন না বা আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে বলেন না। বরং সবাইকে নিজ অবস্থানে রেখে অলি বানিয়ে দেন। শুধু অলি নয়, বরং হাজারো মানুষের মুসলেহ বানিয়ে দেন।

তিনি নিজের খানকায় আগত লোকদের বলতেন, দেখো, সরকারী কর্মচারীদের মাঝে আমার তরবিয়তপ্রাপ্ত পাবে, উলামা, সুলাহা ও মুদাররিসদের মাঝে পাবে আমার মুজায। আবার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ও উকিলদের মাঝে পাবে আমার এজাযতপ্রাপ্ত। তেমনি ফকিহদের মাঝে, জমিদারদের মাঝে ও নবাবদের মাঝে পাবে আমার খলিফা। বর্তমান যমানা বড়ই ফেতনা-ফাসাদের যমানা। সুতরাং দীনের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টান্ত সামনে রাখো। তাদের আঁচল আঁকড়ে থাকো। দেখো, দীন কত সহজ! সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে আছে। দীনদার হয়ে সবাই নিজ নিজ কাজে মশগুল; জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত। কোনো সমস্যা অনুভব করছে না। সুতরাং তোমাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

www.maktabatulabrar.com

তোমরা স্পষ্ট অনুভব করবে, দীন কত সহজ। জীবনের সর্বঅঙ্গনে দীনের উপর আমল করা যায়।

হযরত থানবীর খলিফাবৃন্দ

হযরত থানবী রহ. ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের জন্য শুধু কিতাব লিখেছেন বা সিয়ানাতুল মুসলিমীনের কর্মপন্থা পেশ করেছেন এমন নয়, বরং তিনি নিজের তরবিয়তপ্রাপ্ত এমন একটা জামাত রেখে গেছেন যারা তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছেন। তার কাছে তরবিয়তপ্রাপ্তদের সংখ্যা হাজারের অধিক। তবে তাদের মাঝে ১২৯ জনকে তিনি খেলাফত প্রদান করেছেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা জলিল আহমদ শেরওয়ানী, প্রতিষ্ঠাতা, মজলিসে সিয়ানাতুল মুসলিমীন পাকিস্তান; মুফতী মুহাম্মাদ হাসান অমৃতসরী, প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর; মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্ধরী, প্রতিষ্ঠাতা, খাইরুল মাদারিস মুলতান; মুফতী মুহাম্মাদ শফী দেওবন্দী, প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলুম করাচি; মাওলানা আতহার আলী সিলেটী, প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়া এমদাদুল উলুম কিশোরগঞ্জ, পূর্ব পাকিস্তান; মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তাইয়েব কাসেমী, মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ ভারত; আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী, মাওলানা আব্দুল বারী নদবী, মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী, মাওলানা আশফাকুর রহমান কান্ধলবী, মাওলানা মসিহুল্লাহ খান শেরওয়ানী, মাওলানা ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফি ও জনাব হাজী মুহাম্মাদ শরিফ সাহেব। তাদের প্রত্যেকে ছিলেন একেকটা প্রতিষ্ঠানের মত।

মারকায ও ইমামের জরুরত

মুসলমানদের বিজয় দুটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল—আমল-আখলাক ও জিহাদ। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে জিহাদ না করবে মুসলমানরা সফল হতে পারবে না। জিহাদের জন্য মারকায জরুরী। তাই মুসলমানদের জন্য মারকায কায়েম করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত একজন আমিরুল মুমিনীন থাকা। তার মাঝে অন্তত তিনটি গুণ থাকতে হবে-দীনদারী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও হিম্মত-মনোবল। মুশকিল হলো, কারো মাঝে দীনদারী পাওয়া গেলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা পাওয়া যায় না। কারো মাঝে পাওয়া যায় না হিম্মত ও মনোবল।

কায়েদে আজমের মাঝে যেহেতু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও হিম্মত দুই-ই আছে তাই হযরত থানবী তাকে দীনদার বানানোর প্রতি মনোযোগ দেন। যেন তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত হতে পারেন। এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা তিনি ১৯৪০

সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবের আগেই করেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, হযরত থানবীই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের ধারণা পেশ করেন, শুধু তাই নয়, সেজন্য কার্যক্রমও শুরু করেন।

কায়েদ আজমের দীনী তরবিয়ত

হযরত থানবীর খাস মুরিদ নবাব জমশেদ আলী খান ছিলেন কায়েদে আজমের প্রাণের বন্ধু। নবাব সাহেবের বাড়িতে কায়েদে আজম অনেক সময় শীতকালীন অবকাশ যাপন করতেন। তিনি তখন কায়েদে আজমকে হযরত থানবীর মাওয়ায়েজ ও মালফুজাত শোনাতেন। তিনি বলেন, এটা বাস্তব যে, কায়েদে আজমের দীনী তরবিয়ত হযরত থানবীর ফয়েয ও বরকতে হয়েছে। তার ইসলামী চেতনা হযরত থানবীর বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। তাকে হযরত থানবীর কাছে আনার ব্যাপারে মৌলভী শিব্বির আলী থানবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে হযরতের আলোচনা করতেন। এমনকি তিনি থানাভবনে যাওয়ারও খুব আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু কিছু কারণবশত তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। শেষ জীবনে কায়েদে আজমের ওপর যতটা ধর্মী রঙ দেখা যেতো সেটা হযরত থানবীর বদৌলতে।[১]

ইসলাম শিখায় প্রকৃত সভ্যতা

আধুনিক শিক্ষিতরা নিজেদের মনে করত সভ্য-ভদ্র। তাদের চালচলন ও আচার-আচরণকে মনে করত সভ্যতার মাপকাঠি। এদিকে হযরত থানবী ছিলেন ইসলামী শিক্ষা, সভ্যতা ও মানসতত্ত্বে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সভ্যতার নামে অসভ্যতাগুলো ধরিয়ে দিতেন। সভ্যতার দাবীদাররা তার কাছে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের অভদ্রতা স্বীকার করতে বাধ্য হতো। তার কঠোরতা কখনো নিজের জন্য হতো না; বরং শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য হতো। তিনি জোর দিয়ে বলতেন, যারা আধুনিক সভ্যতার দাবীদার তারা কিছুদিন আমার সঙ্গে থেকে দেখুক, আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, বাস্তবেই আমরা অভদ্র। প্রকৃত সভ্যতা সেটাই ইসলাম যা শিক্ষা দেয়।

মুজাফফরনগর সফরে একবার তিনি এক নবাব সাহেবের মুখোমুখি হন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক ও বাকপটু। বড় বড় শাসকদেরও ভয়

১. তামীরে পাকিস্তান আওর উলামায়ে রাব্বানী ৯২।

www.maktabatulabrar.com

পেতেন না। যেহেতু নির্ভীক ছিলেন, তাই হযরতের সঙ্গেও বেপরোয়া কথাবার্তা শুরু করেন। ফলে হযরত অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি শালীন ভাষায় তাকে সতর্ক করেন। কিন্তু নবাব সাহেব জমিদারির আত্মম্ভরিতায় গা করেন-নি। অবশেষে হযরত রাগ করেন। এমনকি তাকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলেন। কিন্তু তিনি বসেই রইলেন। পরে এই বলে হযরত উঠে যান, আপনি না উঠলে আমিই উঠে যাই, আমি এমন লোকের সঙ্গে থাকতে চাই না। তখন নবাব সাহেব ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং করজোড়ে বলেন, হযরত! আপনি বসুন, আমিই চলে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে যান। পরে তিনি হাফেজ সগির আহমদকে বলেন, আমার সারা জীবনের জন্য শিক্ষা হয়ে গেছে। আসলে আমি আলেম ও কর্মচারীদের নীচু দৃষ্টিতে দেখতাম। এখন থেকে মৌলবীদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। আমি বড় বড় শাসকদেরও ভয় পাই না। কিন্তু সেদিন এত ভয় পেলাম যে, তার ধমকের পর একটা শব্দ আমার মুখ থেকে বের হয়নি।

ঈমানদার বান্দা

হযরত থানবীর অভ্যাস ছিল ভাড়া পরিশোধ না করে কোনো জিনিস আনা-নেয়া করতেন না। সামান্য সন্দেহ হলে ওজন মেপে নিতেন। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হলে ভাড়া অবশ্যই পরিশোধ করতেন। ভাড়া পরিশোধের গুরুত্ব ছিল তার কাছে সীমাহীন। একবার সাহারানপুর থেকে কানপুর যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল কিছু জিনিসপত্র। ভাড়া পরিশোধের সময় কেউ মাপতে চাইল না। এমনকি অমুসলিম কর্মচারীরাও বলতে লাগল-হযরত, মাপা লাগবে না; এমনিতে নিয়ে যান! আমরা গার্ডকে বলে দেবো। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, গার্ড কতদূর যাবে? তারা বলল, গাজিআবাদ পর্যন্ত যাবে। তিনি বলেন, গাজিআবাদ থেকে সামনে কী হবে? তারা বলল, তারা অন্য গার্ডকে বলে দেবে, তারা আপনাকে কানপুর নামিয়ে দেবে। আর আপনি তো কানপুরই যাবেন। হযরত বলেন, না, কানপুরে আমার সফর শেষ হবে না; সামনে আরেকটি সফর আছে, আখেরাতের সফর, সেখানে কী হবে? একথা শুনে সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের মাঝে শিক্ষিত হিন্দুবাবুও ছিলো। তারাও বলতে লাগল, আজকাল এমন ঈমানদার বান্দাও আছেন যারা ভগবানের ভয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন।[১]

হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারে সতর্কতা

হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারে হযরত থানবী খুবই সতর্ক থাকতেন। কোনো

১. বিস বড়ে মুসলমান ৩৫৩।

অবস্থায় যেন বান্দার হক নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে থাকতেন সদা সতর্ক। বিনা-টিকেটে রেলে সফর করা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। নিজের সঙ্গে কাউকে বিনা-টিকেটে সফর করতে দিতেন না। একবার এক তালিবে ইলম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো। তিনি তখন সফরে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সময় সংকীর্ণতার কারণে সে গার্ডকে বলে বিনা টিকেটে গাড়িতে চড়ে বসল। পরবর্তী স্টেশনে নেমে গার্ডকে ভাড়া দিতে চাইলে গার্ড বলল, সামান্য ভাড়া, তুমি গরিব মানুষ, দিতে হবে না! সে এসে হযরতকে জানাল। হযরত বললেন, গার্ড তো রেলওয়ে কোম্পানীর মালিক নয়, বরং কর্মচারী। সুতরাং ভাড়া তোমার জিম্মায় রয়ে গেছে। এখন সমমূল্যের টিকেট কিনে ছিঁড়ে ফেলো। এতে কোম্পানীর হক আদায় হয়ে যাবে, তুমিও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। সেই বগিতে ছিলেন একজন শিক্ষিত আর্য পণ্ডিত। তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে বলেন, আমি তো খুশি হচ্ছিলাম গরিব ছাত্রের ওপর ওরা দয়া করেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হলো, আমার খুশি ছিল বেঈমানের খুশি।[1]

গায়ের মুকাল্লিদের তওবা

হযরত থানবী বলেন, এক গায়ের মুকাল্লিদ ভয়ে ভয়ে বয়াতের উদ্দেশ্য আমার কাছে আসে। সাথীরা তাকে ভয় দেখায়, তুমি গেলে তোমাকে বের করে দেবে। সে আমার কাছে বয়াতের আবেদন করলে আমি এই শর্তে বয়াত করি, মুকাল্লিদ হোন আর গায়ের মুকাল্লিদ হোন কারো সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। কোনো প্রকার তর্ক-বিতর্কে জড়াবেন না। পরে তিনি নিজের স্ত্রীকেও মুরিদ করান। আমি তার কাছেও একই শর্ত করি। দু'চারবার আসার পর তিনি মুকাল্লিদ হয়ে যান। এটা এত্তেবায়ে হকের বরকত। অধিকাংশ মুনাজারায় অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এসলাহে বাতেনের পক্ষে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর।[2]

যিগর মুরাদাবাদির তওবা

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে আল্লাহ পাক এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বানিয়েছেন। তাকে দান করেছেন আত্মসংশোধনের হাকিমানা যোগ্যতা। উর্দু ভাষার প্রসিদ্ধ কবি যিগর মুরাদাবাদির ঘটনা। এক মজলিসে খাজা আজিজুল হাসান মজযুব হযরত থানবীকে বলেন, কবি যিগর মুরাদাবাদির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার

১. প্রাগুক্ত।

২. আরওয়াহে সালাসা ৩৬০।

www.maktabatulabrar.com

থানাভবনে যেতে এবং হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মন চায়, কিন্তু মদ কিছুতে ছাড়তে পারছি না। তাই কোন্ মুখে সেখানে যাই? হযরত থানবী জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কী জবাব দিলেন? খাজা সাহেব বলেন, আমি বলেছি, সত্যিই তো, এ অবস্থায় বুযুর্গের দরবারে যাওয়া ঠিক নয়। হযরত থানবী বলেন, খাজা সাহেব! আমি তো ভেবেছি আপনি তরিকা বুঝে গেছেন; কিন্তু এখন দেখি আমার ধারণা ভুল। আবার দেখা হলে বলবেন, যে অবস্থা হোক চলে আসুন! হয়ত হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবে।

আরেকদিন কবি যিগর মুরাদাবাদির সঙ্গে খাজা সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। খাজা সাহেব হযরত থানবীর কথা শোনালেন। এ কথা শুনে কবি সাহেব জারজার হয়ে কাঁদলেন। পরে ওয়াদা করলেন, মরে গেলেও এই নাপাক জিনিস মুখে নেবেন না। পরে দেখা গেল, মদ ছেড়ে দেয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। লোকেরা বলল, এই অবস্থায় শরীয়ত সামান্য মদ খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এটা ছিল যিগর সাহেবের যিগর। তিনি কিছুতেই মদে হাত দেননি। আল্লাহ পাক হিম্মতওয়ালাদের সাহায্য করেন। আল্লাহর ফযলে কিছু দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে থানাভবনে আগমন করেন। আর হযরত থানবী তাকে অনেক সম্মান দেখান।[1]

আখেরাতের প্রস্তুতি

মৃত্যুর আগেই তিনি মৃত্যুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। নিজের সব সম্পত্তির তালিকা তৈরি করেন-স্থাবর, অস্থাবর ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির। পরে অসিয়্যতনামায় লেখেন, আমার মন্দ স্বভাবের কারণে আল্লাহর অনেক বান্দার কষ্ট হয়েছে, কখনো মুখের দ্বারা কখনো হাতের দ্বারা। কারো কারো হক নষ্ট হয়েছে, চাই জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে। আমি ছোট বড় সবার কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা চাই। আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমিও দোয়া করি, আল্লাহ যেন সবাইকেও ক্ষমা করে দেন। যদি ক্ষমা করার হিম্মত না হয় তাহলে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিন। তবুও আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন, কেয়ামতের জন্য বাকি রাখবেন না। সেটা কখনো সহ্য হবে না। আর কেউ আমার সঙ্গে অশোভন কিছু করে থাকলে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি।

বন্ধুদের কাছে আবেদন, আমার সর্বপ্রকার গোনাহের জন্য ইস্তিগফার পড়ুন। আমার মন্দ স্বভাব দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করুন। আমি সবাইকে

১. মাজালিসে হাকিমুল উম্মত, মুফতী শফি রহ. কৃত, পৃষ্ঠা ৫৮।

গুরুত্বের সঙ্গে বলছি, ইলমে দীন নিজে শেখা এবং সন্তানদের শেখানো ফরজ; চাই কিতাবের মাধ্যমে হোক বা সোহবতের মাধ্যমে হোক। এছাড়া যুগের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কেউ অবহেলা করবে না।

শুভার্থীদের কাছে আবেদন, আমার স্মরণে একবার হলেও সুরা ইয়াসিন ও তিনবার সুরা ইখলাস পড়ে বখশে দিবেন। কোনো প্রকার রুসুম রেওয়াজ পালন করবেন না। আমার ইসালে সওয়াবের জন্য একত্র হবেন না। কোনো কারণে একত্র হলেও ইসালে সওয়াবের সময় পৃথক হয়ে যাবেন। প্রত্যেকে একাকী যা ইচ্ছা ইসালে সওয়াব করবেন। শুধু দোয়া, সদকা ও নফল এবাদত করবেন। আমার ব্যবহৃত জিনিসপত্রকে বরকত মনে করবেন না। যথাসম্ভব দুনিয়ার সঙ্গে দিল লাগাবেন না। আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল থাকবেন না। সর্বদা আখেরাতের প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন, যেন মৃত্যুর সময় আফসোস না হয়। দিনের গোনাহের জন্য দিনে আর রাতের গোনাহের জন্য রাতেই তওবা করবেন। যতটা সম্ভব হুকুকল ইবাদ থেকে বেঁচে থাকবেন।

জীবনীগ্রন্থে যেহেতু সাধারণত মিথ্যা প্রশংসা করা হয় তাই আমি এটা পছন্দ করি না। কেউ একান্ত আগ্রহী হলে আলেমদের অনুমতিক্রমে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লিখবে। অন্যথায় আমি এর দায় থেকে মুক্ত।

মৃত্যুর একদিন পূর্বে আসরের সময় অত্যধিক দুর্বলতা সত্ত্বেও হঠাৎ নসিহত শুরু করেন। অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজে বলেন, আমি চাই আমার সঙ্গীরা আমার চেয়ে বেড়ে যাক। কিন্তু আফসোস, এখনো পর্যন্ত কেউ বাড়েনি। আমি সর্বদা নিজেকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও মন্দ জানি। কিন্তু হযরত হাজী সাহেবের জুতোর বরকতে প্রথম দিন থেকেই আমার বিরাট সৌভাগ্য হয়। আমাকে তিনি বিরাট সুসংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু গালির ভয়ে কখনো প্রকাশ করিনি। বড় বড় আকাবিরের নাম নিয়ে বলেছেন, তুমি তাদের থেকে অগ্রসর হয়ে গেছ। অথচ আমি তাদের জুতোর মাটির সমান নই। আমি এটাকে মনে করি ভবিষ্যতের জন্য সুসংবাদ। কেননা এখন পর্যন্ত আমার অবস্থা সেটার উপযুক্ত হয়নি।

অসুখ-বিসুখ

ইন্তিকালের পাঁচ বছর আগে থেকে তিনি পাকস্থলী ও লিভারের পীড়ায় আক্রান্ত হন। কখনো লিভারের ব্যাথায় বেহুঁশ হয়ে যেতেন। আবার মাঝেমধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দাস্ত হতো। এ কারণে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। শরীরও হয়ে পড়ে ক্ষীণ ও কৃশ। দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি মানুষের হেদায়েত ও এসলাহের কাজে দূরদূরান্তে সফর করতেন। ইন্তিকালের এক

www.maktabatulabrar.com

সপ্তাহ পূর্বে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। অনবরত দাস্ত ও অনাহারে শরীরের হাড়গুলো বেরিয়ে যায়। তবুও নামাজ ও অন্যান্য এবাদতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। চেহারায় তেমন পরিবর্তন আসেনি। কেবল আওয়াজ একটু ক্ষীণ হয়ে গেছে। অবশেষে অত্যধিক দুর্বলতাবশত জিহ্বা অচল হয়ে যায়। তবুও শুয়ে শুয়ে জিকির করতে চাইতেন, কিন্তু জিহ্বা নাড়াতে পারতেন না, ফলে কলবী জিকির করতেন।

শেষ মুহূর্তে নামাজ ও হুকুকুল ইবাদের ফিকির

রসূল সা. যেমন সর্বশেষ নামাজের ব্যাপারে সতর্ক থাকা আর গোলাম-বাঁদির সঙ্গে সদাচারের কথা বলে গেছেন, তিনিও তেমনি নামাজ ও হুকুকুল ইবাদের কথা বলেছেন। খাজা সাহেবকে তখন বলতেন, দুটি জিনিসের প্রতি আমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি–নামাজ ও হুকুকুল ইবাদ। অবশেষে নড়াচড়ার শক্তি ফুরিয়ে গেলে তায়াম্মুম করে ইশারায় নামাজ পড়তেন। এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা করেননি। এমনকি শেষ বেহুঁশির কিছুক্ষণ আগেও জিজ্ঞাসা করেন, মাগরিবের সময় কতদূর? বলা হলো, দশ মিনিট। আবারো জিজ্ঞাসা করেন, সময় আসার না যাওয়ার। শেষ মুহূর্তেও এমন বিশ্লেষণে সবাই হতবাক!

ইন্তিকালের পূর্বক্ষণে তিনি বিবি সাহেবাদ্বয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমাদেরকে মাসিক খরচ বুঝিয়ে দিয়েছি? তারা বলেন, হ্যাঁ, আমরা সবকিছু পেয়েছি। অতঃপর তিনি আমানতের তহবিল বের করেন। একটি লেফাফায় মাত্র পনেরো আনা, অন্যটিতে ছয়খানা পাঁচ টাকার নোট আর কিছু পয়সা ছিল। এগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। আমানত বুঝিয়ে দেয়াই ছিল তার জীবনের শেষ কাজ।

এরপর আর হুঁশ ফিরে আসেনি। প্রায় সোয়া ঘণ্টা বেহুঁশ ছিলেন। তখন মাওলানা যফর আহমদ উসমানী সুরায়ে ইয়াসিন পড়তেন আর মাঝেমধ্যে মুখে যমযমের পানি দিতেন। শ্বাস ওপরে উঠবার সময় ডান হাতের শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে নূরের ছিটা বের হতো। অবশেষে ৮২ বছর ৩ মাস ১১ দিন বয়সে ১৩৬২ হিজরির ১৬ই রজব সোমবার দিবাগত রাত দশটায় তিনি ইন্তিকাল করেন। মাওলানা যফর আহমদ উসমানী তার জানাযা নামাজ পড়ান।

খাজা সাহেবের স্মৃতিচারণ

হযরত থানবী রহ.-এর অন্যতম খফিলা খাজা আজিজুল হাসান তার মৃত্যুকালীন স্মৃতিচারণ করে লেখেন, আমি তখন বিতর নামাজে তাশাহহুদ

পড়ছি, হঠাৎ মনে অস্বাভাবিক চাপ অনুভব করলাম। মনে হলো, ভেতরটা আমার শূন্য হয়ে গেছে। ভাবতে লাগলাম, এটা কি সেটাই শায়েখ যেমন বলেছেন, কুতুবুল ইরশাদের মৃত্যুর সময় অনেকে নিজের মনে চাপ অনুভব করেছে, কাইফিয়াতের অভাব অনুভব করেছে। কেননা তার ফয়েয সবার অন্তরে পৌঁছত। যদিও ফয়েয কোত্থেকে আসছে বুঝা যেতো না। স্বয়ং কুতুবুল ইরশাদও হয়ত জানতেন না তার ফয়েয সবার মাঝে পৌঁছচ্ছে। সূর্যের আলো যেমন সবার কাছে পৌঁছে।

হঠাৎ স্মরণ হলো, শায়েখ যদিও মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন, কিন্তু এখনো তো জীবিত, তাহলে এমন হচ্ছে কেন? মনেই জবাব এলো, হয়ত আমাদের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেছেন তাই। নামাজ শেষে বাড়ি গিয়ে শুনি, পাঁচ মিনিট হলো ইন্তেকাল করেছেন। তখন মনে হলো, তাশাহহুদের সময়ই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কেননা নামাজ শেষে বাড়ি আসতে পাঁচ মিনিট লেগেছে। পরিবর্তনটা এমন স্পষ্ট অনুভূত হলো যে, সালামের পর বলে উঠলাম, হায় আল্লাহ! শায়েখের পর আমার এই অবস্থা হলে আমার ঈমানের কী হবে?

মোটকথা– হযরত থানবী রহ.-এর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামের খেদমতে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নাযুক তবিয়তের মানুষ। মেজাযের দিক থেকে তাকে মির্জা মাজহার জানেজানার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী। তিনি যদি এমনটা না হতেন, তাহলে এত বড় খেদমত ও মহান কীর্তি আঞ্জাম দিতে পারতেন না। সহস্রাধিক কিতাব লিখতে পারতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন হাকিমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত। পৃথিবীর ইতিহাসে এক বড় ধর্মীয় ও রূহানী ইমাম। অবশেষে ৮৩ বছর দুই মাস এগারো দিন পৃথিবীকে আলোকিত করে ১৬ই রজব ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ২০শে জুলাই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে অর্ধরাতে ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ গ্রন্থে উল্লেখিত বুযুর্গানে দ্বীনসহ সকল বুযুর্গ ও অলি-আল্লাহদের আদর্শ অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন, তাদের রূহানী ফুয়ূয ও বারাকাত দ্বারা আমাদেরকে মণ্ডিত করুন। আমীন!

গ্রন্থ সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

গ্রন্থপঞ্জী

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی	تاریخ مشائخ چیشت
مولانا خلیق احمد نظامی	تاریخ مشائخ چیشت
مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	تاریخ دعوت و عزیمت
عبد الرشید ارشد	بیس بڑے مسلمان
حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی	ارواح ثلاثہ
حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی	اشرف السوانح
حضرت مولانا الحاج محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی	تذکرۃ الرشید
الحاج مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی مرحوم	سیر الصحابہ
حضرت امام عبد اللہ یافعی یمنی	کرامات اولیاء
مولانا نور الدین محمد عبد الرحمٰن جامی	نفحات الانس
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی	آپ بیتی
شیخ عبد الحق محدث دہلوی	اخبار الاخیار
حضرت امیر علاء سنجری	فوائد الفواد
المؤرخ الكبير العلامة عبد الحي الحسيني	نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر
العلامة محمد ابن سعد	الطبقات الكبري
الامام أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني	الطبقات الكبري
أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي	الطبقات الصوفية
الامام جلال الدين السيوطي	طبقات الحفاظ
الامام ابو القاسم عبد الكريم هوازن القشيري	الرسالة القشيرية
الامام جمال الدين ابن الجوزي	صفة الصفوة
أبي العباس احمد ابن خلكان	وفيات الاعيان
الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني	تهذيب التهذيب

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

■ আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মূল্য: ৩৩০/=

■ ফাযায়েলে যিন্দেগী

নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

মূল্য: ৩৮০/=

■ ফিক্‌হুন নিছা

নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

মূল্য: ৩৮০/=

■ বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

মূল্য: (প্রতি খণ্ড) ৪৩০/=

■ আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে সব প্রকার হজ্জ এবং উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারত সংশিষ্ট স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

মূল্য: ১৪০/=

■ ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল্য: ৫০০/=

www.maktabatulabrar.com

■ ইসলামী মনোবিজ্ঞান

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

মূল্য: ২৪০/=

■ ইসলামী ভূগোল

এ গ্রন্থে ভূগোল শাস্ত্র বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় আলোচনা অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক বিষয়াদির বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি চার কালারে মুদ্রিত বহু ছবি ও মানচিত্র সম্বলিত।

মূল্য: ৯০০/=

■ কুরআন ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

মূল্য: ৮০/=

■ হজ্জ ও জিয়ারতের মানচিত্র

এ মানচিত্রে হজ্জ, উমরা ও জিয়ারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় ও স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এক পৃষ্ঠায় মক্কা মুকাররমাহ ও তার বিষয়াদি আরেক পৃষ্ঠায় মদীনা মুনাওওয়ারাহ ও তার বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূল্য: ১০০/=

■ কথা সত্য মতলব খারাপ

রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

মূল্য: ৯০/=

■ ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্পর্কিত একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

মূল্য: ২৪০/=

■ চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদের শেষ নেই। মত মতান্তরের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা মতবিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সব কিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

মূল্য: ১৩০/=

■ যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

মূল্য: ২৯০/=

■ মিসরে কয়েকদিন

এটি একটি মিসরের সফরনামা। এতে মিসরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদিসহ মিসর সম্পর্কে জানার উৎসুক্য আছে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দর্শনীয় স্থানসমূহের প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি মিসর সফরে আগ্রহীদের জন্য গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

মূল্য: ৩৮০/=

■ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খণ্ড, পূর্ণ সেট)

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক: বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য : ১৩০০/=

■ চার ইমাম

ফিকহের চার ইমাম– ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ, ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.–এর প্রামাণ্য জীবন কথা। লেখক দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ একাডেমির তত্তাবধায়ক মাওলানা কাজি আতহার মুবারক-পুরি রহ.। গ্রন্থটির প্রতিটি তথ্য নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সমৃদ্ধ।

অনুবাদক: মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ ও অন্যান্য।
সম্পাদনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২৪০/=

www.maktabatulabrar.com

□ الاستفادة بشرح سنن ابن ماجة

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجة.
٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.
٣.شرح المفردات.
٤.الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.
٥.بيان المباحث المتعلقة بالحديث على المنهج التدريسي.
٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.
٧.بيان مطابقة الحديث للترجمة.

মূল্য: ১০০০/=

■ চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে জানা যাবে–

" চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়।
" চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ।
" চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ।
" ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সব দিকে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

মূল্য: ২০০/=

■ নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্সের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

মূল্য: ২০০/=

■ সলাতুন নবী স.

- এ গ্রন্থ নামাযের মাসায়েল দলীলাদিসহ জানার জন্য।
- এ গ্রন্থ মাযহাব মানার প্রয়োজন নিয়ে বিভ্রান্তি কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য।
- এ গ্রন্থ হানাফী মাযহাবে বর্ণিত নামাযের পদ্ধতি সহীহ ও সুদৃঢ়- তার দলীলাদি জানার জন্য।
- এ গ্রন্থ হানাফী মাযহাবের নামায রসূল স.-এর নামায থেকে অভিন্ন- তা প্রমাণ করার জন্য।

লেখক : মুফতি গোলামুর রহমান
সম্পাদনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মূল্য: ২৪০/=